কাব্যগ্রন্থ

নবম খণ্ড

প্রাপ্তিস্থান—

ইণ্ডিয়ান্ প্রেস—এলাহাবাদ

ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস্

২২নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

Printed and published by Apurvakrishna Bose,
at the Indian Press,—Allahabad.

কাব্যগ্রন্থ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নবম খণ্ড

প্রকাশক

ইণ্ডিয়ান প্রেস—এলাহাবাদ

১৯১৬

সূচী

গীতালি

রাজা

লেখকের নিবেদন—

এই "রাজা" প্রথমে খাতায় যেমনটি লিখিয়াছিলাম তাহার কতকটা কাটিয়া ছাঁটিয়া বদল করিয়া ছাপানো হইয়াছিল। হয়ত তাহাতে কিছু ক্ষতি হইয়া থাকিবে এই আশঙ্কা করিয়া সেই মূল লেখাটি অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান সংস্করণ ছাপানো হইল।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রাজা

১

অন্ধকার ঘর

রাণী সুদর্শনা ও তাঁহার দাসী সুরঙ্গমা

সুদর্শনা। আলো, আলো কই ?—এ ঘরে কি একদিনও আলো জ্বল্‌বে না ?

সুরঙ্গমা। রাণী মা, তোমার ঘরে ঘরেই ত আলো জ্বলচে—তা'র থেকে সরে' আসবার জন্যে কি একটা ঘরেও অন্ধকার রাখ্‌বে না ?

সুদর্শনা। কোথাও অন্ধকার কেন থাক্‌বে ?

সুরঙ্গমা। তা হ'লে যে আলোও চিনবে না অন্ধকারও চিন্‌বে না।

সুদর্শনা। তুই যেমন এই অন্ধকার ঘরের দাসী তেমনি তোব অন্ধকারের মত কথা, অর্থই বোঝা যায় না। বল্‌ ত এ ঘরটা আছে কোথায় ! কোথা দিয়ে এখানে আসি কোথা দিয়ে বেরই প্রতিদিনই ধাঁদা লাগে।

সুরঙ্গমা। এ ঘর মাটির আবরণ ভেদ করে' পৃথিবীর বুকের মাঝখানে তৈরি। তোমার জন্যেই রাজা বিশেষ করে' করেছেন।

সুদর্শনা। তাঁর ঘরের অভাব কি ছিল যে এই অন্ধকার ঘরটা বিশেষ করে' করেছেন?

সুরঙ্গমা। আলোর ঘরে সকলেরই আনাগোনা—এই অন্ধকারে কেবল একলা তোমার সঙ্গে মিলন।

সুদর্শনা। না, না, আমি আলো চাই—আলোর জন্যে অস্থির হ'য়ে আছি। তোকে আমি আমার গলার হার দেব যদি এখানে একদিন আলো আনতে পারিস।

সুরঙ্গমা। আমার সাধ্য কি মা! যেখানে তিনি অন্ধকার রাখেন আমি সেখানে আলো জ্বাল্‌ব!

সুদর্শনা। এত ভক্তি তোর? অথচ শুনেছি তোর বাপকে রাজা শাস্তি দিয়েছেন। সে কি সত্যি?

সুরঙ্গমা। সত্যি। বাবা জুয়ো খেল্‌ত। রাজ্যের যত যুবক আমাদের ঘরে জুট্‌ত—মদ খেত আর জুয়ো খেল্‌ত।

সুদর্শনা। তুই কি করতিস্?

সুরঙ্গমা। মা, তবে সব শুনেছ। আমি নষ্ট হবার পথে গিয়েছিলুম। বাবা ইচ্ছে করেই আমাকে সে পথে দাঁড় করিয়েছিলেন। আমার মা ছিল না।

সুদর্শনা। রাজা যখন তোর বাপকে নির্ব্বাসিত করে' দিলেন তখন তোর রাগ হয় নি?

সুরঙ্গমা। খুব রাগ হয়েছিল—ইচ্ছে হয়েছিল কেউ যদি রাজাকে মেরে ফেলে ত বেশ হয়।

সুদর্শনা। রাজা তোর বাপের কাছ থেকে ছাড়িয়ে এনে কোথায় রাখ্‌লেন?

সুরঙ্গমা। কোথায় রাখ্‌লেন কে জানে! কিন্তু কি কষ্ট গেছে! আমাকে যেন ছুঁচ ফোটাত, আগুনে পোড়াত।

সুদর্শনা। কেন, তোর এত কষ্ট কিসের ছিল!

সুরঙ্গমা। আমি যে নষ্ট হবার পথে গিয়েছিলুম—সে পথ বন্ধ হ'তেই মনে হ'ল আমার যেন কোনো আশ্রয়ই রইল না। আমি কেবল খাঁচায়-পোরা বুনো জন্তুর মত কেবল গর্জ্জে বেড়াতুম এবং সবাইকে আঁচ্‌ড়ে কাম্‌ড়ে ছিঁড়ে ফেল্‌তে ইচ্ছে করত।

সুদর্শনা। রাজাকে তখন তোর কি মনে হ'ত!

সুরঙ্গমা। উঃ কি নিষ্ঠুর! কি নিষ্ঠুর! কি অবিচলিত নিষ্ঠুরতা!

সুদর্শনা। সেই রাজার পরে তোর এত ভক্তি হ'ল কি করে'?

সুরঙ্গমা। কি জানি মা! এত অটল এত কঠোর বলেই এত নির্ভর এত ভরসা। নইলে আমার মত নষ্ট আশ্রয় পেত কেমন করে'?

সুদর্শনা। তোর মন বদল হ'ল কখন্?

সুরঙ্গমা। কি জানি কখন হ'য়ে গেল! সমস্ত দুরন্তপনা হার মেনে একদিন মাটিতে লুটিয়ে পড়্‌ল। তখন দেখি যত ভয়ানক ততই সুন্দর। বেঁচে গেলুম, বেঁচে গেলুম, জন্মের মত বেঁচে গেলুম।

সুদর্শনা। আচ্ছা সুরঙ্গমা, মাথা খা, সত্যি করে' বল্‌ আমার রাজাকে দেখ্‌তে কেমন? আমি একদিনও তাঁকে চোখে দেখ্‌লুম না! অন্ধকারেই আমার কাছে আসেন, অন্ধকারেই যান। কতলোককে জিজ্ঞাসা করি কেউ স্পষ্ট করে' জবাব দেয় না—সবাই যেন কি একটা লুকিয়ে রাখে।

সুরঙ্গমা। আমি সত্যি বল্‌চি রাণী, ভালো করে' বল্‌তে পারব না। তিনি কি সুন্দর? না, লোকে যাকে সুন্দর বলে তিনি তা নন।

সুদর্শনা। বলিস্‌ কি? সুন্দর নন।

সুরঙ্গমা। না রাণীমা। সুন্দর বল্লে তাঁকে ছোট করে' বলা হবে।

সুদর্শনা। তোর সব কথা ঐ এক রকম! কিছু বোঝা যায় না।

সুরঙ্গমা। কি করব মা, সব কথা ত বোঝানো যায় না! বাপের বাড়িতে অল্পবয়সে অনেক পুরুষ দেখেছি, তাদের সুন্দর বল্‌তুম। তা'রা আমার দিনরাত্রিকে আমার সুখদুঃখকে কি নাচন নাচিয়ে বেড়িয়েছিল সে

আজো ভুল্‌তে পারিনি। আমার রাজা কি তাদের মত? সুন্দর! কখ্‌খনো না।

সুদর্শনা। সুন্দর নয়?

সুরঙ্গমা। হাঁ, তাই বল্‌ব—সুন্দর নয়! সুন্দর নয় বলেই এমন অদ্ভুত এমন আশ্চর্য্য! যখন বাপের কাছ থেকে কেড়ে আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে গেল তখন সে ভয়ানক দেখ্‌লুম। আমার সমস্ত মন এমন বিমুখ হ'ল যে কটাক্ষেও তাঁর দিকে তাকাতে চাইতুম না। তা'র পরে এখন এমন হয়েছে যে যখন সকাল বেলায় তাঁকে প্রণাম করি তখন কেবল তাঁর পায়ের তলার মাটির দিকেই তাকাই—আর মনে হয় এই আমার ঢের—আমার নয়ন সার্থক হ'য়ে গেছে!

সুদর্শনা। তোর সব কথা বুঝ্‌তে পারিনে তবু শুন্‌তে বেশ ভালো লাগে। কিন্তু যাই বলিস্ তাঁ'কে দেখ্‌বই। আমার কবে বিবাহ হয়েছিল মনেও নেই; তখন আমার জ্ঞান ছিল না। মার কাছে শুনেছি তাঁকে দৈবজ্ঞ বলেছিল তাঁর মেয়ে যাঁকে স্বামিরূপে পাবে পৃথিবীতে তাঁর মত পুরুষ আর নেই। মাকে কতবার জিজ্ঞাসা করেছি আমার স্বামীকে দেখ্‌তে কেমন—তিনি ভালো করে' উত্তর দিতেই চান না, বলেন আমি কি দেখেছি—আমি ঘোমটার ভিতর থেকে ভালো করে' দেখ্‌তেই

পাইনি। যিনি সুপুরুষের শ্রেষ্ঠ তাঁকে দেখ্‌ব এ লোভ কি ছাড়া যায়!

সুরঙ্গমা। ঐ যে মা একটা হাওয়া আস্‌চে।

সুদর্শনা। হাওয়া? কোথায় হাওয়া?

সুরঙ্গমা। ঐ যে গন্ধ পাচ্চ না?

সুদর্শনা। না, কই গন্ধ পাচ্চিনে ত!

সুরঙ্গমা। বড় দরজাটা খুলেছে—তিনি আসচেন, ভিতরে আস্‌চেন।

সুদর্শনা। তুই কেমন করে' টের পাস্?

সুরঙ্গমা। কি জানি মা! আমার মনে হয় যেন আমার বুকের ভিতরে পায়ের শব্দ পাচ্চি। আমি তাঁর এই অন্ধকার ঘরের সেবিকা কিনা তাই আমার একটা বোধ জন্মে গেচে—আমার বোঝবার জন্যে কিছুই দেখবার দরকার হয় না।

সুদর্শনা। আমার যদি তোর মত হয় তা হ'লে যে বেঁচে যাই।

সুরঙ্গমা। হবে মা হবে! তুমি দেখ্‌ব দেখ্‌ব করে' যে অত্যন্ত চঞ্চল হ'য়ে রয়েছ সেই জন্যে কেবল দেখবার দিকেই তোমার সমস্ত মন পড়ে' রয়েছে। সেইটে যখন ছেড়ে দেবে তখন সব আপনি সহজ হ'য়ে যাবে।

সুদর্শনা। দাসী হ'য়ে তোর এত সহজ হ'ল কি করে? রাণী হ'য়ে আমার হ'ল না কেন?

সুরঙ্গমা। আমি যে দাসী সেই জন্যেই এত সহজ হ'ল।

আমাকে যেদিন তিনি এই অন্ধকার ঘরের ভার দিয়ে বল্লেন সুরঙ্গমা, এই ঘরটা প্রতিদিন তুমি প্রস্তুত করে' রেখো, এই তোমার কাজ, তখন আমি তাঁর আজ্ঞা মাথায় করে' নিলুম—আমি মনে মনেও বলিনি যারা তোমার আলোর ঘরে আলো জ্বালে তাদের কাজটি আমাকে দাও। তাই যে কাজটি নিলুম তা'র শক্তি আপনি জেগে উঠ্‌ল, কোনো বাধা পেল না।...... ঐ যে তিনি আস্‌চেন—ঘরের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। প্রভু!

বাহিরে গান

খোলো খোলো দ্বার রাখিয়ো না আর
বাহিরে আমায় দাঁড়ায়ে।
দাও সাড়া দাও এই দিকে চাও
এস দুই বাহু বাড়ায়ে॥

কাজ হ'য়ে গেছে সারা,
উঠেছে সন্ধ্যাতারা,
আলোকের খেয়া হ'য়ে গেল দেয়া
অস্ত সাগর পারায়ে।
এসেছি দুয়ারে এসেছি, আমারে
বাহিরে রেখো না দাঁড়ায়ে॥

রাজা

ভরি ল’য়ে ঝারি এনেছ কি বারি,

সেজেছ কি শুচি দুকূলে?

বেঁধেছ কি চুল, তুলেছ কি ফুল,

গেঁথেছ কি মালা মুকুলে?

ধেনু এল গোঠে ফিরে,

পাখীরা এসেছে নীড়ে,

পথ ছিল যত জুড়িয়া জগত,

আঁধারে গিয়েছে হারায়ে।

তোমারি দুয়ারে এসেছি, আমারে

বাহিরে রেখো না দাঁড়ায়ে॥

সুরঙ্গমা। তোমার দুয়োর কে বন্ধ রাখ্‌তে পারে রাজা? ও ত বন্ধ নেই, কেবল ভ্যাজানো আছে, একটু ছোঁও যদি আপ্‌নি খুলে যাবে। সেটুকুও করবে না? নিজে উঠে গিয়ে না খুলে দিলে ঢুক্‌বে না?

গান

এ যে মোর আবরণ

ঘুচাতে কতক্ষণ?

নিশ্বাস বায়ে উড়ে চলে’ যায়

তুমি কর যদি মন।

যদি পড়ে’ থাকি ভূমে

ধূলায় ধরণী চুমে,

তুমি তারি লাগি দ্বারে র’বে জাগি

এ কেমন তব পণ?

রথের চাকার রবে
জাগাও জাগাও সবে,
আপনার ঘরে এস বলভরে
এস এস গৌরবে।
ঘুম টুটে যাক্ চলে’,
চিনি যেন প্রভু বলে ;
ছুটে এসে দ্বারে করি আপনারে
চরণে সমর্পণ ॥

রাণী, যাও তবে, দরজাটা খুলে দাও, নইলে আস্‌বেন না।

সুদর্শনা। আমি এ ঘরের অন্ধকারে কিছুই ভালো করে’ দেখতে পাইনে—কোথায় দরজা কে জানে! তুই এখানকার সব জানিস্—তুই আমার হ’য়ে খুলে দে।

(সুরঙ্গমার দ্বার উদ্‌ঘাটন, প্রণাম ও প্রস্থান।*)

সুদর্শনা। তুমি আমাকে আলোয় দেখা দিচ্চ না কেন?

রাজা। আলোয় তুমি হাজার হাজার জিনিষের সঙ্গে মিশিয়ে আমায় দেখতে চাও? এই গভীর অন্ধকারে আমি তোমার একমাত্র হ’য়ে থাকি না কেন?

সুদর্শনা। সবাই তোমাকে দেখ্‌তে পায়, আমি রাণী হ’য়ে দেখ্‌তে পাব না?

* রাজাকে এ নাটকের কোথাও রঙ্গমঞ্চে দেখা যাইবে না।

রাজা। কে বল্লে দেখ্‌তে পায় ? মূঢ় যারা তা'রা মনে করে দেখ্‌তে পাচ্চি।

সুদর্শনা। তা হোক্, আমাকে দেখা দিতেই হবে।

রাজা। সহ্য করতে পারবে না—কষ্ট হবে।

সুদর্শনা। সহ্য হবে না—তুমি বল কি! তুমি যে কত সুন্দর কত আশ্চর্য্য তা এই অন্ধকারেই বুঝ্‌তে পারি আর আলোতে বুঝ্‌তে পারব না ? বাইরে যখন তোমার বীণা বাজে তখন আমার এম্‌নি হয় যে আমার নিজেকে সেই বীণার গান বলে' মনে হয়। তোমার ঐ সুগন্ধ উত্তরীয়টা যখন আমার গায়ে এসে ঠেকে তখন আমার মনে হয় আমার সমস্ত অঙ্গটা বাতাসে ঘন আনন্দের সঙ্গে মিলে গেল। তোমাকে দেখ্‌লে আমি সইতে পারব না এ কি কথা।

রাজা। আমার কোনো রূপ কি তোমার মনে আসে না ?

সুদর্শনা। এক রকম করে' আসে বৈ কি! নইলে বাঁচ্‌ব কি করে' ?

রাজা। কি রকম দেখেছ ?

সুদর্শনা। সে ত এক রকম নয়। নব বর্ষার দিনে জলভরা মেঘে আকাশের শেষ প্রান্তে বনের রেখা যখন নিবিড় হ'য়ে ওঠে, তখন বসে' বসে' মনে করি আমার রাজার রূপটি বুঝি এই রকম, এম্‌নি নেমে-আসা, এম্‌নি ঢেকে-দেওয়া, এম্‌নি চোখ-জুড়ানো, এম্‌নি হৃদয়-

ভরানো, চোখের পল্লবটি এম্‌নি ছায়ামাখা, মুখের হাসিটি এম্‌নি গভীরতার মধ্যে ডুবে থাকা। আবার শরৎ-কালে আকাশের পর্দ্দা যখন দূরে উড়ে চলে' যায় তখন মনে হয় তুমি স্নান করে' তোমার শেফালি বনের পথ দিয়ে চলেচ, তোমার গলায় কুন্দফুলের মালা, তোমার বুকে শ্বেত চন্দনের ছাপ, তোমার মাথায় হাল্‌কা সাদা কাপড়ের উষ্ণীষ, তোমার চোখের দৃষ্টি দিগন্তের পারে- তখন মনে হয় তুমি আমার পথিক বন্ধু; তোমার সঙ্গে যদি চল্‌তে পারি তা হ'লে দিগন্তে দিগন্তে সোনার সিংহদ্বার খুলে যাবে, শুভ্রতার ভিতর মহলে প্রবেশ করব। আর যদি না পারি তবে এই বাতায়নের ধারে বসে' কোন্ এক অনেক-দূরের জন্যে দীর্ঘনিশ্বাস উঠ্‌তে থাকবে, কেবলি দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি অজ্ঞাত বনের পথ-শ্রেণী আর অনাঘ্রাত ফুলের গন্ধের জন্যে বুকের ভিতরটা কেঁদে কেঁদে ঝুরে ঝুরে মরবে। আর বসন্ত-কালে এই যে সমস্ত বন রঙে রঙীন, এখন আমি তোমাকে দেখ্‌তে পাই কানে কুণ্ডল, হাতে অঙ্গদ, গায়ে বসন্তী রঙের উত্তরীয়, হাতে অশোকের মঞ্জরী, তানে তানে তোমার বীণার সব ক'টি সোনার তার উতলা।

রাজা। এত বিচিত্ররূপ দেখ্‌চ তবে কেন সব বাদ দিয়ে

কেবল একটি বিশেষ মূর্ত্তি দেখ্‌তে চাচ্চ? সেটা যদি মনের মত না হয় তবে ত সমস্ত গেল।

সুদর্শনা। মনের মত হবে নিশ্চয় জানি।

রাজা। মন যদি তা'র মত হয় তবেই সে মনের মত হবে। আগে তাই হোক্‌!

সুদর্শনা। সত্য বলচি এই অন্ধকারের মধ্যে যখন তোমাকে দেখ্‌তে না পাই অথচ তুমি আছ বলে' জানি তখন এক-একবার কেমন একটা ভয়ে আমার বুকের ভিতরটা কেঁপে ওঠে।

রাজা। সে ভয়ে দোষ কি? প্রেমের মধ্যে ভয় না থাক্‌লে তা'র রস হাল্‌কা হ'য়ে যায়।

সুদর্শনা। আচ্ছা আমি জিজ্ঞাসা করি এই অন্ধকারের মধ্যে তুমি আমাকে দেখ্‌তে পাও?

রাজা। পাই বৈকি।

সুদর্শনা। কেমন করে' দেখ্‌তে পাও? আচ্ছা, কি দেখ?

রাজা। দেখতে পাই যেন অনন্ত আকাশের অন্ধকার আমার আনন্দের টানে ঘুরতে ঘুরতে কত নক্ষত্রের আলো টেনে নিয়ে এসে একটি জায়গায় রূপ ধরে' দাঁড়িয়েছে। তার' মধ্যে কত যুগের ধ্যান, কত আকাশের আবেগ, কত ঋতুর উপহার!

সুদর্শনা। আমার এত রূপ! তোমার কাছে যখন শুনি বুক

ভরে' ওঠে। কিন্তু ভালো করে' প্রত্যয় হয় না ; নিজের মধ্যে ত দেখ্‌তে পাইনে।

রাজা। নিজের আয়নায় দেখা যায় না—ছোট হ'য়ে যায়। আমার চিত্তের মধ্যে যদি দেখ্‌তে পাও ত দেখ্‌বে সে কত বড়! আমার হৃদয়ে তুমি যে আমার দ্বিতীয়, তুমি সেখানে কি শুধু তুমি!

সুদর্শনা। বল বল এম্‌নি করে' বল! আমার কাছে তোমার কথা গানের মত বোধ হচ্চে,—যেন অনাদি-কালের গান, যেন জন্মজন্মান্তর শুনে এসেছি। সে কি তুমিই শুনিয়েছ, আর আমাকেই শুনিয়েছ? না যাকে শুনিয়েছ সে আমার চেয়ে অনেক বড়, অনেক সুন্দর,—তোমার গানে সেই অলোক-সুন্দরীকে দেখ্‌তে পাই—সে কি আমার মধ্যে, না তোমার মধ্যে? তুমি আমাকে যেমন করে' দেখ্‌চ তাই একবার এক নিমেষের জন্যে আমাকে দেখিয়ে দাও না! তোমার কাছে অন্ধকার বলে' কি কিছুই নেই? সেই জন্যেই ত তোমাকে কেমন আমার ভয় করে। এই যে কঠিন কালো লোহার মত অন্ধকার, যা আমার উপর ঘুমের মত, মূর্চ্ছার মত, মৃত্যুর মত, তোমার দিকে তা'র কিছুই নেই! তবে এ জায়গায় তোমার সঙ্গে আমি কেমন করে' মিল্‌ব? না, না, হবে না মিলন, হবে না। এখানে নয়, এখানে

নয়। যেখানে আমি গাছ পালা পশু পাখী মাটি পাথর সমস্ত দেখ্‌চি সেইখানেই তোমাকে দেখ্‌ব।

রাজা। আচ্ছা দেখো---কিন্তু তোমাকে নিজে চিনে নিতে হবে; কেউ তোমাকে বলে' দেবে না---আর বলে' দিলেই বা বিশ্বাস কি!

সুদর্শনা। আমি চিনে নেব, চিনে নেব—লক্ষ লোকের মধ্যে চিনে নেব ভুল হবে না।

রাজা। আজ বসন্ত পূর্ণিমার উৎসবে তুমি তোমার প্রাসাদের শিখরের উপরে দাঁড়িয়ো—চেয়ে দেখো—আমার বাগানে সহস্র লোকের মধ্যে আমাকে দেখ্‌বার চেষ্টা কোরো।

সুদর্শনা। তাদের মধ্যে দেখা দেবে ত?

রাজা। বারবার করে' সকল দিক্ থেকেই দেখা দেব। সুরঙ্গমা!

(সুরঙ্গমার প্রবেশ)

সুরঙ্গমা। কি প্রভু?

রাজা। আজ বসন্ত পূর্ণিমার উৎসব।

সুরঙ্গমা। আমাকে কি কাজ করতে হবে?

রাজা। আজ তোমার সাজের দিন,—কাজের দিন নয়। আজ আমার পুষ্পবনের আনন্দে তোমাকে যোগ দিতে হবে।

সুরঙ্গমা। তাই হবে প্রভু।

রাজা। রাণী আজ আমাকে চোখে দেখ্‌তে চান।

সুরঙ্গমা। কোথায় দেখ্‌বেন?

রাজা। যেখানে পঞ্চমে বাঁশি বাজ্‌বে, ফুলের কেশরের ফাগ উড়বে, জ্যোৎস্নায় ছায়ায় গলাগলি হবে, সেই আমাদের দক্ষিণের কুঞ্জবনে।

সুরঙ্গমা। সে লুকোচুরির মধ্যে কি দেখা যাবে? সেখানে যে হাওয়া উতলা, সবই চঞ্চল, চোখে ধাঁদা লাগ্‌বে না?

রাজা। রাণীর কৌতূহল হয়েছে।

সুরঙ্গমা। কৌতূহলের জিনিষ হাজার হাজার আছে—তুমি কি তাদের সঙ্গে মিলে কৌতূহল মেটাবে? তুমি আমার তেমন রাজা নও! রাণী, তোমার কৌতূহলকে শেষকালে কেঁদে ফিরে আস্‌তে হবে।

গান

কোথা বাইরে দূরে যায় রে উড়ে হায় রে হায়,
তোমার চপল আঁখি বনের পাখী বনে পালায়।
আজি হৃদয় মাঝে যদি গো বাজে প্রেমের বাঁশি
তবে আপনি সেধে আপনা বেঁধে পরে সে ফাঁসি,
তবে ঘুচে গো ত্বরা ঘুরিয়া মরা হেথা হোথায়,
আহা আজি সে আঁখি বনের পাখী বনে পালায়।
চেয়ে দেখিস্‌নারে হৃদয়দ্বারে কে আসে যায়!
তোরা শুনিস্‌ কানে বারতা আনে দখিন বায়!

রাজা।

আজি ফুলের বাসে সুখের হাসে আকুল গানে
চির- বসন্ত যে তোমারি খোঁজে এসেছে প্রাণে।
তারে বাহিরে খুঁজি ঘুরিছ বুঝি পাগল প্রায়,
তোমার চপল আঁখি বনের পাখী বনে পালায়!

২

পথ

প্রথম পথিক। ওগো মশায়!

প্রহরী। কেন গো?

দ্বিতীয়। রাস্তা কোথায়? আমরা বিদেশী, আমাদের রাস্তা বলে' দাও!

প্রহরী। কিসের রাস্তা?

তৃতীয়। ঐ যে শুনেছি আজ কোথায় উৎসব হবে। কোন দিক্ দিয়ে যাওয়া যাবে?

প্রহরী। এখানে সব রাস্তাই রাস্তা। যে দিক্ দিয়ে যাবে ঠিক পৌঁছবে। সাম্‌নে চলে' যাও।

(প্রস্থান)

প্রথম। শোন একবার কথা শোন! বলে সবই এক রাস্তা। তাই যদি হবে তবে এতগুলোর দরকার ছিল কি?

দ্বিতীয়। তা ভাই রাগ করিস্ কেন? যে দেশের যেমন ব্যবস্থা! আমাদের দেশে ত রাস্তা নেই বল্লেই হয়— বাঁকাচোরা গলি, সে ত গোলকধাঁদা। আমাদের রাজা

বলে খোলা রাস্তা না থাকাই ভালো—রাস্তা পেলেই প্রজারা বেরিয়ে চলে' যাবে। এদেশে উল্টো, যেতেও কেউ ঠেকায় না, আস্‌তেও কেউ মানা করে না—তবু মানুষও ত ঢের দেখ্‌ছি—এমন খোলা পেলে আমাদের রাজ্য উজাড় হ'য়ে যেত।

প্রথম। ওহে জনার্দ্দন, তোমার ঐ একটা বড় দোষ।

জনার্দ্দন। কি দোষ দেখ্‌লে?

প্রথম। নিজের দেশের তুমি বড় নিন্দে কর। খোলা রাস্তাটাই বুঝি ভালো হ'ল? বল ত ভাই কৌণ্ডিল্য, খোলা রাস্তাটাকে বলে কিনা ভালো!

কৌণ্ডিল্য। ভাই ভবদত্ত, বরাবরই ত দেখে আস্‌চ জনার্দ্দনের ঐ এক রকম ত্যাড়া বুদ্ধি। কোন দিন বিপদে পড়বেন—রাজার কানে যদি যায় তাহ'লে ম'লে ওঁকে শ্মশানে ফেলবার লোক খুঁজে পাবেন না।

ভবদত্ত। আমাদের ত ভাই এই খোলা রাস্তার দেশে এসে অবধি খেয়ে-শুয়ে সুখ নেই—দিনরাত গা-ঘিন্‌ঘিন করচে। কে আস্‌চে কে যাচ্চে তা'র কোনো ঠিক-ঠিকানাই নেই—রাম রাম!

কৌণ্ডিল্য। সেও ঐ জনার্দ্দনের পরামর্শ শুনেই এসেছি। আমাদের গুষ্টিতে এমন কখনো হয় নি। আমার বাবাকে ত জান—কত্তবড় মহাত্মালোক ছিল—শাস্ত্র-মতে ঠিক ঊনপঞ্চাশ হাত মেপে গণ্ডী কেটে তা'র

মধ্যেই সমস্ত জীবনটা কাটিয়ে দিলে, একদিনের জন্যে তা'র বাইরে পা ফেলেনি। মৃত্যুর পর কথা উঠ্‌ল ঐ ঊনপঞ্চাশ হাতের মধ্যেই ত দাহ করতে হয়; সে এক বিষম মুস্কিল; শেষকালে শাস্ত্রী বিধান দিলে যে ঊনপঞ্চাশে যে দুটো অঙ্ক আছে তা'র বাইরে যাবার জো নেই, অতএব ঐ চার নয় ঊনপঞ্চাশকে উল্টে নিয়ে নয় চার চুরানব্বই করে' দাও; তবেই ত তা'কে বাড়ির বাইরে পোড়াতে পারি, নইলে ঘরেই দাহ করতে হ'ত। বাবা, এত আঁটাআঁটি! এ কি যে-সে দেশ পেয়েছ!

ভবদত্ত। বটেই ত, মরতে গেলেও ভাবতে হবে, এ কি কম কথা!

কৌণ্ডিল্য। সেই দেশের মাটিতে শরীর, তবু জনার্দ্দন বলে কি না, খোলা রাস্তাই ভালো!

(প্রস্থান)

(বালকগণকে লইয়া ঠাকুর্দ্দার প্রবেশ)

ঠাকুর্দ্দা। ওরে দক্ষিণে হাওয়ার সঙ্গে সমান পাল্লা দিতে হবে, হার মান্‌লে চল্‌বে না। আজ সব রাস্তাই গানে ভাসিয়ে দিয়ে চল্‌ব।

রাজা

গান

আজি দখিন দুয়ার খোলা—

এস হে, এস হে, এস হে, আমার

বসন্ত এস!

দিব হৃদয়-দোলায় দোলা,

এস হে, এস হে, এস হে, আমার

বসন্ত এস!

নব শ্যামল শোভন রথে

এস বকুল-বিছানো পথে,

এস, বাজায়ে ব্যাকুল বেণু,

মেখে পিয়াল ফুলের রেণু

এস হে এস হে এস হে আমার

বসন্ত এস!

এস ঘন পল্লবপুঞ্জে

এস হে এস হে এস হে!

এস বনমল্লিকাকুঞ্জে

এস হে এস হে এস হে!

মৃদু মধুর মদির হেসে

এস পাগল হাওয়ার দেশে

তোমার উতলা উত্তরীয়

তুমি আকাশে উড়ায়ে দিয়ো

এস হে এস হে এস হে আমার

বসন্ত এস ॥

(প্রস্থান)

(নাগরিকদল)

প্রথম। যা বলিস্ ভাই, আজকের দিনটাতে আমাদের রাজার দেখা দেওয়া উচিত ছিল। তা'র রাজ্যে বাস করচি একদিনও তা'কে দেখলুম না এ কি কম দুঃখের কথা!

দ্বিতীয়। ওর ভিতরকার কথাটা তোরা কেউ জানিস্ নে। কাউকে যদি না বলিস্ ত বলি।

প্রথম। এক পাড়াতেই ত বসত করচি কবে কা'র কথা কা'কে বলেচি। ঐ যে তোমাদের রাহুক দাদা কুয়ো খুঁড়তে খুঁড়তে গুপ্তধন পেলে সে কি আমি সাধ করে' ফাঁস করেচি? সব ত জান।

দ্বিতীয়। জানি বই কি, সেই জন্যেই ত বলচি। কথাটা যদি চেপে রাখ্‌তে পার ত বলি, নইলে বিপদ ঘট্‌তে পারে।

তৃতীয়। তুমিও ত আচ্ছা লোক হে বিরূপাক্ষ! বিপদই যদি ঘট্‌তে পারে তবে ঘটাবার জন্যে অত ব্যস্ত হও কেন? কে তোমার কথাটা নিয়ে দিনরাত্রি সাম্‌লে বেড়ায়?

বিরূপাক্ষ। কথাটা উঠে পড়ল নাকি সেই জন্যেই—তা বেশ, নাই বল্লেম। আমি বাজে কথা বল্‌বার লোকই নই। রাজা দেখা দেন্ না সে কথাটা তোমরাই তুল্‌লে, তাই ত আমি বল্লেম সাধে দেখা দেন্ না!

প্রথম। ওহে বিরূপাক্ষ, বলেই ফেল না।

বিরূপাক্ষ। তা তোমাদের কাছে বল্‌তে দোষ নেই, তোমরা হ'লে বন্ধু মানুষ। (মৃদুস্বরে) রাজাকে দেখ্‌তে বড় বিকট, সেই জন্যে পণ করেছে কাউকে দেখা দেবে না।

প্রথম। তাই ত বটে! আমরা বলি, ভালোরে ভালো, সকল দেশেই রাজাকে দেখে' দেশসুদ্ধ লোকের আত্মাপুরুষ বাঁশপাতার মত হাহা করে' কাঁপ্‌তে থাকে, আর আমাদেরই রাজাকে দেখা যায় না কেন! কিছু না হোক্ একবার যদি চোখ পাকিয়ে বলে, বেটার শির লেও, তাহ'লেও যে বুঝি রাজা বলে' একটা কিছু আছে। বিরূপাক্ষের কথাটা মনে নিচ্চে হে!

তৃতীয়। কিচ্ছু মনে নিচ্চে না, ওর শিকি পয়সাও বিশ্বাস করিনে।

বিরূপাক্ষ। কি বল্লে হে, বিশু, তুমি বল্‌তে চাও আমি মিছে কথা বলেছি?

বিশ্ববসু। তা বল্‌তে চাইনে কিন্তু কথাটা তাই বলে' মান্‌তে পারব না, এতে রাগই কর আর যাই কর।

বিরূপাক্ষ। তুমি মান্‌বে কেন? তুমি তোমার বাপখুড়োকেই মান না, এত বুদ্ধি তোমার! এ রাজত্বে রাজা যদি গা-ঢাকা দিয়ে না বেড়াত তাহ'লে কি এখানে তোমার ঠাঁই হ'ত? তুমি ত নাস্তিক বল্লেই হয়!

বিশ্ববসু। ওহে আস্তিক, অন্য রাজার দেশ হ'লে তোমার

জিভ কেটে কুকুরকে দিয়ে খাওয়াত, তুমি বল কিনা আমাদের রাজাকে বিকট দেখ্‌তে!

বিরূপাক্ষ। দেখ বিশু মুখ সাম্‌লে কথা কও!

বিশ্ববসু। মুখ যে কার সাম্‌লানো দরকার সে আর বলে' কাজ নেই!

প্রথম। চুপ্ চুপ্ এ সব ভালো হচ্চে না। আমাকে সুদ্ধ বিপদে ফেল্‌বে দেখ্‌চি। আমি এসব কথার মধ্যে নেই!

(প্রস্থান)

(ঠাকুর্দ্দাকে একদল লোকের টানাটানি করিয়া লইয়া প্রবেশ)

প্রথম। ঠাকুর্দ্দা, তোমাকে আজ এমন করে' সাজালে কে? মালাটি কোন নিপুণ হাতের গাঁথা?

ঠাকুর্দ্দা। ওরে বোকারা, সব কথাই কি খোলসা করে' বল্‌তে হবে না কি? কিছু ঢাকা থাক্‌বে না?

দ্বিতীয়। দরকার নেই দাদা, তোমার ত সব ফাঁস হয়েই আছে! আমাদের কবিকেশরী তোমার নামে যে গান বেঁধেচে শোননি বুঝি? সে যে ঘরে ঘরে রটে' গেছে।

ঠাকুর্দ্দা। একটা ঘরই যথেষ্ট, ঘরে ঘরে শুনে বেড়াবার কি সময় আছে?

তৃতীয়। ওটা তোমার নেহাৎ ফাঁকা বড়াই! ঠাকরুণদিদি

তোমাকে আঁচলে বেঁধে রাখে বটে। পাড়ার যেখানে যাই সেখানেই তুমি, ঘরে থাক কখন ?

ঠাকুর্দ্দা। ওরে তোদের ঠাকরুণদিদির আঁচল লম্বা আছে। পাড়ার যেখানে যাই সে আঁচল ছাড়িয়ে যাবার জো নেই! তা কবি কি বল্‌চেন শুনি।

তৃতীয়। তিনি বল্‌চেন,

গান

যেখানে রূপের প্রভা নয়নলোভা
সেখানে তোমার মতন ভোলা কে! (ঠাকুরদাদা)
যেখানে রসিক সভা পরম শোভা
সেখানে এমন রসের ঝোলা কে! (ঠাকুরদাদা)

ঠাকুর্দ্দা। আরে চুপ্ চুপ্! এমন বসন্তের দিনে তোরা এ কি গান ধরলি রে ?

প্রথম। কেন ধরলুম জান না ?

গান

যেখানে গলাগলি কোলাকুলি
তোমারি বেচাকেনা সেই হাটে,
পড়ে না পদধূলি পথ ভুলি
যেখানে ঝগড়া করে ঝগ্‌ড়াটে,
যেখানে ভোলাভুলি খোলাখুলি
সেখানে তোমার মতন খোলা কে—
ঠাকুরদাদা!

ঠাকুর্দ্দা। যদি তোরা তোদের সেই কবির কাছে বিধান নিতিস্ তাহ'লে শুনতে পেতিস্ এই ফাল্গুন মাসের দিনে ঠাকুর্দ্দা প্রভৃতি প্যুরোনো জিনিষ মাত্রই একেবারে বর্জ্জনীয়। আমার নামে গান বেঁধে আজ রাগ-রাগিণীর অপব্যয় করিস নে, তোরা সরস্বতীর বীণার তারে মরচে ধরিয়ে দিবি যে!

দ্বিতীয়। ঠাকুর্দ্দা, তুমি ত রাস্তাতেই সভা জমালে, উৎসবে যাবে কখন্? চল আমাদের দক্ষিণ বনে!

ঠাকুর্দ্দা। ভাই, আমার ঐ দশা, আমি রাস্তা থেকেই চাখ্‌তে চাখ্‌তে চলি, তা'র পরে ভোজটা ত আছেই। আদাবন্তে চ মধ্যে চ।

দ্বিতীয়। দেখ দাদা, আজকের দিনে মনে একটা কথা বড় লাগ্‌চে।

ঠাকুর্দ্দা। কি বল্ দেখি।

দ্বিতীয়। এবার দেশবিদেশের লোক এসেচে, সবাই বল্‌চে সবই দেখচি ভালো কিন্তু রাজা দেখিনে কেন? কাউকে জবাব দিতে পারিনে। আমাদের দেশে ঐটে একটা বড় ফাঁকা র'য়ে গেছে।

ঠাকুর্দ্দা। ফাঁকা! আমাদের দেশে রাজা এক জায়গায় দেখা দেয় না বলেই ত সমস্ত রাজাটা একেবারে রাজায় ঠাসা হ'য়ে রয়েছে—তা'কে বল ফাঁকা! সে যে আমাদের সবাইকেই রাজা করে' দিয়েছে! এই

যে অন্য রাজাগুলো তা'রা ত উৎসবটাকে দলে' মলে' ছারখার করে' দিলে—তাদের হাতিঘোড়া লোক-লস্করের তাড়ায় দক্ষিণ হাওয়ার দাক্ষিণ্য আর রইল না, বসন্তর যেন দম আটকাবার জো হয়েচে! কিন্তু আমাদের রাজা নিজে জায়গা জোড়ে না, সবাইকে জায়গা ছেড়ে দেয়। কবিকেশরার সেই গানটা ত জানিস্?

গান

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে
নইলে মোদের রাজার সনে মিল্‌ব কি স্বত্বে!
(আমরা সবাই রাজা

আমরা যা খুসি তাই করি
তবু তাঁর খুসিতেই চরি,
আমরা নই বাঁধা নই দাসের রাজার ত্রাসের দাসত্বে
নইলে মোদের রাজার সনে মিল্‌ব কি স্বত্বে!
(আমরা সবাই রাজা

রাজা সবারে দেন মান
সে মান আপনি ফিরে পান,
মোদের খাটো করে' রাখেনি কেউ কোনো অসত্যে,
নইলে মোদের রাজার সনে মিল্‌ব কি স্বত্বে!
(আমরা সবাই রাজা

আমরা চল্‌ব আপন মতে
শেষে মিল্‌ব তাঁরি পথে
মোরা মরব না কেউ বিফলতার বিষম আবর্ত্তে
নইলে মোদের রাজার সনে মিল্‌ব কি স্বত্বে!
(আমরা সবাই রাজা)

তৃতীয়। কিন্তু দাদা, যা বল তাঁকে দেখ্‌তে পায় না বলে' লোকে অনায়াসে তাঁর নামে যা খুসি বলে সেইটে অসহ্য হয়।

প্রথম। এই দেখ না, আমাকে গাল দিলে শাস্তি আছে কিন্তু রাজাকে গাল দিলে কেউ তা'র মুখ বন্ধ করবারই নেই।

ঠাকুর্দ্দা। ওর মানে আছে; প্রজার মধ্যে যে রাজাটুকু আছে তা'রই গায়ে আঘাত লাগে তা'র বাইরে যিনি তাঁর গায়ে কিছুই বাজে না। সূর্য্যের যে তেজ প্রদীপে আছে তা'তে ফুঁটুকু সয় না, কিন্তু হাজার লোকে মিলে সূর্য্যে ফুঁ দিলে সূর্য্য অম্লান হ'য়েই থাকেন।

(বিশ্ববসু ও বিরূপাক্ষের প্রবেশ)

বিশ্ববসু। এই যে ঠাকুর্দ্দা, এই দেখ, এই লোকটা রটিয়ে বেড়াচ্চে আমাদের রাজাকে কুৎসিত দেখ্‌তে, তাই তিনি দেখা দেন্ না।

ঠাকুর্দ্দা। এতে রাগ কর কেন বিশু! ওর রাজা কুৎসিত বই কি, নইলে তা'র রাজ্যে বিরূপাক্ষের মত অমন

চেহারা থাকে কেন? স্বয়ং ওর বাপ মাও ত ওকে কার্ত্তিক নাম দেননি। ও আয়নাতে যেমন আপনার মুখটি দেখে আর রাজার চেহারা তেমনি ধ্যান করে।

বিরূপাক্ষ। ঠাকুর্দ্দা, আমি নাম করব না কিন্তু এমন লোকের কাছে খবরটা শুনেছি যাকে বিশ্বাস না করে' থাকবার জো নেই।

ঠাকুর্দ্দা। নিজের চেয়ে কা'কে বেশি বিশ্বাস করেন বল!

বিরূপাক্ষ। না, আমি তোমাকে প্রমাণ করে' দিতে পারি।

প্রথম। লোকটার লজ্জা নেই হে! একে ত যা না বলবার তাই বলে, তা'র পরে আবার সেটা প্রমাণ করে' দিতে চায়!

দ্বিতীয়। ওহে, দাও না ওকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে একেবারে মাটি-প্রমাণ করে' দাও না!

ঠাকুর্দ্দা। আরে ভাই, রাগ কোরো না। ওর রাজা কুৎসিত এই বলে' বেড়িয়েই ও বেচারা আজ উৎসব কর্ত্তে বেরিয়েছিল। যাও ভাই বিরূপাক্ষ, ঢের লোক পাবে যারা তোমার কথা বিশ্বাস করবে, তাদের নিয়ে দল বেঁধে আজ আমোদ করগে।

(প্রস্থান)

(বিদেশী দলের পুনঃপ্রবেশ)

কৌণ্ডিল্য। সত্যি বলচি ভাই, রাজা আমাদের এমনি অভ্যেস হ'য়ে গেছে যে, এখানে কোথাও রাজা না

দেখে মনে হচ্চে দাঁড়িয়ে আছি কিন্তু পায়ের তলায় যেন মাটি নেই!

ভবদত্ত। দেখ ভাই কৌণ্ডিল্য, আসল কথাটা হচ্চে এদের মূলেই রাজা নেই। সকলে মিলে একটা গুজব রটিয়ে রেখেছে।

কৌণ্ডিল্য। আমারো ত তাই মনে হয়েছে। আমরা ত জানি—দেশের মধ্যে সকলের চেয়ে বেশি করে' চোখে পড়ে রাজা; নিজেকে খুব কষে' না দেখিয়ে সে ত ছাড়ে না।

জনার্দ্দন। কিন্তু এ রাজ্যে আগাগোড়া যেমন নিয়ম দেখ্‌ছি রাজা না থাক্‌লে ত এমন হয় না।

ভবদত্ত। এতকাল রাজার দেশে বাস করে' এই বুদ্ধি হ'ল তোমার? নিয়মই যদি থাক্‌বে তাহ'লে রাজা থাক্‌বার আর দরকার কি?

জনার্দ্দন। এই দেখ না আজ এত লোক মিলে আনন্দ করচে, রাজা না থাক্‌লে এরা এমন করে' মিলতেই পারত না।

ভবদত্ত। ওহে জনার্দ্দন, আসল কথাটাই যে তুমি এড়িয়ে যাচ্চ। একটা নিয়ম আছে সেটা ত দেখেচি, উৎসব হচ্চে সেটাও স্পষ্ট দেখা যাচ্চে, সেখানে ত কোনো গোল বাধ্‌চে না—কিন্তু রাজা কোথায়, তা'কে দেখ্‌লে কোথায় সেইটে বল!

জনার্দ্দন। আমার কথাটা হচ্চে এই যে, তোমরা ত এমন রাজ্য জান যেখানে রাজা কেবল চোখেই দেখা যায় কিন্তু রাজ্যের মধ্যে তা'র কোনো পরিচয় নেই, সেখানে কেবল ভূতের কীর্ত্তন—কিন্তু এখানে দেখ—

কৌণ্ডিল্য। আবার ঘুরে ফিরে সেই একই কথা! তুমি ভবদত্তর আসল কথাটার উত্তর দাও না হে—হাঁ, কি, না? রাজাকে দেখেছ, কি, দেখনি?

ভবদত্ত। রেখে দাও ভাই কৌণ্ডিল্য। ওর সঙ্গে মিথ্যে বকাবকি করা। ওর ন্যায়শাস্ত্রটা পর্য্যন্ত এ-দেশী রকমের হ'য়ে উঠ্‌চে। বিনা চক্ষে ও যখন দেখ্‌তে সুরু করেচে তখন আর ভরসা নেই। বিনা অন্নে কিছু দিন ওকে আহার করতে দিলে আবার বুদ্ধিটা সাধারণ লোকের মত পরিষ্কার হ'য়ে আস্‌তে পারে।

(প্রস্থান)

বাউলের দল

আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
তাই হেরি তায় সকলখানে।
আছে সে নয়ন-তারায় আলোক ধারায়, তাই না হারায়,
ওগো তাই দেখি তায় যেথায় সেথায়
তাকাই আমি যেদিকপানে॥

আমি তা'র মুখের কথা
শুনব বলে' গেলাম কোথা,
শোনা হ'ল না, শোনা হ'ল না,
আজ ফিরে এসে নিজের দেশে
এই যে শুনি,
শুনি তাহার বাণী আপন গানে ॥
কে তোরা খুঁজিস্ তা'রে
কাঙাল-বেশে দ্বারে দ্বারে,
দেখা মেলে না মেলে না,—
ও তোরা আয়রে ধেয়ে দেখ্‌রে চেয়ে
আমার বুকে—
ওরে দেখ্‌রে আমার তুই নয়ানে ॥

(প্রস্থান)

(একদল পদাতিক)

১ম পদাতিক। সরে' যাও সব সরে' যাও! তফাৎ যাও!

১ম পথিক। ইস্ তাই ত! মস্তলোক বটে! লম্বা পা ফেলে চল্‌চেন! কেন রে বাপু সরব কেন? আমরা সব পথের কুকুর না কি?

২য় পদাতিক। আমাদের রাজা আস্‌চেন।

২য় পথিক। রাজা? কোথাকার রাজা?

১ম পদাতিক। আমাদের এই দেশের রাজা।

১ম পথিক। লোকটা পাগল হ'ল নাকি? আমাদের দেশের

রাজা পাইক নিয়ে হাঁকতে হাঁকতে আবার রাস্তায় কবে বেরয় ?

২য় পদাতিক। মহারাজ আজ আর গোপন থাকবেন না, তিনি স্বয়ং আজ উৎসব করবেন।

২য় পথিক। সত্যি না কি ভাই ?

২য় পদাতিক। ঐ দেখ না নিশেন উড়চে।

২য় পথিক। তাই ত রে, ওটা নিশেনই ত বটে।

২য় পদাতিক। নিশেনে কিংশুক ফুল আঁকা আছে দেখ্চ না ?

২য় পথিক। ওরে কিংশুক ফুলই ত বটে, মিথ্যে বলেনি—একেবারে লাল টক্‌টক্‌ করচে !

১ম পদাতিক। তবে ! কথাটা যে বড় বিশ্বাস হ'ল না।

২য় পথিক। না দাদা আমি ত অবিশ্বাস করি নি। ঐ কুম্ভই গোলমাল করেছিল। আমি একটি কথাও বলিনি।

১ম পদাতিক। বেটা বোধ হয় শূন্যকুম্ভ, তাই আওয়াজ বেশি !

২য় পদাতিক। লোকটা কে হে ? তোমাদের কে হয় ?

২য় পথিক। কেউ না, কেউ না ! আমাদের গ্রামের যে মোড়ল ও তা'র খুড়শ্বশুর—অন্য পাড়ায় বাড়ি।

২য় পদাতিক। হাঁ হাঁ খুড়শ্বশুর গোছের চেহারা বটে, বুদ্ধিটাও নেহাৎ খুড়শ্বশুরে ধাঁচার।

কুম্ভ। অনেক দুঃখে বুদ্ধিটা এই রকম হয়েছে! এই যে সেদিন কোথা থেকে এক রাজা বেরল, নামের গোড়ায় তিনশো পঁয়তাল্লিশটা শ্রী লাগিয়ে ঢাক পিট্‌তে পিট্‌তে সহর ঘুরে বেড়াল—আমি তা'র পিছনে কি কম ফিরেছি? কত ভোগ দিলেম, কত সেবা করলেম, ভিটেমাটি বিকিয়ে যাবার জো হ'ল। শেষকালে তা'র রাজাগিরি রইল কোথায়? লোকে যখন তা'র কাছে তালুক চায়, মুলুক চায় সে তখন পাঁজিপুঁথি খুলে শুভদিন কিছুতেই খুঁজে পায় না। কিন্তু আমাদের কাছে খাজনা নেবার বেলায় মঘা অশ্লেষা ত্র্যস্পর্শ কিছুই ত বাধত না।

২য় পদাতিক। হাঁ হে কুম্ভ, আমাদের রাজাকে তুমি সেই রকম মেকি রাজা বল্‌তে চাও!

১ম পদাতিক। ওহে খুড়শ্বশুর, এবার খুড়শাশুড়ির কাছে থেকে বিদায় নিয়ে এস গে, আর দেরি নেই।

কুম্ভ। না বাবা, রাগ কোরো না। আমি কান মলচি, নাকে খৎ দিচ্চি—যতদূর সরতে বল তত দূরই সরে' দাঁড়াতে রাজি আছি।

২য় পদাতিক। আচ্ছা বেশ, এই খানে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাক। রাজা এলেন বলে'—আমরা এগিয়ে গিয়ে রাস্তা ঠিক করে' রাখি।

(পদাতিকদের প্রস্থান)

২য় পথিক। কুম্ভ, তোমার ঐ মুখের দোষেই তুমি মরবে!

কুম্ভ। না ভাই মাধব, ও মুখের দোষ নয়, ও কপালের দোষ। যেবারে মিছে রাজা বেরল একটি কথাও কইনি—অত্যন্ত ভালমানুষের মত নিজের সর্ব্বনাশ করেছি—আর এবার হয়ত বা সত্যি রাজা বেরিয়েছে তাই বেফাঁস কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। ওটা কপাল!

মাধব। আমি এই বুঝি, রাজা সত্যি হোক্ মিথ্যে হোক মেনে চল্‌তেই হবে। আমরা কি রাজা চিনি যে বিচার করব! অন্ধকারে ঢেলা মারা যত বেশি মারবে একটা না একটা লেগে যাবে। আমি ভাই একধার থেকে গড় করে' যাই—সত্যি হ'লে লাভ; মিথ্যে হ'লেই বা লোকসান কি!

কুম্ভ। ঢেলাগুলো নেহাৎ ঢেলা হ'লে ভাবনা ছিল না—দামী জিনিষ—বাজে খরচ করতে গিয়ে ফতুর হ'তে হয়।

মাধব। ঐ যে আস্‌চেন রাজা। আহা রাজার মত রাজা বটে! কি চেহারা! যেন ননীর পুতুল! কেমন হে কুম্ভ, এখন কি মনে হচ্চে।

কুম্ভ। দেখাচ্চে ভালো—কি জানি ভাই হ'তে পারে।

মাধব। ঠিক যেন রাজাটি গড়ে' রেখেছে! ভয় হয় পাছে রোদ্দুর লাগ্‌লে গলে' যায়!

(রাজবেশধারীর প্রবেশ)

মাধব। জয় মহারাজের! দর্শনের জন্যে সকাল থেকে দাঁড়িয়ে। দয়া রাখ্‌বেন।

কুম্ভ। বড় ধাঁদা ঠেকচে, ঠাকুর্দ্দাকে ডেকে আনি।

(প্রস্থান)

(আর একদল পথিক)

প্রথম। ওরে রাজা রে রাজা! দেখ্‌বি আয়।

দ্বিতীয়। মনে রেখো রাজা, আমি কুশলাবস্তুর উদয়দত্তের নাতি। আমার নাম বিরাজ দত্ত। রাজা বেরিয়েছে শুনেই ছুটেছি, লোকের কারো কথায় কান দিইনি—আমি সক্কলের আগে তোমাকে মেনেছি।

তৃতীয়। শোন একবার, আমি যে ভোর থেকে এখানে দাঁড়িয়ে—তখনো কাক ডাকেনি—এতক্ষণ ছিলে কোথায়? রাজা, আমি বিক্রমস্থলীর ভদ্রসেন; ভক্তকে স্মরণ রেখো!

রাজবেশী। তোমাদের ভক্তিতে বড় প্রীত হলেম।

বিরাজ দত্ত। মহারাজ, আমাদের অভাব বিস্তর—এতদিন দর্শন পাইনি জানাব কা'কে?

রাজবেশী। তোমাদের সমস্ত অভাব মিটিয়ে দেব।

(প্রস্থান)

১ম পথিক। ওরে পিছিয়ে থাক্‌লে চল্‌বে না—ভিড়ে মিশে গেলে রাজার চোখে পড়্‌ব না!

২য় পথিক। দেখ্ দেখ্ একবার নরোত্তমের কাণ্ডখানা দেখ্! আমরা এত লোক আছি সবাইকে ঠেলেঠুলে কোথা থেকে এক তালপাতার পাখা নিয়ে রাজাকে বাতাস কর্‌তে লেগে গেছে!

মাধব। তাই ত হে লোকটার আস্পর্দ্ধা ত কম নয়!

২য় পথিক। ওকে জোর করে' ধরে' সরিয়ে দিতে হচ্চে—ও কি রাজার পাশে দাঁড়াবার যুগ্যি!

মাধব। ওহে রাজা কি আর এটুকু বুঝ্‌বে না? এ যে অতিভক্তি!

১ম পথিক। না হে না—রাজারা বোঝে না কিছু—হয় ত বা ঐ তালপাখার হাওয়া খেয়েই ভুল্‌বে।

(সকলের প্রস্থান)

(ঠাকুর্দ্দাকে লইয়া কুম্ভ)

কুম্ভ। এখনি এই রাস্তা দিয়েই যে গেল।

ঠাকুর্দ্দা। রাস্তা দিয়ে গেলেই রাজা হয় না কি রে।

কুম্ভ। না দাদা, একেবারে স্পষ্ট চোখে দেখা গেল—একজন না দুজন না, রাস্তার দুধারের লোক তাঁকে দেখে নিয়েছে।

ঠাকুর্দ্দা। সেই জন্যেই ত সন্দেহ। কবে আমার রাজা রাস্তার লোকের চোখ ধাঁদিয়ে বেড়ায়! এমন উৎপাত ত কোনোদিন করে না!

কুম্ভ। তা আজকে যদি মর্জি হ'য়ে থাকে বলা যায় কি!

ঠাকুর্দ্দা। বলা যায় রে বলা যায়—আমার রাজার মর্জ্জি বরাবর ঠিক আছে—ঘড়ি ঘড়ি বদলায় না!

কুম্ভ। কিন্তু কি বল্‌ব দাদা—একেবারে ননীর পুতুলটি! ইচ্ছে করে সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে তাঁকে ছায়া করে' রাখি।

ঠাকুর্দ্দা। তোর এমন বুদ্ধি কবে হ'ল? আমার রাজা ননীর পুতুল, আর তুই তাঁকে ছায়া করে' রাখ্‌বি!

কুম্ভ। যা বল দাদা, দেখ্‌তে বড় সুন্দর—আজ ত এত লোক জুটেছে অমনটি কাউকে দেখলুম না!

ঠাকুর্দ্দা। আমার রাজা যদি না দেখা দিত তোদের চোখেই পড়ত না। দশের সঙ্গে তাঁকে আলাদা বলে' চেনাই যায় না—সে সকলের সঙ্গেই মিশে যায় যে!

কুম্ভ। ধ্বজা দেখ্‌তে পেলুম যে গো!

ঠাকুর্দ্দা। ধ্বজায় কি দেখ্‌লি?

কুম্ভ। কিংশুক ফুল আঁকা—একেবারে চোখ ঠিক্‌রে যায়।

ঠাকুর্দ্দা। আমার রাজার ধ্বজায় পদ্মফুলের মাঝখানে বজ্র আঁকা।

কুম্ভ। লোকে বলে, এই উৎসবে রাজা বেরিয়েছে।

ঠাকুর্দ্দা। বেরিয়েছে বই কি। কিন্তু সঙ্গে পাইক নেই, বাগ্নি নেই, আলো নেই, কিছু না।

কুম্ভ। কেউ বুঝি ধরতেই পারে না।

ঠাকুর্দ্দা। হয় ত কেউ কেউ পারে!

কুম্ভ। যে পারে সে বোধ হয় যা চায় তাই পায়।

ঠাকুর্দ্দা। সে যে কিচ্ছু চায় না। ভিক্ষুকের কর্ম্ম নয় রাজাকে চেনা। ছোট ভিক্ষুক বড় ভিক্ষুককেই রাজা বলে' মনে করে' বসে। আজ যে লোকটা গা-ভরা গয়না পরে' রাস্তার দুই ধারের লোকের দুই চক্ষুর কাছে ভিক্ষে চেয়ে বেড়িয়েছে তোরা লোভীরা তা'কেই রাজা বলে' ঠাউরে বসে' আছিস্!—ঐ যে আমার পাগ্‌লা আস্‌চে। আয় ভাই আয়—আর ত বাজে বক্‌তে পারিনে— একটু মাতামাতি করে' নেওয়া যাক্!

(পাগলের প্রবেশ ও গান)

তোরা যে যা বলিস্ ভাই
আমার সোনার হরিণ চাই।
সেই মনোহরণ চপল চরণ
সোনার হরিণ চাই॥
সে যে চম্‌কে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায়
যায় না তা'রে বাঁধা,
তা'র নাগাল পেলে পালায় ঠেলে
লাগায় চোখে ধাঁদা,
তবু ছুট্‌ব পিছে মিছে মিছে
পাই বা নাহি পাই
আমি আপন মনে মাঠে বনে
উধাও হ'য়ে ধাই॥

তোরা পাবার জিনিষ হাটে কিনিস
রাখিস্ ঘরে ভরে',
যাহা যায় না পাওয়া তারি হাওয়া
লাগ্‌ল কেন মোরে!
আমার যা ছিল তা দিলেম কোথা
যা নেই তারি ঝোঁকে,
আমার ফুরয় পুঁজি, ভাবিস্ বুঝি
মরি তাহার শোকে!
ওরে আছি সুখে হাস্যমুখে
দুঃখ আমার নাই।
আমি আপনমনে মাঠে বনে
উধাও হ'য়ে ধাই॥

৩

কুঞ্জবনের দ্বারে

ঠাকুর্দ্দা ও উৎসববালকগণ

ঠাকুর্দ্দা। ওরে দরজার কাছে এসেছি এবার খুব কষে দরজায় ঘা লাগা।

গান

আজি কমলমুকুলদল খুলিল।
তুলিল রে তুলিল
মানসসরসে রস-পুলকে,
পলকে পলকে ঢেউ তুলিল।
গগন মগন হ'ল গন্ধে,
সমীরণ মূর্চ্ছে আনন্দে,
গুন গুন গুঞ্জন ছন্দে
মধুকর ঘিরি ঘিরি বন্দে;—
নিখিল ভুবন মন ভুলিল—
মন ভুলিল রে
মন ভুলিল।

(প্রস্থান)

(অবন্তী কোশল কাঞ্চী প্রভৃতি রাজগণ)

অবন্তী। এখানকার রাজা কি আমাদেরও দেখা দেবে না?

কাঞ্চী। এর রাজত্ব করবার প্রণালী কি রকম? রাজার বনে উৎসব, সেখানেও সাধারণ লোকের কা'রো কোনো বাধা নেই?

কোশল। আমাদের জন্যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জায়গা তৈরি করে' রাখা উচিত ছিল।

কাঞ্চী। জোর করে' নিজেরা তৈরি করে' নেব।

কোশল। এই সব দেখেই সন্দেহ হয় এখানে রাজা নেই একটা ফাঁকি চলে' আসচে।

অবন্তী। ওহে তা হ'তে পারে কিন্তু এখানকার মহিষী সুদর্শনা নিতান্ত ফাঁকি নয়।

কোশল। সেই লোভেই ত এসেছি। যিনি দেখা দেন না তাঁর জন্যে আমার বিশেষ কিছু ঔৎসুক্য নেই, কিন্তু যিনি দেখবার যোগ্য তাঁকে না দেখে ফিরে গেলে ঠক্‌তে হবে।

কাঞ্চী। একটা ফন্দী দেখাই যাক্ না।

অবন্তী। ফন্দী জিনিষটা খুব ভালো, যদি তা'র মধ্যে নিজে আট্‌কা না পড়া যায়।

কাঞ্চী। একি ব্যাপার! নিশেন উড়িয়ে এদিকে কে আসে? এ কোথাকার রাজা?

(পদাতিকগণের প্রবেশ)

কাঞ্চী। তোমাদের রাজা কোথাকার?

১ম পদাতিক। এই দেশের। তিনি আজ উৎসব করতে বেরিয়েছেন।

(প্রস্থান)

কোশল। এ কি কথা! এখানকার রাজা বেরিয়েছে!

অবন্তী। তাই ত! তাহ'লে এঁকে দেখেই ফিরতে হবে—অন্য দর্শনীয়টা রইল।

কাঞ্চী। শোনো কেন? এখানে রাজা নেই বলেই যে-খুসি নির্ভাবনায় আপনাকে রাজা বলে' পরিচয় দেয়। দেখ্‌চ না, যেন সেজে এসেছে—অত্যন্ত বেশি সাজ।

অবন্তী। কিন্তু লোকটাকে দেখাচ্চে ভালো, চোখ ভোলাবার মত চেহারাটা আছে।

কাঞ্চী। চোখ ভুল্‌তে পারে কিন্তু ভালো করে' তাকালেই ভুল থাকে না। আমি তোমাদের সাম্‌নেই ওর ফাঁকি ধরে' দিচ্চি।

(রাজবেশীর প্রবেশ)

রাজবেশী। রাজগণ, স্বাগত? এখানে তোমাদের অভ্যর্থনার কোনো ত্রুটি হয়নি ত?

রাজগণ। (কপট বিনয়ে নমস্কার করিয়া) কিছু না।

কাঞ্চী। যে অভাব ছিল তা মহারাজের দর্শনেই পূর্ণ হয়েছে।

রাজবেশী। আমি সাধারণের দর্শনীয় নই কিন্তু তোমরা আমার অনুগত, এই জন্য একবার দেখা দিতে এলুম।

কাঞ্চী। অনুগ্রহের এত আতিশয্য সহ্য করা কঠিন।

রাজবেশী। আমি অধিকক্ষণ থাক্‌ব না।

কাঞ্চী। সেটা অনুভবেই বুঝেছি—বেশিক্ষণ স্থায়ী হবার ভাব দেখ্‌চিনে।

রাজবেশী। ইতিমধ্যে যদি কোনো প্রার্থনা থাকে—

কাঞ্চী। আছে বই কি। কিন্তু অনুচরদের সাম্‌নে জানাতে লজ্জা বোধ করি।

রাজবেশী। (অনুবর্ত্তীদের প্রতি) ক্ষণকালের জন্য তোমরা দূরে যাও!—এইবার তোমাদের প্রার্থনা অসঙ্কোচে জানাতে পার।

কাঞ্চী। অসঙ্কোচেই জানাব—তোমারো যেন লেশমাত্র সঙ্কোচ না হয়।

রাজবেশী। না, সে আশঙ্কা কোরো না।

কাঞ্চী। এস তবে—মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে আমাদের প্রত্যেককে প্রণাম কর।

রাজবেশী। বোধ হচ্চে আমার ভৃত্যগণ বারুণী মদ্যটা রাজশিবিরে কিছু মুক্ত হস্তেই বিতরণ করেছে।

কাঞ্চী। ভণ্ডরাজ, মদ যাকে বলে সেটা তোমার ভাগেই অতিমাত্রায় পড়েছে, সেই জন্যেই এখন ধূলোয় লোটাবার অবস্থা হয়েছে।

রাজবেশী। রাজগণ, পরিহাসটা রাজোচিত নয়।

কাঞ্চী। পরিহাসের অধিকার যাদের আছে তাঁরা নিকটেই প্রস্তুত আছে। সেনাপতি!

রাজবেশী। আর প্রয়োজন নেই। স্পষ্টই দেখ্‌তে পাচ্চি আপনারা আমার প্রণম্য। মাথা আপনিই নত হচ্চে, কোনো তীক্ষ্ণ উপায়ে তাঁকে ধূলায় টান্‌বার দরকার হবে না। আপনারা যখন আমাকে চিনেচেন তখন আমিও আপনাদের চিনে নিলুম। অতএব এই আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। যদি দয়া করে' পালাতে দেন তাহ'লে বিলম্ব করব না।

কাঞ্চী। পালাবে কেন? তোমাকেই আমরা এখানকার রাজা করে' দিচ্চি—পরিহাসটা শেষ করেই যাওয়া যাক্। দলবল কিছু আছে?

রাজবেশী। আছে। রাস্তার লোক যে দেখ্‌চে আমার পিছনে ছুটে আস্‌চে। আরম্ভে যখন আমার দল বেশি ছিল না তখন সবাই আমাকে সন্দেহ করছিল—লোক যত বেড়ে গেল সন্দেহ ততই দূর হ'ল। এখন ভিড়ের লোক নিজেদের ভিড় দেখেই মুগ্ধ হ'য়ে যাচ্চে, আমাকে কোনো কষ্ট পেতে হচ্চে না।

কাঞ্চী। বেশ কথা। এখন থেকে আমরা তোমার সাহায্য করব। কিন্তু তোমাকে আমাদেরও একটা কাজ করে' দিতে হবে।

রাজবেশী। আপনাদের দত্ত আদেশ এবং মুকুট আমি মাথায় করে' রাখব।

কাঞ্চী। আপাতত আর কিছু চাইনে, রাণী সুদর্শনাকে দেখ্‌তে চাই—সেইটে তোমাকে করে' দিতে হবে।

রাজবেশী। যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি হবে না।

কাঞ্চী। তোমার সাধ্যের উপর ভরসা নেই, আমাদের বুদ্ধিমত চল্‌তে হবে। আচ্ছা, এখন তুমি কুঞ্জে প্রবেশ করে' রাজ আড়ম্বরে উৎসব করগে।

(রাজগণ ও রাজবেশীর প্রস্থান)

(ঠাকুর্দ্দা ও কুম্ভের প্রবেশ)

কুম্ভ। ঠাকুর্দ্দা, তোমার কথা আমি তেমন বুঝিনে কিন্তু তোমাকে বুঝি। তা আমার রাজায় কাজ নেই, তোমার পাছেই র'য়ে গেলুম, কিন্তু ঠক্‌লুম না ত?

ঠাকুর্দ্দা। আমাকে নিয়েই যদি সম্পূর্ণ চলে তাহ'লে ঠক্‌লিনে, আমার চেয়ে বেশি যদি কিছু দরকার থাকে তাহ'লে ঠক্‌লি বই কি।

কুম্ভ। ঠাকুর্দ্দা, উৎসব সুরু হয়েছে, এবার ভিতরে চল।

ঠাকুর্দ্দা। না রে আগে দ্বারের কাজটা সেরে নিই, তা'র পরে ভিতরে। এখানে সকল আগন্তুকের সঙ্গে একবার মিলে নিতে হবে। ঐ আমার অকিঞ্চনের দল আস্‌চে।

অকিঞ্চনের দল। ঠাকুর্দ্দা, তোমাকে খুঁজে আজ আমাদের দেরি হ'য়ে গেল।

ঠাকুর্দ্দা। আজ আমি দ্বারে, আজ আমাকে অন্য জায়গায় খুঁজ্‌লে মিল্‌বে কেন?

প্রথম। তুমি যে আমাদের উৎসবের সূত্রধর।

ঠাকুর্দ্দা। তাই ত আমি দ্বারে।

দ্বিতীয়। আজ তুমি বুঝি এই কুম্ভ সুধন মুষল তোষল এদের নিয়েই আছ? দেশ বিদেশের কত রাজা এল তাদের সঙ্গে পরিচয় করে' নেবে না।

ঠাকুর্দ্দা। ভাই, এরা সব সরল লোক—চুপ করে' কেবল এদের পাশে দাঁড়িয়ে থাক্‌লেও এরা ভাবে এদের যেন কত সেবা করলুম, আর যারা মস্ত লোক তাদের কাছে মুণ্ডটাও যদি খসিয়ে দেওয়া যায় তা'রা মনে করে লোকটা বাজে জিনিষ দিয়ে ঠকিয়ে গেল।

প্রথম। এখন চল দাদা!

ঠাকুর্দ্দা। না ভাই, আজ আমার এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চলা। সকলের চলাচলেই আমার মন ছুট্‌চে। তবে আর কি, এইবারে সুরু করা যাক্!

সকলের গান

মোদের কিছু নাই রে নাই,
আমরা ঘরে বাইরে গাই
তাইরে নাইরে নাইরে না।

রাজা

যতই দিবস যায় রে যায়
গাই রে সুখে হায় রে হায়
তাইরে নাইরে নাইরে না।
যারা সোনার চোরাবালির পরে
পাকা ঘরের ভিত্তি গড়ে
তাদের সামনে মোরা গান গেয়ে যাই
তাইরে নাইরে নাইরে না।
যখন থেকে থেকে গাঁঠের পানে
গাঁঠকাটারা দৃষ্টি হানে,
তখন শূন্য ঝুলি দেখায়ে গাই
তাইরে নাইরে নাইরে না।
যখন দ্বারে আসে মরণ বুড়ি,
মুখে তাহার বাজাই তুড়ি,
তখন তান দিয়ে গান জুড়ি রে ভাই
তাইরে নাইরে নাইরে না।
এ যে বসন্তরাজ এসেছে আজ
বাইরে তাহার উজ্জ্বল সাজ,
ওরে অন্তরে তা'র বৈরাগী গায়
তাইরে নাইরে নাইরে না।
সে যে উৎসবদিন চুকিয়ে দিয়ে
ঝরিয়ে দিয়ে শুকিয়ে দিয়ে
দুই রিক্ত হাতে তাল দিয়ে গায়
তাইরে নাইরে নাইরে না।

(প্রস্থান

(এক দল স্ত্রীলোকের প্রবেশ।

প্রথমা। ঠাকুর্দ্দা।

ঠাকুর্দ্দা। কি ভাই।

প্রথমা। আজ বসন্তপূর্ণিমার চাঁদের সঙ্গে মালা বদল করব এই পণ করে' ঘরে থেকে বেরিয়েছি।

ঠাকুর্দ্দা। কিন্তু পণ রক্ষা হওয়া কঠিন দেখ্‌চি।

দ্বিতীয়া। কেন বল ত?

ঠাকুর্দ্দা। তোমাদের ঠাকরুণদিদি কেবল একখানিমাত্র মালা আমার গলায় পরিয়েছেন।

তৃতীয়া। দেখেছ, দেখেছ, ঠাকুর্দ্দার বিনয়টা একবার দেখেছ?

দ্বিতীয়া। হায়রে হায়, আকাশের চাঁদের এতদূর অধঃপতন হ'ল?

ঠাকুর্দ্দা। যে ফাঁদ তোমরা পেতেছ, ধরা না দিয়ে বাঁচে কি করে'?

প্রথমা। তবে তাই বল, আমাদের ফাঁদের গুণ!

ঠাকুর্দ্দা। চাঁদেরও গুণ আছে, উপযুক্ত ফাঁদ দেখ্‌লে সে আপ্‌নি ধরা দেয়!

তৃতীয়া। আচ্ছা ঠাকরুণদিদির হিসেবটা কি রকম? আজ উৎসবের দিনে না হয় দুটো বেশি করেই মালা দিতেন!

ঠাকুর্দ্দা। যতই দিতেন কুলোত না, সেই জন্যে আজ একটি-মাত্র দিয়েছেন। একটির কোনো বালাই নেই।

দ্বিতীয়া। ঠাকুর্দ্দা তুমি দরজা ছেড়ে নড়্‌বে না?

ঠাকুর্দ্দা। না ভাই, সকলকে এগিয়ে দেব, তা'র পর সব শেষে আমি।

(স্ত্রীলোকদের প্রস্থান)

(নাচের দলের প্রবেশ)

ঠাকুর্দ্দা। আরে, এস এস।

প্রথম। আমাদের নটরাজ তুমি, তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম।

ঠাকুর্দ্দা। আমি দরজার কাছে খাড়া আছি, জানি এই খান দিয়ে সবাইকে যেতে হবে। তোমাদের দেখ্‌লেই পা দুটো ছট্‌ফট্ করে। একবার নাচিয়ে দিয়ে যাও।

নৃত্য ও গীত

মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।
তারি সঙ্গে কি মৃদঙ্গে সদা বাজে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ॥
হাসিকান্না হীরাপান্না দোলে ভালে,
কাঁপে ছন্দে ভালোমন্দ তালে তালে,
নাচে জন্ম নাচে মৃত্যু পাছে পাছে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ।

কি আনন্দ, কি আনন্দ, কি আনন্দ,
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি নাচে বন্ধ,
সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে
তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ তাতা থৈথৈ ॥

ঠাকুর্দ্দা। যাও যাও ভাই, তোমরা নেচে বেড়াও গে, নাচিয়ে বেড়াও গে যাও।

(নাচের দলের প্রস্থান)

(নাগরিক দল)

প্রথম। ঠাকুর্দ্দা, আমাদের রাজা নেই একথা দুশোবার বল্‌ব।

ঠাকুর্দ্দা। কেবলমাত্র দুশোবার! এত কঠিন সংযমের দরকার কি—পাঁচশোবার বল না।

দ্বিতীয়। ফাঁকি দিয়ে কতদিন তোমরা মানুষকে ভুলিয়ে রাখ্‌বে!

ঠাকুর্দ্দা। নিজেও ভুলেছি ভাই।

তৃতীয়। আমরা চারদিকে প্রচার করে' বেড়াব আমাদের রাজা নেই।

ঠাকুর্দ্দা। কা'র সঙ্গে ঝগড়া করবে বল? তোমাদের রাজা ত কারো কানে ধরে' বল্‌চেন না আমি আছি। তিনি ত বলেন তোমরাই আছ, তাঁর সবই ত তোমাদেরই জন্যে।

প্রথম। এই ত আমরা রাস্তা দিয়ে চেঁচিয়ে যাচ্চি রাজা

নেই—যদি রাজা থাকে সে কি করতে পারে করুক না।

ঠাকুর্দ্দা। কিচ্ছু করবে না।

দ্বিতীয়। আমার পঁচিশ বছরের ছেলেটা সাত দিনের জ্বরে মারা গেল! দেশে যদি ধর্ম্মের রাজা থাক্‌বে তবে কি এমন অকালমৃত্যু ঘটে!

ঠাকুর্দ্দা। ওরে তবু ত এখন তোর দু ছেলে আছে—আমার যে একে একে পাঁচ ছেলে মারা গেল—একটি বাকি রইল না।

তৃতীয়। তবে?

ঠাকুর্দ্দা। তবে কি রে? ছেলে ত গেলই, তাই বলে' কি ঝগড়া করে' রাজাকেও হারাব? এম্‌নি বোকা!

প্রথম। ঘরে যাদের অন্ন জোটে না তাদের আবার রাজা কিসের!

ঠাকুর্দ্দা। ঠিক বলেছিস্ ভাই। তা সেই অন্নরাজাকেই খুঁজে বের কর! ঘরে বসে' হাহাকার করলেই ত তিনি দর্শন দেবেন না।

দ্বিতীয়। আমাদের রাজার বিচারটা কি রকম দেখ না। ঐ আমাদের ভদ্রসেন, রাজা বল্‌তে সে একেবারে গলে' পড়ে কিন্তু তা'র ঘরের এমন দশা যে চাম্‌চিকে গুলোরও থাক্‌বার কষ্ট হয়।

ঠাকুর্দ্দা। আমার দশাটাই দেখ না। রাজার দরজায়

সমস্ত দিনই ত খাট্‌চি, আজ পর্য্যন্ত দুটো পয়সা পুরস্কার মিল্‌ল না।

তৃতীয়। তবে ?

ঠাকুর্দ্দা। তবে কি রে ? তাই নিয়েই ত আমার অহঙ্কার। বন্ধুকে কি কেউ কোনো দিন পুরস্কার দেয় ? তা যা ভাই, আনন্দ করে' বলে' বেড়াগে রাজা নেই। আজ আমাদের নানা সুরের উৎসব—সব সুরই ঠিক এক তানে মিল্‌বে।

গান

বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে ?
দেখিস্‌নে কি শুক্‌নো পাতা ঝরাফুলের খেলা রে !
যে ঢেউ উঠে তারি সুরে
বাজে কি গান সাগর জুড়ে ?
যে ঢেউ পড়ে তাহারো সুর জাগ্‌চে সারা বেলা রে।
বসন্তে আজ দেখ্‌রে তোরা ঝরা ফুলের খেলা রে।
আমার প্রভুর পায়ের তলে
শুধুই কি রে মাণিক জ্বলে ?
চরণে তাঁর লুটিয়ে কাঁদে লক্ষ মাটির ঢেলা রে।
আমার গুরুর আসন কাছে
সুবোধ ছেলে ক'জন আছে,
অবোধ জনে কোল দিয়েছেন তাই আমি তাঁর চেলা রে।
উৎসবরাজ দেখেন চেয়ে ঝরা ফুলের খেলা রে।

৪

প্রাসাদ-শিখর

সুদর্শনা ও সখী রোহিণী

সুদর্শনা। ওলো রোহিণী, তুই আমার রাজাকে কি কখনো দেখিস্‌নি ?

রোহিণী। শুনেছি প্রজারা সবাই দেখেছে কিন্তু চিনেছে খুব অল্প লোকে। সেই জন্যে যখনি কাউকে দেখে মনটা চমকে ওঠে তখনি মনে করি এই বুঝি হবে রাজা। আবার দুদিন পরে ভুল ভাঙে।

সুদর্শনা। ভুল তোরা করতে পারিস কিন্তু আমার ভুল হ'তে পারে না। আমি হলুম রাণী। ঐ ত আমার রাজাই বটে।

রোহিণী। তোমাকে তিনি কত মান দিয়েছেন, তিনি কি তোমাকে চেনাতে দেরি করতে পারেন ?

সুদর্শনা। ঐ মূর্ত্তি দেখ্‌লেই চিত্ত যে আপনি খাঁচার পাখীর মত চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। ওর কথা ভালো করে' জিজ্ঞাসা করে' এসেছিস্‌ ত ?

রোহিণী। এসেছি বই কি। যাকে জিজ্ঞাসা করি সেই ত বলে রাজা।

সুদর্শনা। কোথাকার রাজা ?

রোহিণী। আমাদেরই রাজা।

সুদর্শনা। ঐ যার মাথায় ফুলের ছাতা ধরে' আছে তা'র কথাই ত বল্‌চিস্‌ ?

রোহিণী। হাঁ, ঐ যাঁর পতাকায় কিংশুক আঁকা।

সুদর্শনা। আমি ত দেখ্‌বামাত্রই চিনেছি, বরঞ্চ তোর মনে সন্দেহ এসেছিল।

রোহিণী। আমাদের যে সাহস অল্প, তাই ভয় হয় কি জানি যদি ভুল করি তবে অপরাধ হবে।

সুদর্শনা। আহা যদি সুরঙ্গমা থাক্‌ত তা হ'লে কোনো সংশয় থাক্‌ত না।

রোহিণী। সুরঙ্গমাই আমাদের চেয়ে সেয়ানা হ'ল বুঝি।

সুদর্শনা। তা যা বলিস্‌ সে ওঁকে ঠিক চেনে।

রোহিণী। একথা আমি কখ্‌খনো মান্‌ব না। ও তা'র ভাণ। বল্লেই হ'ল চিনি, কেউ ত পরীক্ষা করে' নিতে পারবে না। আমরা যদি ওর মত নির্লজ্জ হতুম তাহ'লে অমন কথা আমাদেরও মুখে আট্‌কাত না।

সুদর্শনা। না, না, সে ত বলে না কিছু।

রোহিণী। ভাব দেখায়। সে যে বলার চেয়ে আরো বেশি। কত ছলই যে জানে! ঐ জন্যই ত আমাদের কেউ তা'কে দেখ্‌তে পারে না।

সুদর্শনা। যাই হোক সে থাকলে একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করে' দেখতুম।

রোহিণী। সে ত কখনো কোথাও বেরোয় না,—আজ দেখি সে সাজসজ্জা করে' উৎসব করতে বেরিয়েছে। তা'র রঙ্গ দেখে হেসে বাঁচিনে!

সুদর্শনা। আজ যে প্রভুর হুকুম তাই সে সেজেচে।

রোহিণী। তা বেশ মহারাণী, আমাদের কথায় কাজ কি! যদি ইচ্ছা করেন তা'কেই ডেকে আনি, তা'র মুখ থেকেই সন্দেহ ভঞ্জন হোক্! তা'র ভাগ্য ভালো, রাণীর কাছে রাজার পরিচয় সেই করিয়ে দেবে।

সুদর্শনা। না, না, পরিচয় কাউকে করাতে হবে না—তবু কথাটা সকলেরই মুখে শুনতে ইচ্ছে করে।

রোহিণী। সকলেই ত বল্‌চে ঐ দেখ না তাঁর জয়ধ্বনি এখান থেকে শোনা যাচ্চে।

সুদর্শনা। তবে এক কাজ কর। পদ্মপাতায় করে' এই ফুলগুলি তাঁর হাতে দিয়ে আয়গে।

রোহিণী। যদি জিজ্ঞাসা করেন কে দিলে?

সুদর্শনা। তা'র কোনো উত্তর দিতে হবে না—তিনি ঠিক বুঝতে পার্ব্বেন। তাঁর মনে ছিল আমি চিনতেই পারব না—ধরা পড়েছেন সেটা না জানিয়ে ছাড়্‌চিনে।

(ফুল লইয়া রোহিণীর প্রস্থান।)

সুদর্শনা। আমার মন আজ এমনি চঞ্চল হয়েছে! এমন ত কোনোদিন হয় না। এই পূর্ণিমার আলো মদের ফেনার মত চারদিকে উপ্‌চিয়ে পড়্‌চে, আমাকে যেন মাতাল করে' তুলেছে। ওগো বসন্ত, যে সব ভীরু লাজুক ফুল পাতার আড়ালে গভীর রাত্রে ফোটে যেমন করে' তাদের গন্ধ উড়িয়ে নিয়ে চলেছ তেম্‌নি তুমি আমার মনকে হঠাৎ কোথায় উদাস করে' দিলে, তা'কে মাটিতে পা ফেল্‌তে দিলে না!—ওরে প্রতিহারী!

প্রতিহারী (প্রবেশ করিয়া)

কি মহারাণী!

সুদর্শনা। ঐ যে আম্রবনের বীথিকার ভিতর দিয়ে উৎসব-বালকেরা আজ গান গেয়ে যাচ্চে, ডাক্ ডাক্ ওদের ডেকে নিয়ে আয়, একটু গান শুনি।

(প্রতিহারীর প্রস্থান)

ভগবান চন্দ্রমা, আজ আমার এই চঞ্চলতার উপরে তুমি যেন কেবলি কটাক্ষপাত করচ! তোমার স্মিত কৌতুকে সমস্ত আকাশ যেন ভরে' গেছে—কোথাও আমার আর লুকোবার জায়গা নেই—আমি কেমন আপ্‌নার দিকে চেয়ে আপ্‌নি লজ্জা পাচ্চি! ভয় লজ্জা সুখ দুঃখ সব মিলে আমার বুকের মধ্যে

আজ নৃত্য করচে। শরীরের রক্ত নাচ্‌চে, চারদিকের জগৎ নাচ্‌চে, সমস্ত ঝাপ্‌সা ঠেক্‌চে!

(বালকগণের প্রবেশ)

এস, এস, তোমরা সব মূর্ত্তিমান কিশোর বসন্ত, ধর তোমাদের গান ধর! আমার সমস্ত শরীর গান গাইচে অথচ আমার কণ্ঠে সুর আসচে না। তোমরা আমার হ'য়ে গান গেয়ে যাও।

গান

বিরহ মধুর হ'ল আজি
মধুরাতে।
গভীর রাগিণী উঠে বাজি
বেদনাতে।
ভরি দিয়া পূর্ণিমা নিশা
অধীর অদর্শন-তৃষা
কি করুণ মরীচিকা আনে
আঁখিপাতে।
সুদূরের সুগন্ধ ধারা
বায়ুভরে
পরাণে আমার পথহারা
ঘুরে মরে!

কা'র বাণী কোন্ সুরে তালে
মর্ম্মরে পল্লবজালে,
বাজে মম মঞ্জীরবাজি
সাথে সাথে ॥

সুদর্শনা। হয়েছে হয়েছে আর না! তোমাদের এই গান শুনে চোখে জল ভরে' আস্‌চে। আমার মনে হচ্চে যা পাবার জিনিষ তা'কে হাতে পাবার জো নেই—তা'কে হাতে পাবার দরকার নেই। এম্‌নি করে' খোঁজার মধ্যেই সমস্ত পাওয়া যেন সুধাময় হ'য়ে আছে। কোন্ মাধুর্য্যের সন্ন্যাসী তোমাদের এই গান শিখিয়ে দিয়েছে গো! ইচ্ছে করচে চোখে-দেখা কানে-শোনা ঘুচিয়ে দিই, হৃদয়ের ভিতরটাতে যে গহন পথের কুঞ্জবন আছে সেইখানকার ছায়ার মধ্যে উদাস হ'য়ে চলে' যাই! ওগো কুমার তাপসগণ, তোমাদের আমি কি দেব বল! আমার গলায় এ কেবল রত্নের মালা, এ কঠিন হার তোমাদের কণ্ঠে পীড়া দেবে; তোমরা যে ফুলের মালা পরেছ ওর মত কিছুই আমার কাছে নেই।

(প্রণাম করিয়া বালকগণের প্রস্থান)

(রোহিণীর প্রবেশ)

সুদর্শনা। ভালো করিনি, ভালো করিনি রোহিণী। তোর

কাছে সমস্ত বিবরণ শুন্‌তে আমার লজ্জা করচে। এইমাত্র হঠাৎ বুঝ্‌তে পেরেছি, যা সকলের চেয়ে বড় পাওয়া তা ছুঁয়ে পাওয়া নয়, তেম্‌নি যা সকলের চেয়ে বড় দেওয়া তা হাতে করে' দেওয়া নয়। তবু বল্ কি হ'ল বল্!

রোহিণী। আমি ত রাজার হাতে ফুল দিলুম কিন্তু তিনি যে কিছু বুঝ্‌লেন এমন ত মনে হ'ল না।

সুদর্শনা। বলিস্ কি? তিনি বুঝ্‌তে পারলেন না?

রোহিণী। না, তিনি অবাক্ হ'য়ে চেয়ে পুতুলটির মত বসে' রইলেন। কিছু বুঝলেন না এইটে পাছে ধরা পড়ে সেইজন্যে একটি কথা কইলেন না।

সুদর্শনা। ছি ছি ছি আমার যেমন প্রগল্‌ভতা তেম্‌নি শাস্তি হয়েছে! তুই আমার ফুল ফিরিয়ে আন্‌লিনে কেন?

রোহিণী। ফিরিয়ে আন্‌ব কি করে'? পাশে ছিলেন কাঞ্চীর রাজা, তিনি খুব চতুর, চকিতে সমস্ত বুঝ্‌তে পারলেন; মুচকে হেসে বল্লেন, মহারাজ, মহিষী সুদর্শনা আজ বসন্ত-সখার পূজার পুষ্পে মহারাজের অভ্যর্থনা করচেন। শুনে হঠাৎ তিনি সচেতন হ'য়ে উঠে বল্লেন, আমার রাজসম্মান পরিপূর্ণ হ'ল। আমি লজ্জিত হ'য়ে ফিরে আস্‌ছিলুম এমন সময়ে কাঞ্চীর রাজা মহারাজের গলা থেকে স্বহস্তে এই মুক্তার মালাটি খুলে নিয়ে আমাকে বল্লেন, সখি, তুমি যে

সৌভাগ্য বহন করে' এনেছ তা'র কাছে পরাভব স্বীকার করে' মহারাজের কণ্ঠের মালা তোমার হাতে আত্মসমর্পণ করচে।

সুদর্শনা। কাঞ্চীর রাজাকে বুঝিয়ে দিতে হ'ল ? আজকের পূর্ণিমার উৎসব আমার অপমান একেবারে উদ্ঘাটিত করে' দিলে! তা হোক্, যা তুই যা, আমি একটু একলা থাক্‌তে চাই।

(রোহিণীর প্রস্থান)

আজ এমন করে' আমার দর্প চূর্ণ হয়েছে তবু সেই মোহন রূপের কাছ থেকে মন ফেরাতে পারচি নে ! অভিমান আর রইল না। পরাভব, সর্ব্বত্রই পরাভব ! বিমুখ হ'য়ে থাক্‌ব সে শক্তিটুকুও নেই। কেবল ইচ্ছে করচে ঐ মালাটা রোহিণীর কাছ থেকে চেয়ে নিই। কিন্তু ও কি মনে করবে ! রোহিণী !

রোহিণী (প্রবেশ করিয়া)

কি মহারাণী !

সুদর্শনা। আজকের ব্যাপারে তুই কি পুরস্কার পাবার যোগ্য ?

রোহিণী। তোমার কাছে না হোক্ যিনি দিয়েছেন তাঁর কাছে থেকে পেতে পারি।

সুদর্শনা। না, না, ওকে দেওয়া বলে না ও জোর করে' নেওয়া।

রোহিণী। তবু, রাজকণ্ঠের অনাদরের মালাকেও অনাদর করি এমন স্পর্দ্ধা আমার নয়।

সুদর্শনা। এ অবজ্ঞার মালা তোর গলায় দেখ্‌তে আমার ভালো লাগ্‌চে না! দে ওটা খুলে দে! ওর বদলে আমার হাতের কঙ্কণটা তোকে দিলুম—এই নিয়ে তুই চলে' যা!

(রোহিণীর প্রস্থান)

হার হ'ল, আমার হার হ'ল। এ মালা ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া উচিত ছিল—পারলুম না! এযে কাঁটার মালার মত আমার আঙুলে বিঁধ্‌চে তবু ত্যাগ করতে পারলুম না। উৎসব-দেবতার হাত থেকে এই কি আমি পেলুম—এই অগৌরবের মালা!

৫

কুঞ্জদ্বার

ঠাকুর্দ্দা ও এক দল লোক

ঠাকুর্দ্দা। কি ভাই, হ'ল তোমাদের ?

১ম। খুব হ'ল ঠাকুর্দ্দা। এই দেখ না একেবারে লালে-লাল করে' দিয়েছে ! কেউ বাকি নেই।

ঠাকুর্দ্দা। বলিস্ কি ? রাজাগুলোকে সুদ্ধ রাঙিয়েছে না কি ?

২য়। ওরে বাস্‌রে ! কাছে ঘেঁসে কে ! তা'রা সব বেড়ার মধ্যে খাড়া হ'য়ে রইল !

ঠাকুর্দ্দা। হায় হায়, বড় ফাঁকিতে পড়েছে। একটুও রং ধরাতে পারলিনে ? জোর করে' ঢুকে পড়তে হয়।

৩য়। ও দাদা, তাদের রাঙা, সে আরেক রঙের। তাদের চক্ষু রাঙা, তাদের পাইকগুলোর পাগ্‌ড়ি রাঙা, তা'র উপরে খোলা তলোয়ারের যে রকম ভঙ্গী দেখ্‌লুম একটু কাছে ঘেঁষলেই একেবারে চরম রাঙা রাঙিয়ে দিত !

ঠাকুর্দ্দা। বেশ করেছিস্ ঘেঁসিস্ নি! পৃথিবীতে ওদের নির্ব্বাসন দণ্ড—ওদের তফাতে রেখে চল্‌তেই হবে। এখন বাড়ি চলেছিস্ বুঝি?

২য়। হাঁ দাদা, রাত ত আড়াই পহর হ'য়ে গেল। তুমি যে ভিতরে গেলে না?

ঠাকুর্দ্দা। এখনো ডাক পড়ল না—দ্বারেই আছি।

৩য়। তোমার শম্ভু-সুধনরা সব গেল কোথায়?

ঠাকুর্দ্দা। তাদের ঘুম পেয়ে গেল—শুতে গেছে।

১ম। তা'রা কি তোমার সঙ্গে অমন খাড়া জাগ্‌তে পারে?

(প্রস্থান)

বাউলের দল

যা ছিল কালো ধলো
তোমার রঙে রঙে রাঙা হ'ল।
যেমন রাঙাবরণ তোমার চরণ
তা'র সনে আর ভেদ না র'ল।
রাঙা হ'ল বসন ভূষণ,
রাঙা হ'ল শয়ন স্বপন,
মন হ'ল কেমন দেখ্ রে, যেমন
রাঙা কমল টলমল!

ঠাকুর্দ্দা। বেশ ভাই বেশ—খুব খেলা জমেছিল?

বাউল। খুব খুব! সব লালে লাল। কেবল আকাশের চাঁদটাই ফাঁকি দিয়েছে—শাদাই র'য়ে গেল!

ঠাকুর্দ্দা। বাইরে থেকে দেখাচ্চে যেন বড় ভালমানুষ! ওর শাদা চাদরটা খুলে দেখ্‌তিস্ যদি তাহ'লে ওর বিছে ধরা পড়ত। চুপি চুপি ও যে আজ কত রং ছড়িয়েছে এখানে দাঁড়িয়ে সব দেখেছি। অথচ ও নিজে কি এমনি শাদাই থেকে যাবে?

গান

আহা, তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা
প্রিয় আমার ওগো প্রিয়!
বড় উতলা আজ পরাণ আমার
খেলাতে হার মান্‌বে কি ও?
কেবল তুমিই কি গো এম্‌নি ভাবে
রাঙিয়ে মোরে পালিয়ে যাবে?
তুমি সাধ করে' নাথ ধরা দিয়ে
আমারো রং বক্ষে নিয়ো—
এই হৃৎকমলের রাঙা রেণু
রাঙাবে ঐ উত্তরীয়।

(প্রস্থান)

(স্ত্রীলোকদের প্রবেশ)

প্রথমা। ওমা, ওমা, যেখানে দেখে গিয়েছিলুম সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছে গো!

দ্বিতীয়া। আমাদের বসন্ত পূর্ণিমার চাঁদ, এত রাত হ'ল তবু একটুও পশ্চিমের দিকে হেল্‌ল না!

প্রথমা। আমাদের অচঞ্চল চাঁদটি কা'র জন্যে পথ চেয়ে আছে ভাই ?

ঠাকুর্দ্দা। যে তাঁকে পথে বের করবে তারি জন্যে।

তৃতীয়া। ঘরে ছেড়ে এবার পথের মানুষ খুঁজবে বুঝি ?

ঠাকুর্দ্দা। হাঁ ভাই, সর্ব্বনাশের জন্যে মন-কেমন করচে।

গান

আমার সকল নিয়ে বসে' আছি
সর্ব্বনাশের আশায়।
আমি তা'র লাগি পথ চেয়ে আছি
পথে যেজন ভাসায়।

দ্বিতীয়া। আমাদের ত পথে ভাসাবার শক্তি নেই, পথ ছেড়ে দিয়ে যাওয়াই ভালো। ধরা যে দেবে না তা'র কাছে ধরা দিয়ে লাভ কি?

ঠাকুর্দ্দা। তা'র কাছে ধরা দিলে ধরা-দেওয়াও যা ছাড়া-পাওয়াও তা।

যে জন দেয় না দেখা যায় যে দেখে,
ভালবাসে আড়াল থেকে,
আমার মন মজেছে সেই গভীরের
গোপন ভালবাসায়॥

(স্ত্রীলোকদের প্রস্থান)

(নাচের দলের প্রবেশ)

ঠাকুর্দ্দা। ও ভাই রাত ত অর্দ্ধেকের বেশি পার হ'য়ে এল কিন্তু মনের মাতন এখনো যে থামতে চাইচে না—তোরা ত বাড়ি চলেছিস্, তোদের শেষ নাচটা নাচিয়ে দিয়ে যা !

গান

আমার ঘুর লেগেছে—তাধিন্ তাধিন্ !
তোমার পিছন্ পিছন্ নেচে নেচে
ঘুর লেগেছে তাধিন্ তাধিন্ !
তোমার তালে আমার চরণ চলে
শুনতে না পাই কে কি বলে
তাধিন্ তাধিন্—
তোমার গানে আমার প্রাণে যে কোন্
পাগল ছিল সেই জেগেছে
তাধিন্ তাধিন্ !
আমার লাজের বাঁধন সাজের বাঁধন
খসে' গেল ভজন সাধন,
তাধিন্ তাধিন্—
বিষম নাচের বেগে দোলা লেগে
ভাবনা যত সব ভেগেছে
তাধিন্ তাধিন্।

(নাচের দলের প্রস্থান)

(সুরঙ্গমার প্রবেশ)

সুরঙ্গমা। এতক্ষণ কি করছিলে ঠাকুর্দ্দা?

ঠাকুর্দ্দা। দ্বারের কাজে ছিলুম।

সুরঙ্গমা। সে কাজ ত শেষ হ'ল। একটি মানুষও নেই— সবাই চলে' গেছে।

ঠাকুর্দ্দা। এবার তবে ভিতরে চলি।

সুরঙ্গমা। কোন্‌খানে বাঁশি বাজ্‌চে এবার বাতাসে কান দিলে বোঝা যাবে।

ঠাকুর্দ্দা। সবাই যখন নিজের তালপাতার ভেঁপু বাজাচ্ছিল তখন বিষম গোল।

সুরঙ্গমা। উৎসবে ভেঁপুর ব্যবস্থা তিনিই করে' রেখেছেন।

ঠাকুর্দ্দা। তাঁর বাঁশি কারো বাজনা ছাপিয়ে ওঠে না। তা না হ'লে লজ্জায় আর সকলের তান বন্ধ হ'য়ে যেত।

সুরঙ্গমা। দেখ ঠাকুর্দ্দা, আজ এই উৎসবের ভিতরে ভিতরে কেবলি আমার মনে হচ্চে রাজা আমাকে এবার দুঃখ দেবেন।

ঠাকুর্দ্দা। দুঃখ দেবেন!

সুরঙ্গমা। হাঁ ঠাকুর্দ্দা! এবার আমাকে দূরে পাঠিয়ে দেবেন, অনেকদিন কাছে আছি সে তাঁর সইচে না।

ঠাকুর্দ্দা। এবার তবে কাঁটাবনের পার থেকে তোমাকে

দিয়ে পারিজাত তুলিয়ে আনাবেন। সেই দুর্গমের খবরটা আমরা যেন পাই ভাই।

সুরঙ্গমা। তোমার না কি কোনো খবর পেতে বাকি আছে? রাজার কাজে কোন পথটাতেই বা তুমি না চলেছ? হঠাৎ নতুন হুকুম এলে আমাদেরি পথ খুঁজে বেড়াতে হয়।

গান

পুষ্প ফুটে কোন কুঞ্জবনে
কোন্ নিভৃতে রে কোন্ গহনে!
মাতিল আকুল দক্ষিণ বায়ু
সৌরভ চঞ্চল সঞ্চরণে
কোন্ নিভৃতে রে কোন গহনে।
কাটিল ক্লান্ত বসন্ত নিশা
বাহির-অঙ্গন-সঙ্গী সনে।
উৎসবরাজ কোথায় বিরাজে
কে ল'য়ে যাবে সে ভবনে—
কোন্ নিভৃতে রে কোন্ গহনে॥

(সুরঙ্গমার প্রস্থান)

(রাজবেশী ও কাঞ্চীরাজের প্রবেশ)

কাঞ্চী। তোমাকে যেমন পরামর্শ দিয়েছি ঠিক সেই রকম কোরো। ভুল না হয়!

রাজবেশী। ভুল হবে না।

কাঞ্চী। করভোত্থানের মধ্যেই রাণীর প্রাসাদ।

রাজবেশী। হাঁ মহারাজ, সে আমি দেখে নিয়েছি।

কাঞ্চী। সেই উদ্যানে আগুন লাগিয়ে দেবে—তার পরে অগ্নিদাহের গোলমালের মধ্যে কার্য্যসিদ্ধি করতে হবে।

রাজবেশী। কিছু অন্যথা হবে না।

কাঞ্চী। দেখ হে ভণ্ডরাজ, আমার কেবলি মনে হচ্চে আমরা মিথ্যে ভয়ে ভয়ে চলচি, এদেশে রাজা নেই।

রাজবেশী। সেই অরাজকতা দূর করবার জন্যেই ত আমার চেষ্টা। সাধারণ লোকের জন্যে সত্য হোক্ মিথ্যে হোক্ একটা রাজা চাই-ই, নইলে অনিষ্ট ঘটে।

কাঞ্চী। হে সাধু, লোকহিতের জন্যে তোমার এই আশ্চর্য্য ত্যাগস্বীকার আমাদের সকলেরই পক্ষে একটা দৃষ্টান্ত। ভাবচি যে এই হিতকার্য্যটা নিজেই করব।

(সহসা ঠাকুর্দ্দাকে দেখিয়া)

কে হে, কে তুমি? কোথায় লুকিয়ে ছিলে?

ঠাকুর্দ্দা। লুকিয়ে থাকিনি। অত্যন্ত ক্ষুদ্র বলে' আপনাদের চোখে পড়িনি।

রাজবেশী। ইনি এদেশের রাজাকে নিজের বন্ধু বলে' পরিচয় দেন, নির্ব্বোধেরা বিশ্বাস করে।

ঠাকুর্দ্দা। বুদ্ধিমানদের কিছুতেই সন্দেহ ঘোচে না, তাই নির্ব্বোধ নিয়েই আমাদের কারবার।

কাঞ্চী। তুমি আমাদের সব কথা শুনেছ?

ঠাকুর্দ্দা। আপনারা আগুন লাগাবার পরামর্শ করছিলেন।

কাঞ্চী। তুমি আমাদের বন্দী, চল শিবিরে।

ঠাকুর্দ্দা। আজ তবে বুঝি এমনি করেই তলব পড়ল?

কাঞ্চী। বিড়বিড় করে' বকচ কি!

ঠাকুর্দ্দা। আমি বল্‌চি, দশের টান কাটিয়ে কিছুতেই নড়তে পারছিলেম না, তাই বুঝি ভিতর মহলে টেনে নিয়ে যাবার জন্যে মনিবের পেয়াদা এল।

কাঞ্চী। লোকটা পাগল না কি?

রাজবেশী। ওর কথা ভারি এলোমেলো—বোঝাই যায় না।

কাঞ্চী। কথা যত কম বোঝা যায় অবুঝরা ততই ভক্তি করে। কিন্তু আমাদের কাছে সে ফন্দী খাটবে না। আমরা স্পষ্ট কথার কারবারী।

ঠাকুর্দ্দা। যে আজ্ঞা মহারাজ, চুপ করলুম।

৬

করভোত্থান

রোহিণী। ব্যাপারখানা কি। কিছু ত বুঝ্‌তে পারচিনে। (মালীদের প্রতি) তোরা সব তাড়াতাড়ি কোথায় চলেছিস?

১ম মালী। আমরা বাইরে যাচ্ছি।

রোহিণী। বাইরে কোথায় যাচ্ছিস?

২য় মালী। তা জানিনে, আমাদের রাজা ডেকেচে!

রোহিণী। রাজা ত বাগানেই আছে। কোন রাজা?

১ম মালী। বল্‌তে পারিনে।

২য় মালী। চিরদিন যে রাজার কাজ করচি সেই রাজা।

রোহিণী। তোরা সবাই চলে' যাবি?

১ম মালী। হাঁ সবাই যাব, এখনি যেতে হবে। নইলে বিপদে পড়ব।

(প্রস্থান)

রোহিণী। এরা কি বলে বুঝ্‌তে পারিনে—ভয় করচে! যে নদীর পাড়ি ভেঙে পড়বে সেই পাড়ি ছেড়ে যেমন জন্তুরা পালায় এই বাগান ছেড়ে তেমনি সবাই পালিয়ে যাচ্ছে।

(কোশলরাজের প্রবেশ)

কোশল। রোহিণী, তোমাদের রাজা এবং কাঞ্চীরাজ কোথায় গেল জান ?

রোহিণী। তাঁরা এই বাগানেই আছেন কিন্তু কোথায় কিছুই জানিনে।

কোশল। তাদের মন্ত্রণাটা ঠিক বুঝ্‌তে পারচিনে। কাঞ্চীরাজকে বিশ্বাস করে' ভালো করিনি।

(প্রস্থান)

রোহিণী। রাজাদের মধ্যে কি একটা ব্যাপার চল্‌চে! শীঘ্র একটা দুর্দ্দৈব ঘটবে। আমাকে সুদ্ধ জড়াবে না ত ?

অবন্তীরাজ (প্রবেশ করিয়া)

রোহিণী, রাজারা সব কোথায় গেল জান ?

রোহিণী। তাঁরা কে কোথায় তা'র ঠিকানা করা শক্ত। এইমাত্র কোশলরাজ এখানে ছিলেন।

অবন্তী। কোশলরাজের জন্যে ভাবনা নেই। তোমাদের রাজা এবং কাঞ্চীরাজ কোথায় ?

রোহিণী। অনেকক্ষণ তাঁদের দেখিনি।

অবন্তী। কাঞ্চীরাজ কেবলি আমাদের এড়িয়ে এড়িয়ে বেড়াচ্চে। নিশ্চয় ফাঁকি দেবে। এর মধ্যে থেকে ভালো করিনি। সখি, এ বাগান থেকে বেরবার পথটা কোথায় জান ?

রোহিণী। আমি ত জানিনে।

অবন্তী। দেখিয়ে দিতে পারে এমন কোনো লোক নেই ?

রোহিণী। মালীরা সব বাগান ছেড়ে গেছে।

অবন্তী। কেন গেল ?

রোহিণী। তাদের কথা ভালো বুঝতে পারলুম না। তা'রা বল্লে রাজা তাদের শীঘ্র বাগান ছেড়ে যেতে বলেছেন।

অবন্তী। রাজা! কোন রাজা!

রোহিণী। তা'রা স্পষ্ট করে' বল্‌তে পারলে না।

অবন্তী। এ ত ভালো কথা নয়। যেমন করেই হোক্‌ এখান থেকে বেরবার পথ খুঁজে বের করতেই হবে। আর এক মুহূর্ত এখানে নয়।

(দ্রুত প্রস্থান,

রোহিণী। চিরদিন ত এই বাগানেই আছি কিন্তু আজ মনে হচ্চে যেন বাঁধা পড়ে' গেছি, দৌড়িয়ে পড়াতে না পারলে নিষ্কৃতি নেই। রাজাকে দেখ্‌তে পেলে যে বাঁচি। পর্শু যখন তাকে রাণীর ফুল দিলুম তখন তিনি ত একরকম আত্মবিস্মৃত ছিলেন—তা'র পর থেকে তিনি আমাকে কেবলি পুরস্কার দিচ্চেন। এই অকারণ পুরস্কারে আমার ভয় আরো বাড়চে! এত রাতে পাখীরা সব কোথায় উড়ে চলেছে ? এরা হঠাৎ এমন ভয় পেল কেন ? এখন ত এদের ওড়বার সময় নয়।···রাণীর পোষা হরিণী ওদিকে দৌড়ল

রাজা

কোথায় ? চপলা, চপলা ! আমার ডাক শুনলই না। এমন ত কখনই হয় না ! চারদিকের দিগন্ত মাতালের চোখের মত হঠাৎ লাল হ'য়ে উঠেছে। যেন চারদিকেই অকালে সূর্য্যাস্ত হচ্চে। বিধাতার এ কি উন্মত্ততা আজ ! ভয় হচ্চে। রাজার দেখা কোথায় পাই।

৭

রাণীর প্রাসাদদ্বার

রাজবেশী। এ কি কাণ্ড করেচ কাঞ্চীরাজ ?

কাঞ্চী। আমি কেবল এই প্রাসাদের কাছটাতেই আগুন ধরাতে চেয়েছিলুম, সে আগুন যে এত শীঘ্র এমন চারদিকে ধরে' উঠ্‌বে সে ত আমি মনেও করিনি! এ বাগান থেকে বেরবার পথ কোথায় শীঘ্র বলে' দাও।

রাজবেশী। পথ কোথায় আমি ত কিছুই জানিনে। যারা আমাদের এখানে এনেছিল তাদের একজনকেও দেখ্‌চিনে।

কাঞ্চী। তুমি ত এদেশের লোক—পথ নিশ্চয় জান।

রাজবেশী। অন্তঃপুরের বাগানে কোনোদিনই প্রবেশ করিনি।

কাঞ্চী। সে আমি বুঝিনে, তোমাকে পথ বল্‌তেই হবে, নইলে তোমাকে দু-টুক্‌রো করে' কেটে ফেল্‌ব।

রাজবেশী। তা'তে প্রাণ বেরবে, পথ বেরবার কোনো উপায় হবে না।

কাঞ্চী। তবে কেন বলে' বেড়াচ্ছিলে তুমিই এখানকার রাজা?

রাজবেশী। আমি রাজা না, রাজা না। (মাটিতে পড়িয়া জোড় করে) কোথায় আমার রাজা, রক্ষা কর! আমি পাপিষ্ঠ, আমাকে রক্ষা কর! আমি বিদ্রোহী, আমাকে দণ্ড দাও, কিন্তু রক্ষা কর!

কাঞ্চী। অমন শূন্যতার কাছে চীৎকার করে' লাভ কি? ততক্ষণ পথ বের করবার চেষ্টা করা যাক্।

রাজবেশী। আমি এইখানেই পড়ে' রইলুম—আমার যা হবার তাই হবে।

কাঞ্চী। সে হবে না। পুড়ে মরি ত একলা মরব না—তোমাকে সঙ্গী নেব।

নেপথ্য হইতে

রক্ষা কর রাজা রক্ষা কর! চারিদিকে আগুন!

কাঞ্চী। মূঢ় ওঠ্ আর দেরি না।

সুদর্শনা (প্রবেশ করিয়া)

রাজা, রক্ষা কর! আগুনে ঘিরেছে।

রাজবেশী। কোথায় রাজা? আমি রাজা নই।

সুদর্শনা। তুমি রাজা নও?

রাজবেশী। আমি ভণ্ড, আমি পাষণ্ড। (মুকুট মাটিতে ফেলিয়া) ছলনা ধূলিসাৎ হোক্।

(কাঞ্চীরাজের সহিত প্রস্থান)

সুদর্শনা। রাজা নয়? এ রাজা নয়? তবে ভগবান হুতাশন, দগ্ধ কর আমাকে; আমি তোমারই হাতে আত্মসমর্পণ কোরবো—হে পাবন, আমার লজ্জা, আমার বাসনা, পুড়িয়ে ছাই করে' ফেল।

রোহিণী (প্রবেশ করিয়া)

রাণী, ওদিকে কোথায় যাও। তোমার অন্তঃপুরের চারদিকে আগুন ধরে' গেছে, ওর মধ্যে প্রবেশ কোরো না।

সুদর্শনা। আমি তারি মধ্যে প্রবেশ কোরবো। এ আমারি মরবারই আগুন।

(প্রাসাদে প্রবেশ)

৮

অন্ধকার কক্ষ

রাজা। ভয় নেই তোমার ভয় নেই। আগুন এ ঘরে এসে পৌঁছবে না।

সুদর্শনা। ভয় আমার নেই—কিন্তু লজ্জা! লজ্জা যে আগুনের মত আমার সঙ্গে সঙ্গে এসেছে। আমার মুখ চোখ আমার সমস্ত হৃদয়টাকে রাঙা করে' রেখেছে।

রাজা। এ দাহ মিট্‌তে সময় লাগ্‌বে।

সুদর্শনা। কোনোদিন মিট্‌বে না, কোনোদিন মিট্‌বে না!

রাজা। হতাশ হোয়ো না রাণী!

সুদর্শনা। তোমার কাছে মিথ্যা বলব না রাজা—আমি আর-এক জনের মালা গলায় পরেছি।

রাজা। ও মালাও যে আমার, নইলে সে পাবে কোথা থেকে? সে আমার ঘর থেকে চুরি করে' এনেছে।

সুদর্শনা। কিন্তু এ যে তারি হাতের দেওয়া। তবু ত ত্যাগ করতে পারলুম না। যখন চারদিকে আগুন আমার কাছে এগিয়ে এল তখন একবার মনে করলুম এই

মালাটা আগুনে ফেলে দিই। কিন্তু পারলুম না। আমার পাপিষ্ঠ মন বল্‌লে ঐ হার গলায় নিয়ে পুড়ে মরব। আমি তোমাকে বাইরে দেখ্‌ব বলে' পতঙ্গের মত এ কোন্ আগুনে ঝাঁপ দিলুম! আমিও মরিনে, আগুনও নেবে না, এ কি জ্বালা!

রাজা। তোমার সাধ ত মিটেচে, আমাকে ত আজ দেখে নিলে!

সুদর্শনা। আমি কি তোমাকে এমন সর্ব্বনাশের মধ্যে দেখ্‌তে চেয়েছিলুম? কি দেখলুম জানিনে, কিন্তু বুকের মধ্যে এখনো কাঁপ্‌চে।

রাজা। কেমন দেখ্‌লে রাণী?

সুদর্শনা। ভয়ানক, সে ভয়ানক! সে আমার স্মরণ করতেও ভয় হয়। কালো, কালো, তুমি কালো! আমি কেবল মুহূর্ত্তের জন্যে চেয়েছিলুম। তোমার মুখের উপর আগুনের আভা লেগেছিল—আমার মনে হ'ল ধূমকেতু যে আকাশে উঠেচে সেই আকাশের মত তুমি কালো—তখনি চোখ বুজে ফেল্লুম, আর চাইতে পারলুম না। ঝড়ের মেঘের মত কালো—কূলশূন্য সমুদ্রের মত কালো, তা'রই তুফানের উপরে সন্ধ্যার রক্তিমা।

রাজা। আমি ত তোমাকে পূর্ব্বেই বলেছি যে লোক আগে থাক্‌তে প্রস্তুত না হয়েছে সে যখন আমাকে হঠাৎ

দেখে সইতে পারে না—আমাকে বিপদ বলে' মনে করে' আমার কাছ থেকে ঊর্দ্ধশ্বাসে পালাতে চায়। এমন কতবার দেখেছি। সেই জন্যে সেই দুঃখ থেকে বাঁচিয়ে ক্রমে ক্রমে তোমার কাছে পরিচয় দিতে চেয়েছিলুম।

সুদর্শনা। কিন্তু পাপ এসে সমস্ত ভেঙে দিলে—এখন আর যে তোমার সঙ্গে তেমন করে' পরিচয় হ'তে পারবে তা মনে করতেও পারিনে।

রাজা। হবে রাণী হবে। যে কালো দেখে আজ তোমার বুক কেঁপে গেছে সেই কালোতেই একদিন তোমার হৃদয় স্নিগ্ধ হ'য়ে যাবে। নইলে আমার ভালবাসা কিসের?

গান

আমি রূপে তোমায় ভোলাব না
ভালবাসায় ভোলাব।
আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলব না গো
গান দিয়ে দ্বার খোলাব।
ভরাব না ভূষণ ভারে,
সাজাব না ফুলের হারে,
সোহাগ আমার মালা করে'
গলায় তোমার দোলাব।

জান্‌বে না কেউ কোন্‌ তুফানে
তরঙ্গদল নাচ্‌বে প্রাণে,
চাঁদের মতন অলখ টানে
জোয়ারে ঢেউ তোলাব ॥

সুদর্শনা। হবে না, হবে না, শুধু তোমার ভালবাসায় কি হবে? আমার ভালবাসা যে মুখ ফিরিয়েছে। রূপের নেশা আমাকে লেগেছে—সে নেশা আমাকে ছাড়বে না, সে যেন আমার দুই চক্ষে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে আমার স্বপনসুদ্ধ ঝল্‌ঝল্‌ করচে। এই আমি তোমাকে সব কথা বল্লুম, এখন আমাকে শাস্তি দাও!

রাজা। শাস্তি সুরু হয়েছে।

সুদর্শনা। কিন্তু তুমি যদি আমাকে ত্যাগ না কর আমি তোমাকে ত্যাগ করব।

রাজা। যতদূর সাধ্য চেষ্টা করে' দেখ।

সুদর্শনা। কিছু চেষ্টা করতে হবে না—তোমাকে আমি সইতে পারচিনে। ভিতরে ভিতরে তোমার উপর রাগ হচ্চে। কেন তুমি আমাকে—জানিনে আমাকে তুমি কি করেচ? কিন্তু কেন তুমি এমনতর? কেন আমাকে লোকে বলেছিল তুমি সুন্দর? তুমি যে কালো, কালো, তোমাকে আমার কখনো ভালো লাগ্‌বে না। আমি যা ভালবাসি তা আমি দেখেছি—

তা ননীর মত কোমল, শিরীষ ফুলের মত সুকুমার, তা প্রজাপতির মত সুন্দর।

রাজা। তা মরীচিকার মত মিথ্যা এবং বুদ্বুদের মত শূন্য।

সুদর্শনা। তা হোক্, কিন্তু আমি পারচিনে, তোমার কাছে দাঁড়াতে পারচিনে। আমাকে এখান থেকে যেতেই হবে। তোমার সঙ্গে মিলন সে আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। সে মিলন মিথ্যা হবে, আমার মন অন্যদিকে যাবে।

রাজা। একটুও চেষ্টা করবে না?

সুদর্শনা। কাল থেকে চেষ্টা করচি—কিন্তু যতই চেষ্টা করচি ততই মন আরো বিদ্রোহী হ'য়ে দাঁড়াচ্চে। আমি অশুচি, আমি অসতী, তোমার কাছে থাক্‌লে এই ঘৃণা কেবলি আমাকে আঘাত করবে। তাই আমার ইচ্ছে করচে দূরে চলে' যাই—এত দূরে যাই যেখানে তোমাকে আমার আর মনে আনতে হবে না।

রাজা। আচ্ছা তুমি যতদূরে পার ততদূরেই চলে' যাও।

সুদর্শনা। তুমি হাত দিয়ে পথ আট্‌কাও না বলেই তোমার কাছ থেকে পালাতে মনে এত দ্বিধা হয়। তুমি কেশের গুচ্ছ ধরে' জোর করে' আমাকে টেনে রেখে দাও না কেন? তুমি আমাকে মার না কেন? মার, মার, আমাকে মার! তুমি আমাকে কিছু বলচ না সেই জন্যেই আরো অসহ্য বোধ হচ্চে।

রাজা। কিছু বল্‌চিনে কে তোমাকে বল্লে ?

সুদর্শনা। অমন করে' নয়, অমন করে' নয়, চীৎকার করে' বল, বজ্রগর্জ্জনে বল—আমার কান থেকে অন্য সকল কথা ডুবিয়ে দিয়ে বল—আমাকে এত সহজে ছেড়ে দিয়ো না, যেতে দিয়ো না !

রাজা। ছেড়ে দেব কিন্তু যেতে দেব কেন ?

সুদর্শনা। যেতে দেবে না ? আমি যাবই।

রাজা। আচ্ছা যাও !

সুদর্শনা। দেখ তাহ'লে আমার দোষ নেই। তুমি আমাকে জোর করে' ধরে' রাখ্‌তে পারতে কিন্তু রাখ্‌লে না ! আমাকে বাঁধ্‌লে না—আমি চল্লুম। তোমার প্রহরীদের হুকুম দাও আমাকে ঠেকাক্।

রাজা। কেউ ঠেকাবে না। ঝড়ের মুখে ছিন্ন মেঘ যেমন অবাধে চলে তেমনি তুমি অবাধে চলে' যাও !

সুদর্শনা। ক্রমেই বেগ বেড়ে উঠ্‌চে—এবার নোঙর ছিঁড়ল ! হয়ত ডুব্‌ব কিন্তু আর ফিরব না।

(দ্রুত প্রস্থান)

(সুরঙ্গমার প্রবেশ ও গান)

ভয়েরে মোর আঘাত কর,
ভীষণ, হে ভীষণ !
কঠিন করে' চরণ পরে
প্রণত কর মন !

রাজা

বেঁধেছে মোরে নিত্য কাজে
প্রাচীরে ঘেরা ঘরের মাঝে,
নিত্য মোরে বেঁধেছে সাজে
সাজের আভরণ।
এসহে, ওহে আকস্মিক,
ঘিরিয়া ফেল সকল দিক,
মুক্ত পথে উড়ায়ে নিক
নিমেষে এ জীবন।
তাহার পরে প্রকাশ হোক্
উদার তব সহাস চোখ,
তব অভয় শান্তিময়
স্বরূপ পুরাতন।

সুদর্শনা (পুনঃপ্রবেশ করিয়া)

রাজা, রাজা!

সুরঙ্গমা। তিনি চলে' গেছেন।

সুদর্শনা। চলে' গেছেন? আচ্ছা বেশ, তাহ'লে তিনি আমাকে একেবারে ছেড়েই দিলেন! আমি ফিরে এলুম কিন্তু তিনি অপেক্ষা করলেন না! আচ্ছা ভালোই হ'ল—তাহ'লে আমি মুক্ত। সুরঙ্গমা আমাকে ধরে' রাখবার জন্যে তিনি কি তোকে বলেছেন?

সুরঙ্গমা। না, তিনি কিছুই বলেন নি।

সুদর্শনা। কেনই বা বল্‌বেন? বল্‌বার ত কথা নয়! তাহ'লে আমি মুক্ত। আচ্ছা সুরঙ্গমা, একটা কথা রাজাকে জিজ্ঞাসা করব মনে করেছিলুম কিন্তু মুখে বেধে গেল। বল্ দেখি বন্দীদের তিনি কি প্রাণদণ্ড দিয়েছেন?

সুরঙ্গমা। প্রাণদণ্ড? আমার রাজা ত কোনোদিন বিনাশ করে' শাস্তি দেন না।

সুদর্শনা। তাহ'লে ওদের কি হ'ল?

সুরঙ্গমা। ওদের তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। কাঞ্চীরাজ পরাভব স্বীকার করে' দেশে ফিরে গেছেন।

সুদর্শনা। শুনে বাঁচলুম।

সুরঙ্গমা। রাণীমা তোমার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে।

সুদর্শনা। প্রার্থনা কি মুখে জানাতে হবে মনে করেছিস্? রাজার কাছ থেকে এ পর্য্যন্ত আমি যত আভরণ পেয়েছি সব তোকেই দিয়ে যাব—এ অলঙ্কার আমাকে আর শোভা পায় না।

সুরঙ্গমা। মা, আমি যাঁর দাসী তিনি আমাকে নিরাভরণ করেই সাজিয়েছেন। সেই আমার অলঙ্কার। লোকের কাছে গর্ব্ব করতে পারি এমন কিছুই তিনি আমাকে দেননি!

সুদর্শনা। তবে তুই কি চাস্?

সুরঙ্গমা। আমি তোমার সঙ্গে যাব।

সুদর্শনা। কি বলিস্ তুই? তোর প্রভুকে ছেড়ে দূরে যাবি, এ কি রকম প্রার্থনা?

সুরঙ্গমা। দূরে নয় মা, তুমি যখন বিপদের মুখে চলেছ তিনি কাছেই থাক্‌বেন।

সুদর্শনা। পাগলের মত বকিস্‌নে। আমি রোহিণীকে সঙ্গে নিতে চেয়েছিলুম সে গেল না। তুই কোন্ সাহসে যেতে চাস্?

সুরঙ্গমা। সাহস আমার নেই, শক্তিও আমার নেই। কিন্তু আমি যাব—সাহস আপনি আস্‌বে, শক্তিও হবে।

সুদর্শনা। না, তোকে আমি নিতে পারব না—তোর কাছে থাক্‌লে আমার বড় গ্লানি হবে—সে আমি সইতে পারব না।

সুরঙ্গমা। মা, তোমার সমস্ত ভালোমন্দ আমি নিজের গায়ে মেখে নিয়েছি—আমাকে পর করে' রাখ্‌তে পারবে না—আমি যাবই!

গান

আমি তোমার প্রেমে হব সবার
কলঙ্কভাগী।
আমি সকল দাগে হব দাগী।

তোমার পথের কাঁটা করব চয়ন ;
যেথা তোমার ধূলার শয়ন
সেথা আঁচল পাতব আমার
তোমার রাগে অনুরাগী ।
আমি শুচি আসন টেনে টেনে
বেড়াব না বিধান মেনে,
যে পঙ্কে সেই চরণ পড়ে
তাহারি ছাপ বক্ষে মাগি !

৯

সুদর্শনার পিতা কান্যকুব্জরাজ ও মন্ত্রী

রাজা। সে আস্‌বার পূর্ব্বেই আমি সমস্ত খবর পেয়েছি।

মন্ত্রী। রাজকন্যা নগরের বাহিরে নদীকূলে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁকে অভ্যর্থনা করে' আনবার জন্যে লোকজন পাঠিয়ে দিই?

কান্যকুব্জ। হতভাগিনী স্বামীকে ত্যাগ করে' আস্‌চে, অভ্যর্থনা করে' তা'র সেই লজ্জা ঘোষণা করে' দেবে? অন্ধকার হোক্, রাস্তায় যখন লোক থাক্‌বে না তখন সে গোপনে আস্‌বে।

মন্ত্রী। প্রাসাদে তাঁর বাসের ব্যবস্থা করে' দিই?

কান্যকুব্জ। কিছু করতে হবে না। ইচ্ছা করে' সে আপনার একেশ্বরী রাণীর পদ ত্যাগ করে' এসেছে—এখানে রাজগৃহে তা'কে দাসীর কাজে নিযুক্ত থাক্‌তে হবে।

মন্ত্রী। মনে বড় কষ্ট পাবেন।

রাজা। যদি তা'কে কষ্ট থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করি তাহ'লে পিতা নামের যোগ্য নই।

মন্ত্রী। যেমন আদেশ করেন তাই হবে।

কান্যকুব্জ। সে যে আমার কন্যা একথা যেন প্রকাশ না হয়—তাহ'লে বিষম অনর্থপাত ঘট্‌বে।

মন্ত্রী। অনর্থের আশঙ্কা কেন করেন মহারাজ?

কান্যকুব্জ। নারী যখন আপন প্রতিষ্ঠা থেকে ভ্রষ্ট হয় তখন সংসারে সে ভয়ঙ্কর বিপদ হ'য়ে দেখা দেয়। তুমি জান না আমার এই কন্যাকে আমি আজ কি রকম ভয় করচি—সে আমার ঘরের মধ্যে শনিকে সঙ্গে করে' নিয়ে আসচে!

১০

অন্তঃপুর

সুদর্শনা। যা যা সুরঙ্গমা, তুই যা! আমার মধ্যে একটা রাগের আগুন জ্বল্‌চে—আমি কাউকে সহ্য করতে পারচিনে—তুই অমন শান্ত হ'য়ে থাকিস ওতে আমার আরো রাগ হয়।

সুরঙ্গমা। কার উপর রাগ করচ মা?

সুদর্শনা। সে আমি জানিনে—কিন্তু আমার ইচ্ছে করচে সমস্ত ছারখার হ'য়ে যাক্! অতবড় রাণীর পদ এক মুহূর্ত্তে বিসর্জ্জন দিয়ে এলুম সে কি এমনি কোণে লুকিয়ে ঘর ঝাঁট দেবার জন্যে? মশাল জ্বলে' উঠ্‌বে না? ধরণী কেঁপে উঠ্‌বে না? আমার পতন কি শিউলি ফুলের খসে' পড়া? সে কি নক্ষত্রের পতনের মত অগ্নিময় হ'য়ে দিগন্তকে বিদীর্ণ করে' দেবে না?

সুরঙ্গমা। দাবানল জ্বলে' ওঠবার আগে গুম্‌রে গুম্‌রে ধোঁয়ায়—এখনো সময় যায়নি।

সুদর্শনা। রাণীর মহিমা ধূলিসাৎ করে' দিয়ে বাইরে চলে' এলুম এখানে আর কেউ নেই যে আমার সঙ্গে মিল্‌বে? এক্‌লা—এক্‌লা আমি! আমার এত বড়

ত্যাগ গ্রহণ করে' নেবার জন্যে কেউ এক পা-ও বাড়াবে না ?

সুরঙ্গমা। একলা তুমি না—একলা না।

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা, তোর কাছে সত্যি করে' বল্‌চি, আমাকে পাবার জন্যে প্রাসাদে আগুন লাগিয়েছিল এতেও আমি রাগ করতে পারিনি—ভিতরে ভিতরে আনন্দে আমার বুক কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছিল। এত বড় অপরাধ! এত বড় সাহস! সেই সাহসেই আমার সাহস জাগিয়ে দিলে, সেই আনন্দেই আমার সমস্ত ফেলে দিয়ে আস্‌তে পারলুম। কিন্তু সে কি কেবল আমার কল্পনা ? আজ কোথাও তা'র চিহ্ন দেখি না কেন ?

সুরঙ্গমা। তুমি যার কথা মনে ভাব্‌চ সে ত আগুন লাগায়নি —আগুন লাগিয়েছিল কাঞ্চীরাজ।

সুদর্শনা। ভীরু! ভীরু! অমন মনোমোহন রূপ—তা'র ভিতরে মানুষ নেই! এমন অপদার্থের জন্যে নিজেকে এত বড় বঞ্চনা করেছি ? লজ্জা! লজ্জা! —কিন্তু সুরঙ্গমা, তোর রাজার কি উচিত ছিল না আমাকে এখনো ফেরাবার জন্যে আসে ? (সুরঙ্গমা নিরুত্তর) তুই ভাবছিস্ ফেরবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছি! কখনো না! রাজা এলেও আমি ফিরতুম না! কিন্তু সে একবার বারণও করলে না। চলে'

যাবার দ্বার একেবারে খোলা রইল। বাইরের নিরাবরণ রাস্তা রাণী বলে' আমার জন্যে একটু বেদনা বোধ করলে না? সেও তোর রাজার মতনই কঠিন? দীনতম পথের ভিক্ষুকও তা'র কাছে যেমন আমিও তেমনি! চুপ করে' রইলি যে। বল্ না তোর রাজার এ কি রকম ব্যবহার!

সুরঙ্গমা। সে ত সবাই জানে—আমার রাজা নিষ্ঠুর, কঠিন. তা'কে কি কেউ কোনোদিন টলাতে পারে?

সুদর্শনা। তবে তুই তা'কে দিনরাত্রি এমন ডাকিস্ কেন?

সুরঙ্গমা। সে যেন এই রকম পর্ব্বতের মতই চিরদিন কঠিন থাকে—আমার কান্নায় আমার ভাবনায় সে যেন টল্‌মল্ না করে! আমার দুঃখ আমারই থাক্. সেই কঠিনেরই জয় হোক্!

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা, দেখ ত ঐ মাঠের পারে পূর্ব্বদিগন্তে যেন ধূলো উড়চে।

সুরঙ্গমা। হাঁ তাই ত দেখ্‌চি।

সুদর্শনা। ঐ যে, রথের ধ্বজার মত দেখাচ্চে না?

সুরঙ্গমা। হাঁ, ধ্বজাই ত বটে।

সুদর্শনা। তবে ত আস্‌চে। তবে ত এল!

সুরঙ্গমা। কে আস্‌চে!

সুদর্শনা। আবার কে? তোর রাজা! থাক্‌তে পারবে কেন! এত দিন চুপ করে' আছে এই আশ্চর্য্য!

সুরঙ্গমা। না, এ আমার রাজা নয়।

সুদর্শনা। না রে কি! তুমি ত সব জান! ভারি কঠিন তোমার রাজা! কিছুতেই টলেন না! দেখি কেমন না টলেন! আমি জানতুম সে ছুটে আস্‌বে। কিন্তু মনে রাখিস্ সুরঙ্গমা, আমি তাঁকে একদিনের জন্যেও ডাকি নি! আমার কাছে তোমার রাজা কেমন করে' হার মানে এবার দেখে নিয়ো। সুরঙ্গমা, যা একবার বেরিয়ে গিয়ে দেখে আয়গে! (সুরঙ্গমার প্রস্থান) রাজা এসে আমাকে ডাক্‌লেই বুঝি যাব? কখনো না! আমি যাব না! যাব না!

(সুরঙ্গমার প্রবেশ)

সুরঙ্গমা। মা, এ আমার রাজা নয়।

সুদর্শনা। নয়? তুই সত্যি বলচিস্? এখনো আমাকে নিতে এল না?

সুরঙ্গমা। না, আমার রাজা এমন করে' ধূলো উড়িয়ে আসে না। সে কখন আসে কেউ টেরই পায় না।

সুদর্শনা। এ বুঝি তবে—

সুরঙ্গমা। কাঞ্চীরাজের সঙ্গে সেই আস্‌চে।

সুদর্শনা। তার নাম কি জানিস্?

সুরঙ্গমা। তার নাম সুবর্ণ।

সুদর্শনা। তবে ত সে আস্‌চে। ভেবেছিলুম আবর্জ্জনার মত

বুঝি বাইরে এসে পড়েছি, কেউ নেবে না—কিন্তু আমার বীর ত আমাকে উদ্ধার করতে আস্‌চে! সুবর্ণকে তুই জান্‌তিস্?

সুরঙ্গমা। যখন বাপের বাড়ি ছিলুম তখন সে জুয়ো খেলার দলে—

সুদর্শনা। না, না, তোর মুখে আমি তা'র কোনো কথা শুন্‌তে চাইনে। সে আমার বীর, সে আমার পরিত্রাণকর্ত্তা। তা'র পরিচয় আমি নিজেই পাব। কিন্তু সুরঙ্গমা, তোর রাজা কেমন বল্ ত! এত হীনতা থেকেও আমাকে উদ্ধার করতে এল না? আমার আর দোষ দিতে পারবিনে। আমি এখানে দিনরাত্রি দাসীগিরি করে' তা'র জন্যে চিরজীবন অপেক্ষা করে' থাক্‌তে পারব না! তোর মত দীনতা করা আমার দ্বারা হবে না! আচ্ছা সত্যি বল্, তুই তোর রাজাকে খুব ভালবাসিস্!

সুরঙ্গমা

গান

আমি কেবল তোমার দাসী।
কেমন করে' আনব মুখে তোমায় ভালবাসি!
গুণ যদি মোর থাক্‌ত, তবে
অনেক আদর মিল্‌ত ভবে,
বিনামূল্যের কেনা আমি শ্রীচরণপ্রয়াসী।

১১

শিবির

কাঞ্চী। (কান্যকুব্জের দূতের প্রতি) তোমাদের রাজাকে গিয়ে বলগে আমরা তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করতে আসিনি। রাজ্যে ফিরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে আছি কেবল সুদর্শনাকে এখানকার দাসীশালা থেকে উদ্ধার করে' নিয়ে যাবার জন্যেই অপেক্ষা।

দূত। মহারাজ স্মরণ রাখবেন রাজকন্যা তাঁর পিতৃগৃহে আছেন।

কাঞ্চী। কন্যা যতদিন কুমারী থাকে ততদিনই পিতৃগৃহে তা'র আশ্রয়।

দূত। কিন্তু পতিকুলের সঙ্গেও তাঁর সম্বন্ধ আছে।

কাঞ্চী। সে সম্বন্ধ তিনি ত্যাগ করেই এসেছেন।

দূত। জীবন থাকতে সে সম্বন্ধ ত্যাগ করা যায় না—মাঝে মাঝে বিচ্ছেদ ঘটে কিন্তু অবসান ঘটতেই পারে না।

কাঞ্চী। সেজন্য কোনো সঙ্কোচ বোধ করতে হবে না, কারণ তাঁর স্বামীই স্বয়ং তাঁকে ফিরিয়ে নিতে এসেছেন। রাজন!

সুবর্ণ। কি মহারাজ!

কাঞ্চী তোমার মহিষীকে কি পিতৃগৃহে দাসীত্বে নিযুক্ত রেখে তুমি স্থির থাক্‌বে?

সুবর্ণ। এমন কাপুরুষ আমি না।

দূত। এ যদি আপনাদের পরিহাস-বাক্য না হয় তাহ'লে রাজভবনে আতিথ্য নিতে দ্বিধা কিসের?

কাঞ্চী। রাজন্‌!

সুবর্ণ। কি মহারাজ!

কাঞ্চী। তুমি কি তোমার মহিষীকে ভিক্ষা করে' ফিরিয়ে নিয়ে যাবে?

সুবর্ণ। এও কি কখনো হয়?

দূত। তবে কি ইচ্ছা করেন?

কাঞ্চী। সেও কি বল্‌তে হবে?

সুবর্ণ। তা ত বটেই। সে ত বুঝ্‌তেই পারচেন!

কাঞ্চী। মহারাজ যদি সহজে তাঁর কন্যাকে আমাদের হাতে সমর্পণ না করেন ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম-অনুসারে বলপূর্ব্বক নিয়ে যাব এই আমার শেষ কথা।

দূত। মহারাজ, আমাদের রাজাকেও ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পালন করতে হবে। তিনি ত কেবল স্পর্দ্ধাবাক্য শুনেই আপনার হাতে কন্যা দিয়ে যেতে পারেন না।

কাঞ্চী। এই রকম উত্তর শোনবার জন্যেই প্রস্তুত হ'য়ে এসেছি এই কথা রাজাকে জানাও গে। (দূতের প্রস্থান)

সুবর্ণ। কাঞ্চীরাজ দুঃসাহসিকতা হচ্চে।

কাঞ্চী। তাই যদি না হবে তবে এমন কাজে প্রবৃত্ত হ'য়ে সুখ কি?

সুবর্ণ। কান্যকুব্জরাজকে ভয় না করলেও চলে--কিন্তু—

কাঞ্চী। কিন্তুকে ভয় করতে আরম্ভ করলে জগতে নিরাপদ জায়গা খুঁজে পাওয়া যায় না।

সুবর্ণ। সত্য বলি, মহারাজ, ঐ কিন্তুটি দেখা দেন না কিন্তু ওঁর কাছ থেকে নিরাপদে পালাবার জায়গা জগতে কোথাও নেই।

কাঞ্চী। নিজের মনে ভয় থাক্‌লেই ঐ কিন্তুর জোর বেড়ে ওঠে।

সুবর্ণ। ভেবে দেখুন না, বাগানে কি কাণ্ডটা হ'ল। আপনি আটঘাট বেঁধেই ত কাজ করেছিলেন, তা'র মধ্যেও কোথা দিয়ে কিন্তু এসে ঢুকে পড়ল। তিনিই ত রাজা, তাকে মানব না ভেবেছিলুম, আর না মেনে থাকবার জো রইল না।

কাঞ্চী। ভয়ে মানুষের বুদ্ধি নষ্ট হয় তখন মানুষ যা-তা মেনে বসে। সেদিন যা ঘটেছিল সেটা অকস্মাৎ ঘটেছিল।

সুবর্ণ। আপনি যাঁকে অকস্মাৎ বল্‌চেন আমি তাকেই কিন্তু বল্লেম- কোনোমতে তাঁকে বাঁচিয়ে চল্লেই তবে বাঁচন।

(সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। মহারাজ, কোশলরাজ, অবন্তীরাজ ও কলিঙ্গের রাজা সসৈন্যে আস্‌চেন সংবাদ পেলুম।

(প্রস্থান)

কাঞ্চী। যা ভয় করছিলুম তাই হ'ল! সুদর্শনার পলায়ন সংবাদ রটে' গিয়েছে—এখন সকলে মিলে কাড়াকাড়ি করে' সকলকেই ব্যর্থ হ'তে হবে।

সুবর্ণ। কাজ নেই মহারাজ! এ সমস্ত ভালো লক্ষণ নয়। আমি নিশ্চয় বল্‌চি আমাদের রাজাই এই গোপন সংবাদটা রটিয়ে দিয়েছেন।

কাঞ্চী। কেন? তা'তে তাঁর লাভ কি?

সুবর্ণ। লোভারা পরস্পর কাটাকাটি ছেঁড়াছিঁড়ি করে' মরবে—মাঝের থেকে যার ধন তিনিই নিয়ে যাবেন।

কাঞ্চী। এখন বেশ বুঝ্‌চি কেন তোমাদের রাজা দেখা দেন না! ভয়ে তাঁকে সর্ব্বত্রই দেখা যাবে এই তাঁর কৌশল। কিন্তু এখনো আমি বল্‌চি তোমাদের রাজা আগাগোড়াই ফাঁকি।

সুবর্ণ। কিন্তু মহারাজ আমাকে ছেড়ে দিন।

কাঞ্চী। তোমাকে ছাড়তে পারচিনে—তোমাকে এই কাজে আমার বিশেষ প্রয়োজন।

(সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। বিরাট, পাঞ্চাল ও বিদর্ভরাজও এসেছেন। তাঁদের শিবির নদীর ওপারে।

(প্রস্থান)

কাঞ্চী। আরম্ভে আমাদের সকলকে মিলে কাজ করতে হবে। কান্যকুব্জের সঙ্গে যুদ্ধটা আগে হ'য়ে যাক্ তা'র পরে একটা উপায় করা যাবে।

সুবর্ণ। আমাকে ঐ উপায়টার মধ্যে যদি না টানেন তাহ'লে নিশ্চিন্ত হ'তে পারি—আমি অতি হানব্যক্তি—আমার দ্বারা—

কাঞ্চী। দেখহে ভণ্ড, উপায় জিনিষটাই হচ্চে হান। সিঁড়ি বল রাস্তা বল পায়ের তলাতেই থাকে। উপায় যদি উচ্চশ্রেণীর হয় তা'কে ব্যবহারে লাগাতে অনেক চিন্তার দরকার করে। তোমার মত লোককে নিয়ে কাজ চালাবার সুবিধে এই যে কোনোপ্রকার ভণ্ডামি করতে হয় না। কিন্তু আমার মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করতে গেলেও চুরিকে লোকহিত নাম না দিলে শুনতে খারাপ লাগে।

সুবর্ণ। কিন্তু দেখেছি মন্ত্রী মশায় কথাটার আসল অর্থটাই বুঝে নেন।

কাঞ্চী। এই ভাষাতত্ত্বটুকু তা'র জানা না থাক্‌লে তা'কে

রাজা

মন্ত্রী না করে' গোয়াল ঘরের ভার দিতুম। যাই, রাজাগুলোকে একবার বড়ে'র মত চেলে দিয়ে আসিগে—সকলেরই যদি রাজার চাল হয় তাহ'লে চতুরঙ্গ খেলা চলে না।

১২

অন্তঃপুর

সুদর্শনা। যুদ্ধ এখনো চল্‌চে ?

সুরঙ্গমা। হাঁ, এখনো চল্‌চে।

সুদর্শনা। যুদ্ধে যাবার পূর্ব্বে বাবা এসে বল্লেন, তুই একজনের হাত থেকে ছেড়ে এসে আজ সাতজনকে টেনে আন্‌লি—ইচ্ছে করচে তোকে সাত টুক্‌রো করে' ওদের সাত জনের মধ্যে ভাগ করে' দিই। সত্যিই যদি তাই করতেন ভালো হ'ত। সুরঙ্গমা!

সুরঙ্গমা। কি মা!

সুদর্শনা। তোর রাজার যদি রক্ষা করবার শক্তি থাক্‌ত তাহ'লে আজ তিনি কি নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাক্‌তে পারতেন ?

সুরঙ্গমা। মা, আমাকে কেন বল্‌চ ? আমার রাজার হ'য়ে উত্তর দেবার শক্তি কি আমার আছে ? উত্তর যদি দেন ত নিজেই এম্‌নি করে' দেবেন যে কারো বুঝ্‌তে কিছু বাকি থাক্‌বে না। যদি না দেন তাহ'লে

সকলকেই নির্ব্বাক্ হ'য়ে থাক্‌তে হবে। আমি কিছুই বুঝিনে জানি সেইজন্যে কোনোদিন তাঁর বিচার করিনে।

সুদর্শনা। যুদ্ধে কে কে যোগ দিয়েছে বল্ ত।

সুরঙ্গমা। সাতজন রাজাই যোগ দিয়েছে।

সুদর্শনা। আর কেউ না?

সুরঙ্গমা। সুবর্ণ যুদ্ধের পূর্ব্বেই গোপনে পালাবার চেষ্টা করছিল—কাঞ্চীরাজ তাঁকে শিবিরে বন্দী করে' রেখেছেন।

সুদর্শনা। আমার মৃত্যুই ভালো ছিল। কিন্তু রাজা, রাজা, আমার পিতাকে রক্ষা করবার জন্যে যদি আস্‌তে তাহ'লে তোমার যশ বাড়্‌ত বই কম্‌ত না। আমার অপরাধে তিনি শাস্তি পান কেন?

সুরঙ্গমা। সংসারে আমরা ত কেউ একলা নই, মা, —ভালোমন্দ সকলকেই ভাগ করে' নিতে হয়—সেই জন্যেই ভয়, নইলে এক্‌লার জন্যে ভয় কিসের?

সুদর্শনা। দেখ্ সুরঙ্গমা, আমি যখন থেকে এখানে এসেছি কতবার হঠাৎ মনে হয়েছে আমার জানলার নীচে থেকে যেন বীণা বাজ্‌চে।

সুরঙ্গমা। তা হবে, কেউ হয় ত বাজায়।

সুদর্শনা। সেখানটা ঘন বন, অন্ধকার, মাথা বাড়িয়ে কতবার

দেখ্‌তে চেষ্টা করি, ভালো করে' কিছু দেখ্‌তে পাইনে।

সুরঙ্গমা। হয়ত কোনো পথিক ছায়ায় বসে' বিশ্রাম করে আর বাজায়।

সুদর্শনা। তা হবে, কিন্তু আমার মনে পড়ে আমার সেই বাতায়নটি। সন্ধ্যার সময় সেজে এসে আমি সেখানে দাঁড়াতুম আর আমাদের সেই দীপ-নেবানো বাসর-ঘরের অন্ধকার থেকে গানের পর গান তানের পর তান ফোয়ারার মুখের ধারার মত উচ্ছ্বসিত হ'য়ে আমার সাম্‌নে এসে যেন নানা লীলায় ঝরে' ঝরে' পড়ত। সেই গানই ত কোন অন্ধকারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে কোন অন্ধকারের দিকে আমাকে ডেকে নিয়ে যেত।

সুরঙ্গমা। আহা মা, সে কি অন্ধকার! সেই অন্ধকারের দাসী আমি!

সুদর্শনা। আমার জন্যে সেখান থেকে তুই কেন এলি?

সুরঙ্গমা। আমার রাজা আবার হাতে ধরে' ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন এই আদরটুকু পাবার জন্যে।

সুদর্শনা। না না তিনি আস্‌বেন না—তিনি আমাদের একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন। কেনই বা না ছাড়বেন? অপরাধ ত কম করিনি।

সুরঙ্গমা। যদি ছেড়ে দিতেই পারেন তাহ'লে তাঁকে আর

দরকার নেই। তাহ'লে তিনি নেই। তাহ'লে আমার সেই অন্ধকার একেবারে শূন্য—তা'র মধ্যে থেকে বীণা বাজেনি—কেউ ডাকেনি—সমস্ত বঞ্চনা।

(দ্বারীর প্রবেশ)

সুদর্শনা। কে তুমি ?

দ্বারী। আমি এই প্রাসাদের দ্বারী।

সুদর্শনা। কি খবর শীঘ্র বল !

দ্বারী। আমাদের মহারাজ বন্দী হয়েছেন।

সুদর্শনা। বন্দী হয়েছেন ? মাগো বসুন্ধরা ! (মূর্চ্ছা)

১৩

বন্দী কান্যকুব্জরাজ, অন্যান্য রাজগণ ও সুবর্ণ

কাঞ্চী। রাজগণ, রণক্ষেত্রের কাজ শেষ হ'ল।

কলিঙ্গ। কই শেষ হ'ল? বীরত্বের পুরস্কারটি গ্রহণ করবার পূর্ব্বে আরেকবার ত বীরত্বের পরিচয় দিতে হবে।

কাঞ্চী। মহারাজ, এখানে ত আমরা জয়-মালা নিতে আসি নি, বরমালা নিতে এসেছি।

বিদর্ভ। সেই মালা কি জয়-লক্ষ্মীর হাত থেকে নিতে হবে না?

কাঞ্চী। না মহারাজ, পুষ্পধনুর অন্তঃপুরেই সে মালা গাঁথা হচ্চে। রক্ত-মাখা হাতে সেটা ছিন্ন করতে গেলে ফুল ধূলায় লুটিয়ে পড়বে।

কলিঙ্গ। কিন্তু মহারাজ, পঞ্চশর আমাদের সাতজনের দাবী মেটাবেন কি করে'?

কাঞ্চী। তা যদি বলেন, সাতজনের দাবী ত রণচণ্ডীও মেটাতে পারেন না।

কোশল। কাঞ্চীরাজ, তোমার প্রস্তাবটি কি পরিষ্কার করেই বল।

কাঞ্চী। আমার প্রস্তাব এই, স্বয়ম্বর সভায় রাজকন্যা স্বয়ং যাঁর গলায় মালা দেবেন এই বসন্তের সফলতা তিনিই লাভ করবেন।

বিদর্ভ। এ প্রস্তাব উত্তম, আমার এতে সম্মতি আছে।

সকলে। আমাদেরও আছে।

কান্যকুব্জ। রাজগণ, আমাকে বধ করুন, অথবা দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করচি, আপনারা আসুন—আমাকে জীবিত মৃত্যুর হাতে সমর্পণ করবেন না।

কাঞ্চী। আপনার কন্যা পতিকুল ত্যাগ করে' এসেছেন। তা'র অধিক দুঃখ আমরা আপনাকে দিচ্চিনে। এখন যে প্রস্তাব করলেম তা'তে তিনি সম্মান লাভ করবেন।

কোশল। শুভলগ্নে কালই স্বয়ম্বরের দিন স্থির হোক।

কাঞ্চী। সেই ভালো।

বিদর্ভ। আমরা আয়োজনে প্রবৃত্ত হইগে।

কাঞ্চী। কলিঙ্গরাজ, বন্দী এখন আপনার আশ্রয়েই রইলেন।

(কাঞ্চী ব্যতীত অন্য রাজগণের প্রস্থান)

কাঞ্চী। ওহে ভণ্ডরাজ!

সুবর্ণ। কি আদেশ!

কাঞ্চী। এখন মহারথীরা সরবেন। এবার শিখণ্ডীকে সামনে নিয়ে অগ্রসর হ'তে হবে।

সুবর্ণ। মহারাজের কথাটা স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারচিনে।

কাঞ্চী। সেখানে তোমাকে আমার ছত্রধর হ'য়ে বস্‌তে হবে।

সুবর্ণ। কিঙ্কর প্রস্তুত আছে কিন্তু তা'তে মহারাজের উপকারটা কি হবে!

কাঞ্চী। ওহে সুবর্ণ, দেখ্‌তে পাচ্চি তোমার বুদ্ধিটা কম বলেই অহঙ্কারটাও কম। রাণী সুদর্শনা তোমাকে কি চক্ষে দেখেছেন সেটা এখনো তোমার ধারণার মধ্যে প্রবেশ করেনি দেখ্‌চি। যাই হোক্ তিনি ত রাজসভায় ছত্রধরের গলায় মালা দিতে পারবেন না অথচ অধিক দূরে যেতেও মন সরবে না অতএব যেমন করেই হোক্ এ মালা আমারই রাজছত্রের ছায়ায় এসে পড়বে।

সুবর্ণ। মহারাজ, আমার সম্বন্ধে এই যে সব অমূলক কল্পনা করচেন এ অতি ভয়ানক কল্পনা—দোহাই আপনার, আমাকে এই মিথ্যা বিপত্তি-জালের মধ্যে জড়াবেন না—আমাকে মুক্তি দিন।

কাঞ্চী। কাজটি শেষ হ'য়ে গেলেই তোমাকে মুক্তি দিতে এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করব না। উদ্দেশ্যসিদ্ধি হ'য়ে গেলেই উপায়টাকে কেউ আর চিরস্মরণীয় করে' রাখে না।

———

১৪

বাতায়ন

সুদর্শনা ও সুরঙ্গমা

সুদর্শনা। তাহ'লে স্বয়ম্বর সভায় আমাকে যেতেই হবে ? নইলে পিতার প্রাণরক্ষা হবে না ?

সুরঙ্গমা। কাঞ্চীরাজ ত এই রকম বলেছেন।

সুদর্শনা। এই কি রাজার উচিত কথা ? তিনি কি নিজের মুখে বলেছেন ?

সুরঙ্গমা। না, তাঁর দূত সুবর্ণ এসে জানিয়ে গেছে।

সুদর্শনা। ধিক্, ধিক্ আমাকে !

সুরঙ্গমা। সেই সঙ্গে কতকগুলি শুকনো ফুল দিয়ে আমাকে বল্লে, তোমার রাণীকে বোলো বসন্তউৎসবের এই স্মৃতিচিহ্ন বাইরে যত মলিন হ'য়ে আস্‌চে অন্তরে ততই নবীন হ'য়ে বিকশিত হচ্চে।

সুদর্শনা। চুপ কর্ চুপ কর্, আমাকে আর দগ্ধ করিস্‌নে।

সুরঙ্গমা। ঐ দেখ, সভায় রাজারা সব বসেছেন। ঐ যাঁর গায়ে কোনো আভরণ নেই কেবল মুকুটে একটি

ফুলের মালা জড়ানো উনিই হচ্চেন কাঞ্চীর রাজা।
স্ুবর্ণ তাঁর পিছনে ছাতা ধরে' দাঁড়িয়ে আছে।

সুদর্শনা। ঐ স্ুবর্ণ! তুই সত্যি বল্‌চিস্‌।

সুরঙ্গমা। হাঁ মা, আমি সত্যি বল্‌চি।

সুদর্শনা। ওকেই আমি সেদিন দেখেছিলুম? না, না!
সে আমি আলোতে অন্ধকারে বাতাসে গন্ধেতে মিলে
আর একটা কি দেখেছিলুম, ও নয়, ও নয়!

সুরঙ্গমা। সকলে ত বলে ওকে চোখে দেখ্‌তে সুন্দর।

সুদর্শনা। ঐ সুন্দরেও মন ভোলে! আমার এ পাপ
চোখকে কি দিয়ে ধুলে এর গ্লানি চলে' যাবে?

সুরঙ্গমা। সেই কালোর মধ্যে ডুবিয়ে ধুতে হবে। সেই
আমার রাজার সকল-রূপ-ডোবানো রূপের মধ্যে।
রূপের কালী যা কিছু চোখে লেগেছে সব যাবে।

সুদর্শনা। কিন্তু সুরঙ্গমা, এমন ভুলেও মানুষ ভোলে কেন?

সুরঙ্গমা। ভুল ভাঙবে বলেই ভোলে।

প্রতিহারী (প্রবেশ করিয়া)

স্বয়ম্বরসভায় রাজারা অপেক্ষা করে' আছেন।

(প্রস্থান)

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা, আমার অবগুণ্ঠনের চাদরখানা নিয়ে
আয়গে।

(সুরঙ্গমার প্রস্থান)

রাজা

রাজা, আমার রাজা! তুমি আমাকে ত্যাগ করেছ উচিত বিচারই করেছ। কিন্তু আমার অন্তরের কথা কি তুমি জান্‌বে না? (বুকের বসনের ভিতর হইতে ছুরি বাহির করিয়া) দেহে আমার কলুষ লেগেছে—এ দেহ আজ আমি সবার সমক্ষে ধূলোয় লুটিয়ে যাব—কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে আমার দাগ লাগেনি বুক চিরে সেটা কি তোমাকে আজ জানিয়ে যেতে পারব না? তোমার সেই মিলনের অন্ধকার ঘরটি আমার হৃদয়ের ভিতরে আজ শূন্য হ'য়ে রয়েছে—সেখানকার দরজা কেউ খোলে নি প্রভু। সে কি খুল্‌তে তুমি আর আস্‌বে না? তবে দ্বারের কাছে তোমার বীণা আর বাজ্‌বে না? তবে আসুক্ মৃত্যু আসুক্,—সে তোমার মতই কালো, তোমার মতই সুন্দর—তোমার মতই সে মন হরণ করতে জানে—সে তুমিই সে তুমি!

গান

এ অন্ধকার ডুবাও তোমার অতল অন্ধকারে,
ওহে অন্ধকারের স্বামী!
এস নিবিড়, এস গভীর, এস জীবনপারে
আমার চিত্তে এস নামি।

এ দেহ মন মিলায়ে যাক্ হইয়া যাক্ হারা
ওহে অন্ধকারের স্বামী !
বাসনা মোর, বিকৃতি মোর, আমার ইচ্ছাধারা
ঐ চরণে যাক্ থামি।
নির্ব্বাসনে বাঁধা আছি দুর্ব্বাসনার ডোরে
ওহে অন্ধকারের স্বামী !
সব বাঁধনে তোমার সাথে বন্দী কর মোরে
ওহে আমি বাঁধনকামী।
আমার প্রিয়, আমার শ্রেয়, আমার হে পরম,
ওহে অন্ধকারের স্বামী—
সকল ঝরে' সকল ভরে' আসুক্ সে চরম
ওগো মরুক না এই আমি ॥

১৫

স্বয়ম্বর-সভা

রাজগণ

বিদর্ভ। ওহে কাঞ্চীরাজ, তোমার অঙ্গে যে কোনো আভরণ রাখ নি!

কাঞ্চী। কোনো আশা নেই বলে'। আভরণে যে পরাভবকে দ্বিগুণ লজ্জা দেবে।

কলিঙ্গ। যত আভরণ সমস্তই ছত্রধরের অঙ্গে দেখ্‌চি।

বিরাট। এর দ্বারা কাঞ্চীরাজ বাহ্যশোভার হীনতা প্রচার করতে চান। নিজের দেহে ওঁর পৌরুষের অভিমান অন্য কোনো আভরণ রাখ্‌তেই দেয় নি।

কোশল। ওঁর কৌশল জানি, সমস্ত আভরণধারীদের মাঝখানে উনি আভরণ বর্জ্জনের দ্বারাই নিজের মহিমা প্রমাণ করতে চান।

পাঞ্চাল। সেটা কি উনি ভালো করচেন? সকলেই জানে রমণীর চোখ পতঙ্গের মত—আভরণের দীপ্তিতে সকলের আগে ছুটে এসে পড়ে।

কলিঙ্গ। কিন্তু আর কত বিলম্ব হবে।

কাঞ্চী। অধীর হবেন না কলিঙ্গরাজ, বিলম্বেই ফল মধুর হ'য়ে দেখা দেয়।

কলিঙ্গ। ফল নিশ্চয় পাব জান্‌লে বিলম্ব সইত। ভোগের আশা অনিশ্চিত, তাই দর্শনের আশায় উৎসুক আছি।

কাঞ্চী। আপনার নবীন যৌবন, এ বয়সে বারম্বার আশাকে ত্যাগ করলেও সে প্রগল্‌ভা নারীর মত ফিরে ফিরে আসে—আমাদের আর সে দিন নেই।

কলিঙ্গ। কিন্তু শুভলগ্ন যে উত্তীর্ণ হ'য়ে যায়।

কাঞ্চী। ভয় নেই, শুভগ্রহও দুর্লভদর্শনের জন্যে অপেক্ষা করবে। যদি নির্বোধ না-ও করে তবে প্রিয়দর্শনে অশুভগ্রহেরও দৃষ্টি প্রসন্ন হ'য়ে উঠ্‌বে।

বিদর্ভ। বিরাটরাজ, আপনি যাত্রা করেছিলেন কবে?

বিরাট। সুসময় দেখেই বেরিয়েছিলুম, দৈবজ্ঞ বলেছিল যাত্রা সফল হবেই।

পাঞ্চাল। আমরা সকলেই ত শুভযোগ দেখে বেরিয়েছি, কিন্তু কৃপণ বিধাতা ত একটি বই ফল রাখেন নি।

কোশল। এই ফলটি ত্যাগ করানই হয় ত শুভগ্রহের কাজ।

কাঞ্চী। এ কি উদাসীনের মত কথা বল্‌চ কোশলরাজ? ফল ত্যাগ করাবার জন্য এত আয়োজনের কি দরকার ছিল?

কোশল। ছিল বই কি? কামনা না করে' ত ত্যাগ করা

যায় না। কাঞ্চীরাজ, আমাদের আসনগুলো যেন কেঁপে উঠ্‌ল! এ কি ভূমিকম্প না কি?

কাঞ্চী। ভূমিকম্প? তা হবে।

বিদর্ভ। কিম্বা হয়ত আর কোনো রাজার সৈন্যদল এসে পড়ল।

কলিঙ্গ। তা হ'তে পারে কিন্তু তা হ'লে ত দূতের মুখে সংবাদ পাওয়া যেত।

বিদর্ভ। আমার কাছে এটা কিন্তু দুর্লক্ষণ বলে' মনে হচ্চে।

কাঞ্চী। ভয়ের চক্ষে সব লক্ষণই দুর্লক্ষণ।

বিদর্ভ। অদৃষ্ট পুরুষকে ভয় করি, সেখানে বীরত্ব খাটে না।

পাঞ্চাল। বিদর্ভরাজ, আজকেকার শুভকার্য্যে দ্বিধা জন্মিয়ে দিয়ো না।

কাঞ্চী। অদৃষ্ট যখন দৃষ্ট হবেন তখন তার সঙ্গে বোঝাপড়া করা যাবে।

বিদর্ভ। তখন হয়ত সময় থাক্‌বে না। আমার আশঙ্কা হচ্চে যেন একটা—

কাঞ্চী। ঐ যেন-একটার কথা তুল্‌বেন না—ওটা আমাদেরই সৃষ্টি অথচ আমাদেরই বিনাশ করে।

কলিঙ্গ। বাইরে বাজনা বাজ্‌চে না কি?

পাঞ্চাল। বাজনা বলেই বোধ হচ্চে।

কাঞ্চী। তবে আর কি—নিশ্চয়ই রাণী সুদর্শনা। বিধাতা এতক্ষণ পরে আমাদের ভাগ্যফল নিয়ে আস্‌চেন—এ

তাঁরই পায়ের শব্দ। (জনান্তিকে) সুবর্ণ অমনতর সঙ্কুচিত হ'য়ে আমার আড়ালে আপনাকে লুকিয়ে রেখো না। তোমার হাতে আমার রাজছত্র কাঁপ্‌চে যে!

(যোদ্ধবেশে ঠাকুর্দ্দার প্রবেশ)

কলিঙ্গ। ও কি ও? এ কে?

পাঞ্চাল। বিনা আহ্বানে প্রবেশ করে লোকটা কে হে!

বিরাট। স্পর্দ্ধা ত কম নয়। কলিঙ্গরাজ তুমি এ'কে রোধ কর।

কলিঙ্গ। আপনারা বয়োজ্যেষ্ঠ থাক্‌তে আমার অগ্রসর হওয়া অশোভন হবে।

বিদর্ভ। শোনা যাক্ না কি বলে।

ঠাকুর্দ্দা। রাজা এসেছেন।

বিদর্ভ। (সচকিত হইয়া) রাজা?

পাঞ্চাল। কোন্ রাজা?

কলিঙ্গ। কোথাকার রাজা?

ঠাকুর্দ্দা। আমার রাজা।

বিরাট। তোমার রাজা?

কলিঙ্গ। কে?

কোশল। কে সে?

ঠাকুর্দ্দা। আপনারা সকলেই জানেন তিনি কে। তিনি এসেছেন।

বিদর্ভ। এসেছেন ?

কোশল। কি তাঁর অভিপ্রায় ?

ঠাকুর্দ্দা। তিনি আপনাদের আহ্বান করেছেন।

কাঞ্চী। ইস্! আহ্বান! কি ভাবে আহ্বান করেছেন ?

ঠাকুর্দ্দা। তাঁর আহ্বান যিনি যে ভাবে গ্রহণ করতে ইচ্ছা করেন বাধা নেই—সকল প্রকার অভ্যর্থনাই প্রস্তুত আছে।

বিরাট। তুমি কে ?

ঠাকুর্দ্দা। আমি তাঁর সেনাপতিদের মধ্যে একজন।

কাঞ্চী। সেনাপতি ? মিথ্যে কথা! ভয় দেখাতে এসেছ ? তুমি মনে করেছ তোমার ছদ্মবেশ আমার কাছে ধরা পড়ে নি ? তোমাকে বিলক্ষণ চিনি—তুমি আবার সেনাপতি ?

ঠাকুর্দ্দা। আপনি আমাকে ঠিক চিনেছেন। আমার মত অক্ষম কে আছে ? তবু আমাকেই আজ তিনি সেনাপতির বেশ পরিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন। বড় বড় বীরদের ঘরে বসিয়ে রেখেছেন।

কাঞ্চী। আচ্ছা, উপযুক্ত সমারোহে আমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাব—কিন্তু উপস্থিত একটা কাজ আছে সেটা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে।

ঠাকুর্দ্দা। যখন তিনি আহ্বান করেন তখন তিনি আর অপেক্ষা করেন না।

কোশল। আমি তাঁর আহ্বান স্বীকার করচি। এখনি যাব।

বিদর্ভ। কাঞ্চীরাজ, অপেক্ষা করার কথাটা ভালো ঠেক্‌চে না। আমি চল্লুম।

কলিঙ্গ। আপনি প্রবীণ আমরা আপনারই অনুসরণ করব।

পাঞ্চাল। ওহে কাঞ্চীরাজ, পিছনে চেয়ে দেখ তোমার রাজছত্র ধূলায় লুটচ্চে; তোমার ছত্রধর কখন পালিয়েছে জান্‌তেও পার নি।

কাঞ্চী। আচ্ছা, আমিও যাচ্চি, রাজদূত—কিন্তু সভায় নয়, রণক্ষেত্রে।

ঠাকুর্দ্দা। রণক্ষেত্রেই আমার প্রভুর সঙ্গে আপনার পরিচয় হবে, সেও অতি উত্তম প্রশস্ত স্থান।

বিরাট। ওহে, আমরা সকলে হয়ত কাল্পনিক ভয়ে ভঙ্গ দিচ্চি—শেষকালে দেখ্‌চি একা কাঞ্চীরাজেরই জিত হবে।

পাঞ্চাল। তা হ'তে পারে। ফলটা প্রায় হাতের কাছে এসেছে এখন ভীরুতা করে' সেটা ফেলে যাওয়া ভালো হচ্চে না।

কলিঙ্গ। কাঞ্চীর সঙ্গে যোগ দেওয়াই শ্রেয়। ও যখন এতটা সাহস করচে তখন ও কি কিছু বিবেচনা না করেই করচে?

১৬

সুদর্শনা ও সুরঙ্গমা

সুদর্শনা। যুদ্ধ ত শেষ হ'য়ে গেল। এখন আমার রাজা আস্‌বেন কখন ?

সুরঙ্গমা। তা ত বল্‌তে পারিনে— পথ চেয়ে বসে' আছি।

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা, বুকের ভিতরটাতে আনন্দে এমন কাঁপ্‌চে যে বেদনা বোধ হচ্চে। লজ্জাতেও মরে' যাচ্চি— মুখ দেখাব কেমন করে' ?

সুরঙ্গমা। এবার একেবারে হার মেনে তাঁর কাছে যাও তাহ'লে আর লজ্জা থাক্‌বে না।

সুদর্শনা। স্বীকার ত করতেই হবে চিরদিনের মত আমার হার হ'য়ে গেছে— কিন্তু এতদিন গর্ব্ব করে' তার কাছে সকলের চেয়ে বেশি আদরের দাবী করে' এসেছি কি না, সেটা একেবারে ছেড়ে দিতে পারচিনে! সবাই যে বল্‌ত আমার অনেক রূপ, অনেক গুণ, সবাই যে বল্‌ত আমার উপরে রাজার অনুগ্রহের অন্ত নেই— সেই জন্যেই ত সকলের সাম্‌নে আমার হৃদয় নত হ'তে এত লজ্জা বোধ করচে।

সুরঙ্গমা। অভিমান না ঘুচ্‌লে ত লজ্জাও ঘুচ্‌বে না।

সুদর্শনা। তাঁর কাছ থেকে আদর পাবার ইচ্ছা যে কিছুতে মন থেকে ঘুচ্‌তে চায় না।

সুরঙ্গমা। সব ঘুচ্‌বে রাণী মা, কেবল একটি ইচ্ছা থাক্‌বে, নিজেকে নিবেদন করবার ইচ্ছা।

সুদর্শনা। সেই আঁধার ঘরের ইচ্ছা—দেখা নয়, শোনা নয়, চাওয়া নয়, কেবল গভীরের মধ্যে আপনাকে ছেড়ে দেওয়া! সুরঙ্গমা, সেই আশীর্ব্বাদ কর্ যেন—

সুরঙ্গমা। কি বল তুমি! আমি আশীর্ব্বাদ করব কিসের?

সুদর্শনা। সকলের কাছে নত হ'য়ে আমি আশীর্ব্বাদ নেব। সবাই বল্‌ত এত প্রসাদ রাজা আর কাউকে দেন নি। তাই শুনে হৃদয় এত শক্ত হয়েছে যে আমার রাজাকেও আঘাত করতে পেরেছি। এত শক্ত হয়েছে যে নুইতে লজ্জা করচে। এই লজ্জা কাটাতে হবে—সমস্ত পৃথিবীর কাছে নীচু হবার দিন আমার এসেছে। কিন্তু, কই রাজা এখনো কেন আমাকে নিতে আস্‌চেন না? আরো কিসের জন্যে তিনি অপেক্ষা করচেন?

সুরঙ্গমা। আমি ত বলেছি আমার রাজা নিষ্ঠুর—বড় নিষ্ঠুর!

সুদর্শনা। সুরঙ্গমা তুই যা, একবার তাঁর খবর নিয়ে আয়গে।

সুরঙ্গমা। কোথায় তাঁর খবর নেব তা ত কিছুই জানিনে।

ঠাকুর্দ্দাকে ডাক্‌তে পাঠিয়েছি—তিনি এলে হয় ত তাঁর কাছ থেকে সংবাদ পাওয়া যাবে।

(ঠাকুর্দ্দার প্রবেশ।)

সুদর্শনা। শুনেছি তুমি আমার রাজার বন্ধু—আমার প্রণাম গ্রহণ কর, আমাকে আশীর্ব্বাদ কর।

ঠাকুর্দ্দা। কর কি, কর কি রাণী! আমি কারো প্রণাম গ্রহণ করিনে। আমার সঙ্গে সকলের হাসির সম্বন্ধ।

সুদর্শনা। তোমার সেই হাসি দেখিয়ে দাও—আমাকে সুসংবাদ দিয়ে যাও। বল আমার রাজা কখন্ আমাকে নিতে আস্‌বেন?

ঠাকুর্দ্দা। ঐ ত বড় শক্ত কথা জিজ্ঞাসা করলে! আমার বন্ধুর ভাব-গতিক কিছুই বুঝিনে তা'র আর বল্‌ব কি! যুদ্ধ ত শেষ হ'য়ে গেল তিনি যে কোথায় তা'র সন্ধান নেই!

সুদর্শনা। চলে' গিয়েছেন?

ঠাকুর্দ্দা। সাড়া শব্দ ত কিছুই পাইনে।

সুদর্শনা। চলে' গিয়েছেন? তোমার বন্ধু এমনি বন্ধু!

ঠাকুর্দ্দা। সেই জন্যে লোকে তা'কে নিন্দেও করে সন্দেহও করে! কিন্তু আমার রাজা তা'তে খেয়ালও করে না।

সুদর্শনা। চলে' গেলেন? ওরে, ওরে, কি কঠিন, কি কঠিন! একেবারে পাথর, একেবারে বজ্র! সমস্ত

বুক দিয়ে ঠেল্‌চি—বুক ফেটে গেল—কিন্তু নড়্‌ল না। ঠাকুর্দ্দা, এমন বন্ধুকে নিয়ে তোমার চলে কি করে’?

ঠাকুর্দ্দা। চিনে নিয়েছি যে—সুখে দুঃখে তা’কে চিনে নিয়েছি—এখন আর সে কাঁদাতে পারে না।

সুদর্শনা। আমাকেও সে কি চিন্‌তে দেবে না?

ঠাকুর্দ্দা। দেবে বই কি—নইলে এত দুঃখ দিচ্চে কেন? ভালো করে’ চিনিয়ে তবে ছাড়বে, সে ত সহজ লোক নয়!

সুদর্শনা। আচ্ছা আচ্ছা দেখ্‌ব তা’র কতবড় নিষ্ঠুরতা! এই জান্‌লার কাছে আমি চুপ করে’ পড়ে’ থাক্‌ব—এক পা নড়ব না—দেখি সে কেমন না আসে!

ঠাকুর্দ্দা। দিদি তোমার বয়স অল্প—জেদ করে’ অনেক দিন পড়ে’ থাক্‌তে পার—কিন্তু আমার যে এক মুহূর্ত্ত গেলেও লোকসান বোধ হয়! পাই না পাই একবার খুঁজ্‌তে বেরব!

(প্রস্থান)

সুদর্শনা। চাইনে তা’কে চাইনে! সুরঙ্গমা, তোর রাজাকে আমি চাইনে! কিসের জন্যে সে যুদ্ধ করতে এল? আমার জন্যে একেবারেই না? কেবল বীরত্ব দেখাবার জন্যে?

সুরঙ্গমা। দেখাবার ইচ্ছে তাঁর যদি থাক্‌ত তাহ’লে এমন

করে' দেখাতেন কারো আর সন্দেহ থাক্‌ত না। দেখালেন আর কই ?

সুদর্শনা যা যা চলে' যা—তোর কথা অসহ্য বোধ হচ্চে! এত নত করলে তবু সাধ মিট্‌ল না? বিশ্বসুদ্ধ লোকের সাম্‌নে আমাকে এইখানে ফেলে রেখে দিয়ে চলে' গেল ?

১৭

নাগরিক দল

প্রথম। ওহে এতগুলো রাজা একত্র হ'য়ে লড়াই বাধিয়ে দিলে, ভাবলুম খুব তামাসা হবে—কিন্তু দেখ্তে দেখ্তে কি যে হ'য়ে গেল ভালো বোঝাই গেল না !

দ্বিতীয়। দেখ্লে না, ওদের নিজেদের মধ্যেই গোলমাল বেধে গেল—কেউ যে কাউকে বিশ্বাস করে না।

তৃতীয়। পরামর্শ ঠিক রইল না যে। কেউ এগতে চায় কেউ পিছুতে চায়—কেউ এদিকে যায় কেউ ওদিক যায় এ'কে কি আর যুদ্ধ বলে ?

প্রথম। ওরা ত লড়াইয়ের দিকে চোখ রাখে নি—ওরা পরস্পরের দিকেই চোখ রেখেছিল।

দ্বিতীয়। কেবলি ভাবছিল লড়াই করে' মরব আমি আর তা'র ফল ভোগ করবে আর কেউ।

তৃতীয়। কিন্তু লড়েছিল কাঞ্চীরাজ সে কথা বল্তেই হবে।

প্রথম। সে যে হেরেও হারতে চায় না।

দ্বিতীয়। শেষকালে অস্ত্রটা একেবারে তা'র বুকে এসে লাগ্ল।

তৃতীয়। তা'র আগে সে যে পদে পদেই হারছিল তা যেন টেরও পাচ্ছিল না।

প্রথম। অন্য রাজারা ত তা'কে ফেলে কে কোথায় পালালো তা'র ঠিক নেই।

দ্বিতীয়। কিন্তু শুনেছি কাঞ্চীরাজ মরেনি!

তৃতীয়। না, চিকিৎসায় বেঁচে গেল কিন্তু তা'র বুকের মধ্যে যে হারের চিহ্নটা আঁকা রইল সে ত আর এ জন্মে মুচবে না!

প্রথম। রাজারা কেউ পালিয়ে রক্ষা পায়নি—সবাই ধরা পড়েছে! কিন্তু বিচারটা কি রকম হ'ল?

দ্বিতীয়। আমি শুনেছি সকল রাজারই দণ্ড হয়েছে, কেবল কাঞ্চীর রাজাকে বিচারকর্ত্তা নিজের সিংহাসনের দক্ষিণপার্শ্বে বসিয়ে স্বহস্তে তা'র মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিয়েছে।

তৃতীয়। এটা কিন্তু একেবারেই বোঝা গেল না!

দ্বিতীয়। বিচারটা যেন কেমন বেখাপ্ রকম শোনাচ্চে!

প্রথম। তা ত বটেই! অপরাধ যা কিছু করেছে সে ত ঐ কাঞ্চীর রাজা! এরা ত একবার লোভে একবার ভয়ে কেবল এগচ্ছিল আর পিছচ্ছিল।

তৃতীয়। এ কেমন হ'ল! যেন বাঘটা গেল বেঁচে আর তা'র ল্যাজটা গেল কাটা!

দ্বিতীয়। আমি যদি বিচারক হতুম তাহ'লে কাঞ্চীকে কি

আর আস্ত রাখ্‌তুম? ওর আর চিহ্ন দেখাই যেত না।

তৃতীয়। কি জানি ভাই, মস্ত মস্ত বিচারকর্ত্তা—ওদের বুদ্ধি এক রকমের।

প্রথম। ওদের বুদ্ধি বলে' কিছু আছে কি! ওদের সবই মর্জ্জি। কেউ ত বল্‌বার লোক নেই।

দ্বিতীয়। যা বলিস্ ভাই, আমাদের হাতে শাসনের ভার যদি পড়ত তাহ'লে এর চেয়ে ঢের ভালো করে' চালাতে পারতুম।

তৃতীয়। সে কি একবার করে' বল্‌তে!

১৮

পথ

ঠাকুর্দ্দা ও কাঞ্চীরাজ

ঠাকুর্দ্দা। এ কি কাঞ্চীরাজ তুমি পথে যে!

কাঞ্চী। তোমার রাজা আমায় পথেই বের করেছে।

ঠাকুর্দ্দা। ঐ ত তা'র স্বভাব!

কাঞ্চী। তা'র পরে আর নিজের দেখা নেই।

ঠাকুর্দ্দা। সেও তা'র এক কৌতুক।

কাঞ্চী। কিন্তু আমাকে এমন করে' আর কতদিন এড়াবে? যখন কিছুতেই তা'কে রাজা বলে' মান্‌তেই চাইনি তখন কোথা থেকে কালবৈশাখীর মত এসে এক মুহূর্ত্তে আমার ধ্বজা পতাকা ভেঙে উড়িয়ে ছারখার করে' দিলে আর আজ তা'র কাছে হার মান্‌বার জন্যে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্চি তা'র আর দেখাই নেই।

ঠাকুর্দ্দা। তা হোক্ সে যত বড় রাজাই হোক্ হার-মানার কাছে তা'কে হার মান্‌তেই হবে। কিন্তু রাজন্, রাত্রে বেরিয়েছ যে।

কাঞ্চী। ঐ লজ্জাটুকু এখনো ছাড়তে পারিনি। কাঞ্চীর রাজা থালায় মুকুট সাজিয়ে তোমার রাজার মন্দির

খুঁজে বেড়াচ্চে এই যদি দিনের আলোয় লোকে দেখে তাহ'লে যে তা'রা হাস্‌বে।

ঠাকুর্দ্দা। লোকের ঐ দশা বটে। যা দেখে' চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যায় তাই দেখেই বাঁদররা হাসে!

কাঞ্চী। কিন্তু ঠাকুর্দ্দা তোমার এ কি কাণ্ড! সেই উৎসবের ছেলেদের এখানেও জুটিয়ে এনেছ? কিন্তু সেখানে যারা তোমার পিছে পিছে ঘুরত তাদের দেখ্‌চিনে বড়?

ঠাকুর্দ্দা। আমার শম্ভু সুধনের দল? তা'রা এবার লড়াইয়ে মরেছে।

কাঞ্চী। মরেছে?

ঠাকুর্দ্দা। হাঁ, তা'রা আমাকে বল্লে, ঠাকুর্দ্দা, পণ্ডিতরা যা বলে আমরা কিছুই বুঝ্‌তে পারিনে, তুমি যে গান গাও তা'র সঙ্গেও গলা মেলাতে পারিনে, কিন্তু একটা কাজ আমরা করতে পারি, আমরা মরতে পারি—আমাদের যুদ্ধে নিয়ে যাও, জীবনটা সার্থক করে' আসি। তা যেমন কথা তেমন কাজ। সকলের আগে গিয়ে তা'রা দাঁড়াল, সকলের আগেই তা'রা প্রাণ দিয়ে বসে' আছে।

কাঞ্চী। সীধে রাস্তা ধরে' সব বুদ্ধিমানদের চেয়ে এগিয়ে গেল আর কি। এখন এই ছেলের দল নিয়ে কি বাল্যলীলাটা চল্‌চে?

ঠাকুর্দ্দা। এবারকার বসন্ত-উৎসবটা নানা ক্ষেত্রে নানা রকম হ'য়ে গেল, তাই সকল পালার মধ্যে দিয়ে এদের ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চি। সেদিন বাগানের মধ্যে দিয়ে দিব্যি লাল হ'য়ে উঠেছিল—রণক্ষেত্রেও মন্দ জমেনি। সে ত চু'কৃল আজ আবার আমাদের বড় রাস্তার বড় দিন। আজ ঘরের মানুষদের পথে বের করবার জন্যে দক্ষিণ হাওয়ার মত দলবল নিয়ে বেরিয়েছি। ধরত রে ভাই, তোদের সেই দরজায় ঘা দেবার গানটা ধর!

গান

আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।
তব অবগুন্ঠিত কুন্ঠিত জীবনে
কোরো না বিড়ম্বিত তা'রে।
আজি খুলিয়ো হৃদয়দল খুলিয়ো,
আজি ভুলিয়ো আপন পর ভুলিয়ো,
এই সঙ্গীতমুখরিত গগনে,
তব গন্ধ তরঙ্গিয়া তুলিয়ো!
এই বাহির ভুবনে দিশা হারায়ে
দিয়ো ছড়ায়ে মাধুরী ভারে ভারে।

অতি নিবিড় বেদনা বন মাঝেরে,
আজি পল্লবে পল্লবে বাজেরে।

দূরে গগনে কাহার পথ চাহিয়া,
আজি ব্যাকুল বসুন্ধরা সাজেরে।
মোর পরাণে দখিন বায়ু লাগিছে,
কারে দ্বারে দ্বারে কর হানি মাগিছে,
এই সৌরভবিহ্বলা রজনী
কার চরণে ধরণীতলে জাগিছে?
ওগো সুন্দর, বল্লভ, কান্ত,
তব গম্ভীর আহ্বান কারে।

১৯

পথ

সুদর্শনা ও সুরঙ্গমা

সুদর্শনা। বেঁচেছি, বেঁচেছি সুরঙ্গমা! হার মেনে তবে বেঁচেছি! ওরে বাস্‌রে! কি কঠিন অভিমান! কিছুতেই গল্‌তে চায় না। আমার রাজা কেন আমার কাছে আস্‌তে যাবে—আমিই তাঁর কাছে যাব এই কথাটা কোনোমতেই মনকে বলাতে পারছিলুম না! সমস্ত রাতটা সেই জানালায় পড়ে' ধূলোয় লুটিয়ে কেঁদেছি—দক্ষিণে হাওয়া বুকের বেদনার মত হুহু করে' বয়েছে, আর কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর অন্ধকারে বউকথাকও চার পহর রাত কেবলি ডেকেছে—সে যেন অন্ধকারের কান্না!

সুরঙ্গমা। আহা কালকের রাতটা মনে হয়েছিল যেন কিছুতেই আর পোহাতে চায় না!

সুদর্শনা। কিন্তু বল্লে বিশ্বাস করবিনে তারি মধ্যে বার বার আমার মনে হচ্ছিল কোথায় তা'র বীণা বাজ্‌ছিল।

যে নিষ্ঠুর, তা'র কঠিন হাতে কি অমন মিনতির সুর বাজে ! বাইরের লোক আমার অসম্মানটাই দেখে গেল—কিন্তু গোপন রাত্রের সেই সুরটা কেবল আমার হৃদয় ছাড়া আর ত কেউ শুন্‌ল না ! সে বীণা তুই কি শুনেছিলি সুরঙ্গমা ? না সে আমার স্বপ্ন !

সুরঙ্গমা। সেই বীণা শুনব বলেই ত তোমার কাছে কাছে আছি। অভিমান-গলানো সুর বাজবে জেনেই কান পেতে পড়েছিলুম।

সুদর্শনা। তা'র পণটাই রইল—পথে বের করলে তবে ছাড়লে। মিলন হ'লে এই কথাটাই তা'কে বল্‌ব যে, আমিই এসেছি, তোমার আসার অপেক্ষা করিনি। বল্‌ব চোখের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে এসেছি—কঠিন পথ ভাঙ্‌তে ভাঙ্‌তে এসেছি ! এ গর্ব্ব আমি ছাড়ব না !

সুরঙ্গমা। কিন্তু সে গর্ব্বও তোমার টিঁক্‌বে না। সে যে তোমারও আগে এসেছিল নইলে তোমাকে বের করে কা'র সাধ্য !

সুদর্শনা। তা হয় ত এসেছিল—আভাস পেয়েছিলুম কিন্তু বিশ্বাস করতে পারিনি। যতক্ষণ অভিমান করে' বসেছিলুম ততক্ষণ মনে হয়েছিল সেও আমাকে ছেড়ে গিয়েছে—অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে যখনি রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম তখনি মনে হ'ল সেও বেরিয়ে এসেছে,

রাস্তা থেকেই তা'কে পাওয়া স্থরু করেছি। এখন আমার মনে আর কোনো ভাবনা নেই। তা'র জন্যে এত যে দুঃখ এই দুঃখই আমাকে তা'র সঙ্গে দিচ্চে—এত কষ্টের রাস্তা আমার পায়ের তলায় যেন স্থরে স্থরে বেজে উঠ্‌চে—এ যেন আমার বীণা, আমার দুঃখের বীণা—এরই বেদনার গানে তিনি এই কঠিন পাথরে এই শুক্‌নো ধূলোয় আপনি বেরিয়ে এসেছেন—আমার হাত ধরেছেন—সেই আমার অন্ধকার ঘরের মধ্যে যেমন করে' হাত ধরতেন—হঠাৎ চম্‌কে উঠে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ত—এও সেই রকম। কে বল্লে, তিনি নেই? স্থরঙ্গমা তুই কি বুঝ্‌তে পারচিস্‌নে তিনি লুকিয়ে এসেছেন?

স্থরঙ্গমার গান

অন্ধকারের মাঝে আমায় ধরেছ দুই হাতে।
কখন্ তুমি এলে, হে নাথ, মৃদু চরণপাতে?
ভেবেছিলেম, জীবনস্বামী,
তোমায় বুঝি হারাই আমি,
আমায় তুমি হারাবে না বুঝেছি আজ রাতে।
যে নিশীথে আপন হাতে নিবিয়ে দিলেম আলো,
তারি মাঝে তুমি তোমার ধ্রুবতারা জ্বালো।
তোমার পথে চলা যখন
ঘুচে গেল, দেখি তখন
আপনি তুমি আমার পথে লুকিয়ে চল সাথে॥

সুদর্শনা। ও কেও! চেয়ে দেখ্ সুরঙ্গমা, এত রাত্রে এই আঁধার পথে আরো একজন পথিক বেরিয়েছে যে!

সুরঙ্গমা। মা, এ যে কাঞ্চীর রাজা দেখ্‌চি।

সুদর্শনা। কাঞ্চীর রাজা?

সুরঙ্গমা। ভয় কোরো না মা!

সুদর্শনা। ভয়! ভয় কেন করব? ভয়ের দিন আমার আর নেই।

কাঞ্চীরাজ (প্রবেশ করিয়া)

মা, তুমিও চলেছ বুঝি! আমিও এই এক পথেরই পথিক! আমাকে কিছুমাত্র ভয় কোরো না।

সুদর্শনা। ভালোই হয়েছে কাঞ্চীরাজ—আমরা দুজনে তাঁর কাছে পাশাপাশি চলেছি এ ঠিক হয়েছে। ঘর ছেড়ে বেরবার মুখেই তোমার সঙ্গে আমার যোগ হয়েছিল —আজ ঘরে ফেরবার পথে সেই যোগই যে এমন শুভ যোগ হ'য়ে উঠ্‌বে তা আগে কে মনে করতে পারত!

কাঞ্চী। কিন্তু, মা, তুমি যে হেঁটে চলেছ এ ত তোমাকে শোভা পায় না। যদি অনুমতি কর তাহ'লে এখনি রথ আনিয়ে দিতে পারি।

সুদর্শনা। না, না, অমন কথা বোলো না—যে পথ দিয়ে তাঁর কাছ থেকে দূরে এসেছি সেই পথের সমস্ত

ধূলোটা পা দিয়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে ফিরব তবেই আমার বেরিয়ে আসা সার্থক হবে। রথে করে' নিয়ে গেলে আমাকে ফাঁকি দেওয়া হবে।

সুরঙ্গমা। মহারাজ, তুমিও ত আজ ধূলোয়। এ পথে ত হাতী ঘোড়া রথ কারো দেখিনি।

সুদর্শনা। যখন রাণী ছিলুম তখন কেবল সোনারূপোর মধ্যেই পা ফেলেছি—আজ তাঁর ধূলোর মধ্যে চলে' আমার সেই ভাগ্যদোষ খণ্ডিয়ে নেব! আজ আমার সেই ধূলোমাটির রাজার সঙ্গে পদে পদে এই ধূলো-মাটিতে মিলন হচ্চে এ সুখের খবর কে জান্‌ত!

সুরঙ্গমা। রাণী মা, ঐ দেখ, পূর্ব্বদিকে চেয়ে দেখ, ভোর হ'য়ে আস্‌চে। আর দেরি নেই মা—তাঁর প্রাসাদের সোনার চূড়ার শিখর দেখা যাচ্চে।

গান

ভোর হ'ল বিভাবরী, পথ হ'ল অবসান!
শুন ওই লোকে লোকে উঠে আলোকেরি গান।
ধন্য হ'লি ওরে পান্থ
রজনী-জাগরক্লান্ত,
ধন্য হ'ল মরি মরি ধূলায় ধূসর প্রাণ।
বনের কোলের কাছে
সমীরণ জাগিয়াছে।

মধুভিক্ষু সারে সারে
আগত কুঞ্জের দ্বারে।
হ'ল তব যাত্রা সারা,
মোছ মোছ অশ্রুধারা,
লজ্জাভয় গেল ঝরি ঘুচিলরে অভিমান ॥

(ঠাকুর্দ্দার প্রবেশ)

ঠাকুর্দ্দা। ভোর হ'ল, দিদি, ভোর হ'ল।

সুদর্শনা। তোমাদের আশীর্ব্বাদে পৌঁছেচি, ঠাকুর্দ্দা, পৌঁছেচি।

ঠাকুর্দ্দা। কিন্তু আমাদের রাজার রকম দেখেছ? রথ নেই, বাদ্য নেই, সমারোহ নেই!

সুদর্শনা। বল কি, সমারোহ নেই? ঐ যে আকাশ একেবারে রাঙা, ফুলগন্ধের অভ্যর্থনায় বাতাস একেবারে পরিপূর্ণ!

ঠাকুর্দ্দা। তা হোক্, আমাদের রাজা যত নিষ্ঠুর হোক্ আমরা ত তেমন কঠিন হ'তে পারিনে—আমাদের যে ব্যথা লাগে! এই দীনবেশে তুমি রাজভবনে যাচ্চ এ কি আমরা সহ্য করতে পারি? একটু দাঁড়াও, আমি ছুটে গিয়ে তোমার রাণীর বেশটা নিয়ে আসি।

সুদর্শনা। না, না, না! সে রাণীর বেশ তিনি আমাকে চিরদিনের মত ছাড়িয়েছেন—সবার সাম্‌নে আমাকে

দাসীর বেশ পরিয়েছেন—বেঁচেছি বেঁচেছি—আমি আজ তাঁর দাসী—যে-কেউ তাঁর আছে আমি আজ সকলের নীচে।

ঠাকুর্দ্দা। শত্রুপক্ষ তোমার এ দশা দেখে পরিহাস করবে সেইটে আমাদের অসহ্য হয়।

সুদর্শনা। শত্রুপক্ষের পরিহাস অক্ষয় হোক্—তা'রা আমার গায়ে ধূলো দিক্! আজকের দিনের অভিসারে সেই ধূলোই যে আমার অঙ্গরাগ।

ঠাকুর্দ্দা। এর উপরে আর কথা নেই। এখন আমাদের বসন্ত-উৎসবের শেষ খেলাটাই চলুক্—ফুলের রেণু এখন থাক, দক্ষিণে হাওয়ায় এবার ধূলো উড়িয়ে দিক্! সকলে মিলে আজ ধূসর হ'য়ে প্রভুর কাছে যাব! গিয়ে দেখ্‌ব তা'র গায়েও ধূলো মাখা। তা'কে বুঝি কেউ ছাড়ে মনে করচ? যে পায় তা'র গায়ে মুঠো মুঠো ধূলো দেয় যে—সে ধূলো সে ঝেড়েও ফেলে না!

কাঞ্চী। ঠাকুর্দ্দা, তোমাদের এই ধূলোর খেলায় আমাকেও ভুলো না! আমার এই রাজবেশটাকে এমনি মাটি করে' নিয়ে যেতে হবে যাতে এ'কে আর চেনা না যায়।

ঠাকুর্দ্দা। সে আর দেরি হবে না ভাই। যেখানে নেবে এসেছ এখানে যত তোমার মিথ্যে মান সব ঘুচে গেছে

—এখন দেখ্‌তে দেখ্‌তে রং ফিরে যাবে।—আর এই আমাদের রাণীকে দেখ—ও নিজের উপর ভারি রাগ করেছিল—মনে করেছিল গয়না ফেলে দিয়ে নিজের ভুবনমোহন রূপকে লাঞ্ছনা দেবে—কিন্তু সে রূপ অপমানের আঘাতে আরো ফুটে পড়েছে—সে যেন কোথাও আর কিছু ঢাকা নেই। আমাদের রাজাটির নিজের নাকি রূপের সম্পর্ক নেই তাই ত এই বিচিত্র রূপ সে এত ভালবাসে, এই রূপই ত তা'র বক্ষের অলঙ্কার। সেই রূপ আপনার গর্ব্বের আবরণ ঘুচিয়ে দিয়েছে—আজ আমার রাজার ঘরে কি সুরে যে এতক্ষণে বীণা বেজে উঠেছে তাই শোন্‌বার জন্যে প্রাণটা ছটফট করচে।

সুরঙ্গমা। ঐ যে সূয্য উঠ্‌ল!

—

২০

অন্ধকার ঘর

সুরঙ্গমা। প্রভু, যে আদর কেড়ে নিয়েছ সে আদর আর ফিরিয়ে দিয়ো না; আমি তোমার চরণের দাসী, আমাকে সেবার অধিকার দাও!

রাজা। আমাকে সইতে পারবে?

সুদর্শনা। পারব রাজা পারব! আমার প্রমোদবনে আমার রাণীর ঘরে তোমাকে দেখ্‌তে চেয়েছিলুম বলেই তোমাকে এমন বিরূপ দেখেছিলুম—সেখানে তোমার দাসের অধম দাসকেও তোমার চেয়ে চোখে সুন্দর ঠেকে। তোমাকে তেমন করে' দেখ্‌বার তৃষ্ণা আমার একেবারে ঘুচে গেছে—তুমি সুন্দর নও প্রভু সুন্দর নও, তুমি অনুপম!

রাজা। তোমারি মধ্যে আমার উপমা আছে।

সুদর্শনা। যদি থাকে ত সেও অনুপম। আমার মধ্যে তোমার প্রেম আছে সেই প্রেমেই তোমার ছায়া পড়ে, সেইখানেই তুমি আপনার রূপ আপ্‌নি দেখ্‌তে পাও—সে আমার কিছুই নয়, সে তোমার।

রাজা। আজ এই অন্ধকার ঘরের দ্বার একেবারে খুলে দিলুম—এখানকার লীলা শেষ হ'ল! এস, এবার আমার সঙ্গে এস, বাইরে চলে' এস—আলোয়!

সুদর্শনা। যাবার আগে আমার অন্ধকারের প্রভুকে আমার নিষ্ঠুরকে আমার ভয়ানককে প্রণাম করে' নিই!

অচলায়তন

অচলায়তন

১

অচলায়তনের গৃহ

পঞ্চকের

গান

তুমি ডাক দিয়েছ কোন সকালে
কেউ তা জানে না,
আমার মন যে কাঁদে আপন মনে
কেউ তা মানে না।
ফিরি আমি উদাস প্রাণে,
তাকাই সবার মুখের পানে,
তোমার মতন এমন টানে
কেউ ত টানে না।

(মহাপঞ্চকের প্রবেশ)

মহাপঞ্চক। গান! আবার গান!

পঞ্চক। দাদা, তুমি ত দেখ্‌লে—তোমাদের এখানকার মন্ত্রতন্ত্র আচার আচমন সূত্র বৃত্তি কিছুই পারলুম না।

মহাপঞ্চক। সে ত দেখ্‌তে বাকি নেই—কিন্তু সেটা কি খুব আনন্দ করবার বিষয়? তাই নিয়ে কি গলা ছেড়ে গান গাইতে হবে?

পঞ্চক। একমাত্র ঐটেই যে পারি!

মহাপঞ্চক। পারি! ভারি অহঙ্কার! গান ত পাখীও গাইতে পারে! সেই যে বজ্রবিদারণ মন্ত্রটা আজ সাত দিন ধরে' তোমার মুখস্থ হ'ল না আজ তা'র কি কর্‌লে?

পঞ্চক। সাত দিন যেমন হয়েচে অষ্টম দিনেও অনেকটা সেই রকম। বরঞ্চ একটু খারাপ।

মহাপঞ্চক। খারাপ! তা'র মানে কি হ'ল।

পঞ্চক। জিনিষটা যতই পুরোনো হচ্চে মন ততই লাগ্‌চে না, ভুল ততই করচি—ভুল যতই বেশিবার করচি ততই সেইটেই পাকা হ'য়ে যাচ্চে। তাই, গোড়ায় তোমরা যেটা বলে' দিয়েছিলে আর আজ আমি যেটা আওড়াচ্চি দুটোর মধ্যে অনেকটা তফাৎ হ'য়ে গেচে। চেনা শক্ত।

মহাপঞ্চক। সেই তফাৎটা ঘোচাতে হবে, নির্ব্বোধ!

পঞ্চক। সহজেই ঘোচে, যদি তোমাদেরটাকেই আমার মত করে' নাও! নইলে, আমি ত পারব না।

মহাপঞ্চক। পারবে না কি! পারতেই হবে!

পঞ্চক। তাহ'লে আর একবার সেই গোড়া থেকে চেষ্টা করে' দেখি—একবার মন্ত্রটা আউড়ে দিয়ে যাও।

মহাপঞ্চক। আচ্ছা, বেশ, আমার সঙ্গে আবৃত্তি করে' যাও! ওঁ তট তট তোতয় তোতয় স্ফট স্ফট স্ফোটয় স্ফোটয় ঘুণ ঘুণ ঘুণাপয় ঘুণাপয় স্বর বসন্তানি। চুপ করে' রইলে যে!

পঞ্চক। ওঁ তট তট তোতয় তোতয়—আচ্ছা দাদা!

মহাপঞ্চক। আবার দাদা! মন্ত্রটা শেষ কর বল্‌চি!

পঞ্চক। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—এ মন্ত্রটার ফল কি?

মহাপঞ্চক। এ মন্ত্র প্রত্যহ সূর্য্যোদয়ে সূর্য্যাস্তে উনসত্তর বার জপ করলে নব্বই বছর পরমায়ু হয়।

পঞ্চক। রক্ষা কর দাদা! এটা জপ করতে গিয়ে আমার এক বেলাকেই নব্বই বছর মনে হয়—দ্বিতীয় বেলায় মনে হয় মরেই গেচি!

মহাপঞ্চক। আমার ভাই হ'য়েও তোমার এই দশা! তোমার জন্যে অচলায়তনের সকলের কাছে কি আমার কম লজ্জা!

পঞ্চক। লজ্জার ত কোনো কারণ নেই দাদা!

মহাপঞ্চক। কারণ নেই?

পঞ্চক। না। তোমার পাণ্ডিত্যে সকলে আশ্চর্য্য হ'য়ে

যায়। কিন্তু তা'র চেয়ে ঢের বেশি আশ্চর্য্য হয় তুমি আমারই দাদা বলে'!

মহাপঞ্চক। এই বানরটার উপর রাগ করাও শক্ত। দেখ পঞ্চক, তুমি ত আর বালক নও, তোমার এখন বিচার করে' দেখবার বয়স হয়েচে!

পঞ্চক। তাই ত বিপদে পড়েচি। আমি যা বিচার করি তোমাদের বিচার একেবারে তা'র উল্টো দিকে চলে, অথচ তা'র জন্যে যা দণ্ড সে আমাকে একলাই ভোগ করতে হয়।

মহাপঞ্চক। পিতার মৃত্যুর পর কি দরিদ্র হ'য়ে, সকলের কি অবজ্ঞা নিয়েই এই আয়তনে আমরা প্রবেশ করেছিলুম, আর আজ কেবল নিজের শক্তিতে সেই অবজ্ঞা কাটিয়ে কত উপরে উঠেচি, আমার এই দৃষ্টান্তও কি তোমাকে একটু সচেষ্ট করে না।

পঞ্চক। সচেষ্ট করবার ত কথা নয়। তুমি যে নিজগুণেই দৃষ্টান্ত হ'য়ে বসে' আছ, ওর মধ্যে আমার চেষ্টার ত কিছুমাত্র দরকার হয় না! তাই নিশ্চিন্ত আছি।

মহাপঞ্চক। ঐ শঙ্খ বাজ্‌ল। এখন আমার সপ্তকুমারিকা-গাথা পাঠের সময়। কিন্তু বলে' যাচ্চি সময় নষ্ট কোরো না!

(প্রস্থান)

পঞ্চক

গান

বেজে ওঠে পঞ্চমে স্বর,
কেঁপে ওঠে বন্ধ এ ঘর,
বাহির হ'তে দুয়ারে কর
কেউ ত হানে না!
আকাশে কার ব্যাকুলতা,
বাতাস বহে কার বারতা,
এ পথে সেই গোপন কথা
কেউ ত আনে না।
তুমি ডাক দিয়েচ কোন সকালে
কেউ তা জানে না!

(ছাত্রদলের প্রবেশ)

প্রথম। ওহে পঞ্চক।

পঞ্চক। না ভাই, আমাকে বিরক্ত কোরো না।

দ্বিতীয়। কেন? হ'ল কি তোমার?

পঞ্চক। ওঁ তট তট তোতয় তোতয়—

তৃতীয়। এখনো তট তট তোতয় তোতয় ঘুচ্‌লনা? ওযে আমাদের কোন্‌কালে শেষ হ'য়ে গেচে তা মনেও আন্‌তে পারিনে।

প্রথম। না ভাই, পঞ্চককে একটু পড়তে দাও; নইলে

ওর কি গতি হবে! এখনো ও বেচারা তট তট করে' মরচে—আমাদের যে ধ্বজাগ্রকেয়ূরী পর্য্যন্ত সারা হ'য়ে গেল!

দ্বিতীয়। আচ্ছা পঞ্চক, এখনো তুমি চক্রেশমন্ত্র শেখ নি?

পঞ্চক। না।

তৃতীয়। মরীচি?

পঞ্চক। না।

প্রথম। মহামরীচি?

পঞ্চক। না।

দ্বিতীয়। পর্ণশবরী?

পঞ্চক। না।

দ্বিতীয়। আচ্ছা বল দেখি হরেত পক্ষীর নখাগ্রে যে পরিমাণ ধূলিকণা লাগে সেই পরিমাণ যদি—

পঞ্চক। আরে ভাই, হরেত পক্ষীই কোনো জন্মে দেখিনি ত তা'র নখাগ্রের ধূলিকণা!

প্রথম। হরেত পক্ষী ত আমরাও কেউ দেখিনি—শুনেচি সে দধি-সমুদ্রের পারে মহাজম্বুদ্বীপে বাস করে—কিন্তু এ সমস্ত ত জানা চাই, নিতান্ত মূর্খ হ'য়ে জীবনটাকে মাটি করলে ত চল্‌বে না!

দ্বিতীয়। পঞ্চক, তোমার কাছে ত কেউ বেশি আশা করে না। অন্তত শৃঙ্গভেরিব্রত, কাকচঞ্চু-পরীক্ষা, ছাগলোম-শোধন, দ্বাবিংশ-পিশাচ-ভয়ভঞ্জন এগুলো ত

জানা চাইই—নইলে অচলায়তনের ছাত্র বলে' লোক-সমাজে পরিচয় দেবে কোন্ লজ্জায় ?

তৃতীয়। চল বিশ্বম্ভর, আমরা যাই, ও একটু পড়ুক !

(গমনোদ্যত)

পঞ্চক। ওহে বিশ্বম্ভর ! তট তট তোতয় তোতয়—

বিশ্বম্ভর। কেন ? আবার ডাক কেন ?

পঞ্চক। সঞ্জীব, জয়োত্তম ! তট তট তোতয় তোতয়—

সঞ্জীব। কি হয়েচে ! পড় না।

পঞ্চক। দোহাই তোমাদের, একেবারে চলে' যেয়ো না ! ঐ শব্দগুলো আওড়াতে আওড়াতে মাঝে মাঝে বুদ্ধিমান্ জীবের মুখ দেখ্‌লে তবু আশ্বাস হয় যে জগৎটা বিধাতাপুরুষের প্রলাপ নয় !

জয়োত্তম। না হে, মহাপঞ্চক বড় রাগ করেন। তিনি মনে করেন, তোমার যে কিছু হচ্চে না তা'র কারণ আমরা।

পঞ্চক। আমি যে কারো কোনো সাহায্য না নিয়ে কেবলমাত্র নিজগুণেই অকৃতার্থ হ'তে পারি দাদা আমার এটুকু ক্ষমতাও স্বীকার করেন না এতেই আমি বড় দুঃখিত হই ! আচ্ছা ভাই, তোমরা ঐখানে একটু তফাতে বসে' কথাবার্ত্তা কও। যদি দেখ একটু অন্যমনস্ক হয়েচি আমাকে সতর্ক করে' দিয়ো। স্ফট স্ফট স্ফোটয় স্ফোটয়—

জয়োত্তম। আচ্ছা বেশ, এইখানে আমরা বস্‌চি।

সঞ্জীব। বিশ্বম্ভর, তুমি যে বল্লে এবার আমাদের আয়তনে গুরু আস্‌বেন সেটা শুন্‌লে কার কাছ থেকে?

বিশ্বম্ভর। কি জানি, কারা সব বলাকওয়া করছিল। কেমন করে' চারিদিকেই রটে' গিয়েচে যে চাতুর্ম্মাস্যের সময় গুরু আস্‌বেন।

পঞ্চক। ওহে বিশ্বম্ভর, বল কি? আমাদের গুরু আস্‌বেন না কি?

সঞ্জীব। আবার পঞ্চক! তোমার কাজ তুমি কর না!

পঞ্চক। ঘুণ ঘুণ ঘুণাপয় ঘুণাপয়—

জয়োত্তম। কিন্তু অধ্যাপকদের কারো কাছে শুনেচ কি? মহাপঞ্চক কি বলেন?

বিশ্বম্ভর। তাঁকে জিজ্ঞাসা করাই বৃথা! মহাপঞ্চক কারো প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সময় নষ্ট করেন না। আজকাল তিনি আর্য্যঅষ্টোত্তরশত নিয়ে পড়েচেন—তাঁর কাছে ঘ্যাঁষে কে!

পঞ্চক। চল না ভাই, আচার্য্যদেবের কাছে যাই—তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেই—

জয়োত্তম। আবার, ফের!

পঞ্চক। ঘুণ ঘুণ ঘুণাপয় ঘুণাপয়—

জয়োত্তম। আমার ত উনিশ বছর বয়স হ'ল—এর মধ্যে একবারো আমাদের গুরু এ আয়তনে আসেননি।

আজ তিনি হঠাৎ আস্‌তে যাবেন এটা বিশ্বাস করতে পারিনে।

সঞ্জীব। তোমার তর্কটা কেমনতর হ'ল হে, জয়োত্তম? উনিশ বছর আসেননি বলে' বিশ বছরে আসাটা অসম্ভব হ'ল কোন্ যুক্তিতে?

বিশ্বম্ভর। তা হ'লে অঙ্কশাস্ত্রটাই অপ্রমাণ হ'যে যায়। তবে ত উনিশ পর্য্যন্ত বিশ নেই বলে' উনিশের পরেও বিশ থাক্‌তে পারে না।

সঞ্জীব। শুধু অঙ্ক কেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাও টেঁকে না। কারণ, যা এ মুহূর্ত্তে ঘটেনি, তা ও মুহূর্ত্তেই বা ঘটে কি করে'?

জয়োত্তম। আরে! ঐটেই ত আমার তর্ক! কে বল্লে ঘটে? যা পূর্ব্বে ঘটেনি তা কিছুতেই পরে ঘট্‌তে পারে না। আচ্ছা, এস, কিছু যে ঘটে সেইটে প্রমাণ করে' দাও!

পঞ্চক। (জয়োত্তমের কাঁধে চড়িয়া) প্রমাণ? এই দেখ প্রমাণ! ঘুণ ঘুণ ঘুণাপয় ঘুণাপয়—

জয়োত্তম। আঃ পঞ্চক! কর কি! নাব বলচি! আঃ নাব!

পঞ্চক। আমি যে তোমার কাঁধে চড়েচি সেটা প্রমাণ না করে' দিলে আমি কিছুতেই নাব্‌চিনে। ঘুণ ঘুণ ঘুণাপয় ঘুণাপয়—

(মহাপঞ্চকের প্রবেশ)

মহাপঞ্চক। পঞ্চক! তুমি বড় উৎপাত করচ!

পঞ্চক। দাদা, এরাই গোল করছিল। আমি আরো থামিয়ে দেবার জন্যেই এসেচি। তট তট তোতয় তোতয় স্ফট স্ফট—

মহাপঞ্চক। তোমার নিজের কাজ অবহেলা করবার একটা উপলক্ষ্য জুটলেই তোমাকে সম্বরণ করা অসম্ভব।

বিশ্বম্ভর। দেখুন, একটা জনশ্রুতি শুনতে পাচ্চি, বর্ষার আরম্ভে আমাদের গুরু নাকি এখানে আস্‌বেন!

মহাপঞ্চক। আস্‌বেন কিনা তা নিয়ে আন্দোলন না করে' যদিই আসেন তাঁর জন্যে প্রস্তুত হও।

পঞ্চক। তিনি যদি আসেন তিনিই প্রস্তুত হবেন। এদিক থেকে আবার আমরাও প্রস্তুত হ'তে গেলে হয় ত মিথ্যে একটা গোলমাল হবে।

মহাপঞ্চক। ভারি বুদ্ধিমানের মতই কথা বল্লে।

পঞ্চক। অন্নের গ্রাস যখন মুখের কাছে এগয় তখন মুখ স্থির হ'য়ে সেটা গ্রহণ করে—এ ত সোজা কথা! আমার ভয় হয় গুরু এসে হয়ত দেখবেন আমরা যেদিক দিয়ে প্রস্তুত হ'তে গিয়েচি সে দিক্‌টা উল্টো। সেইজন্যে আমি কিছু করিনে।

মহাপঞ্চক। পঞ্চক, আবার তর্ক?

পঞ্চক। তর্ক করতে পারিনে বলে' রাগ কর, আবার দেখি পারলেও রাগো!

মহাপঞ্চক। যাও তুমি।

পঞ্চক। যাচ্চি, কিন্তু বল না গুরু কি সত্যই আস্‌বেন।

মহাপঞ্চক। তাঁর সময় হ'লেই তিনি আস্‌বেন।

(প্রস্থান)

সঞ্জীব। মহাপঞ্চক কোনো কথার শেষ উত্তর দিয়েচেন এমন কখনই শুনিনি।

জয়োত্তম। কোনো কথার শেষ উত্তর নেই বলেই দেন না। মূর্খ যারা তা'রাই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, যারা অল্প জানে তা'রাই জবাব দেয়, আর যারা বেশি জানে তা'রা জানে যে জবাব দেওয়া যায় না।

পঞ্চক। সেই জন্যেই উপাধ্যায় মশায় যখন শাস্ত্র থেকে প্রশ্ন করেন তোমরা জবাব দাও কিন্তু আমি একেবারে মূক হ'য়ে থাকি!

জয়োত্তম। কিন্তু প্রশ্ন না করতেই যে কথাগুলো বল, তা'তেই—

পঞ্চক। হাঁ, তা'তেই আমার খ্যাতি রটে গেছে, নইলে কেউ আমাকে চিন্‌তে পারত না।

বিশ্বম্ভর। দেখ পঞ্চক, যদি গুরু আসেন তা হ'লে তোমার জন্যে আমাদের সকলকেই লজ্জা পেতে হবে।

সঞ্জীব। আটান্ন প্রকার আচমন-বিধির মধ্যে পঞ্চক বড় জোর পাঁচটা প্রকরণ এতদিনে শিখেচে।

পঞ্চক। সঞ্জীব, আমার মনে আঘাত দিয়ো না! অত্যুক্তি করচ!

সঞ্জীব। অত্যুক্তি!

পঞ্চক। অত্যুক্তি নয় ত কি! তুমি বল্চ পাঁচটা শিখেচি! আমি দুটোর বেশি একটাও শিখিনি! তৃতীয় প্রকরণে মধ্যমাঙ্গুলির কোন্ পর্ব্বটা কতবার কতখানি জলে ডুবোতে হবে সেটা ঠিক করতে গিয়ে অন্য আঙুলের অস্তিত্বই ভুলে যাই। কেবল একমাত্র বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটা আমার খুব অভ্যাস হ'য়ে গেচে। হাস্চ কেন? বিশ্বাস করচ না বুঝি?

জয়োত্তম। বিশ্বাস করা শক্ত।

পঞ্চক। সেদিন উপাধ্যায় মশায় যখন পরীক্ষা করতে এলেন তখন তাঁকে ঐ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত দেখিয়ে বিস্মিত করবার চেষ্টায় ছিলুম কিন্তু তিনি চোখ পাকিয়ে তর্জ্জনী তুল্লেন, আমার আর এগল না।

বিশ্বম্ভর। না, পঞ্চক, এবার গুরু আসার জন্যে তোমাকে প্রস্তুত হ'তে হবে।

পঞ্চক। পঞ্চক পৃথিবীতে যেমন অপ্রস্তুত হ'য়ে জন্মেচে তেমনি অপ্রস্তুত হ'য়েই মরবে। ওর ঐ একটি মহদ্‌গুণ আছে, ওর কখনো বদল হয় না!

সঞ্জীব। তোমার সেই গুণে উপাধ্যায় মশায়কে যে মুগ্ধ করতে পেরেচ তা ত বোধ হয় না।

পঞ্চক। আমি তাঁকে কত বোঝাবার চেষ্টা করি যে বিদ্যাসম্বন্ধে আমার একটুও নড়চড় নেই—ঐ যাকে বলে ধ্রুব নক্ষত্র—তা'তে সুবিধা এই যে এখানকার ছাত্ররা যে কতদূর এগল তা আমার সঙ্গে তুলনা করলেই বোঝা যাবে!

জয়োত্তম। তোমার আশ্চর্য্য এই সুযুক্তিতে উপাধ্যায় মশায়ের বোধ হয়—

পঞ্চক। না, কিছু না—তাঁর মনে কিছুমাত্র বিকার ঘটল না। আমার সম্বন্ধে পূর্ব্বে তাঁর যে ধারণা ছিল সেইটেই দেখলুম আরো পাকা হ'ল।

সঞ্জীব। আমরা যদি উপাধ্যায় মশায়কে তোমার মতন অমন যা-তা বল্‌তুম তাহ'লে রক্ষা থাক্‌ত না। কিন্তু পঞ্চকের বেলায়—

পঞ্চক। তা'র মানে আছে। কুতর্কটা আমার পক্ষে এমনি সুন্দর স্বাভাবিক যে সেটা আমার মুখে ভারি মিষ্ট শোনায়। সকলেই খুসি হ'য়ে বলে, ঠিক হয়েচে, পঞ্চকের মতই কথা হয়েচে। কিন্তু ঘোরতর বুদ্ধির পরিচয় না দিতে পারলে তোমাদের আদর নেই। এমনি তোমরা হতভাগ্য!

জয়োত্তম। যাও ভাই পঞ্চক, আর বোকো না। আমরা চল্লুম। তুমি একটু মন দিয়ে পড়।

(তিন জনের প্রস্থান)

পঞ্চক। হবে না, আমার কিছুই হবে না। এখানকার একটা মন্ত্রও আমার খাটল না।

গান

দূরে কোথায় দূরে দূরে
মন বেড়ায় গো ঘুরে ঘুরে!
যে বাঁশিতে বাতাস কাঁদে
সেই বাঁশিটির সুরে সুরে।
যে পথ সকল দেশ পারায়ে
উদাস হ'য়ে যায় হারায়ে,
সে পথ বেয়ে কাঙাল পরাণ
যেতে চায় কোন্ অচিন্ পুরে।

ওকি ও! কান্না শুনি যে! এ নিশ্চয়ই সুভদ্র। আমাদের এই আয়তনে ওর চোখের জল আর শুকল না। ওর কান্না আমি সইতে পারিনে।

(প্রস্থান)

(বালক সুভদ্রকে লইয়া পঞ্চকের পুনঃপ্রবেশ)

পঞ্চক। তোর কোনো ভয় নেই ভাই, কোনো ভয় নেই। তুই আমার কাছে বল্—কি হয়েচে বল্!

সুভদ্র। আমি পাপ করেচি।

পঞ্চক। পাপ করেচিস্? কি পাপ?

সুভদ্র। সে আমি বল্‌তে পারব না! ভয়ানক পাপ! আমার কি হবে!

পঞ্চক। তোর সব পাপ আমি কেড়ে নেব, তুই বল।

সুভদ্র। আমি আমাদের আয়তনের উত্তর দিকের—

পঞ্চক। উত্তর দিকের?

সুভদ্র। হাঁ, উত্তর দিকের জানলা খুলে—

পঞ্চক। জানলা খুলে কি করলি?

সুভদ্র। বাইরেটা দেখে ফেলেচি।

পঞ্চক। দেখে ফেলেচিস্? শুনে লোভ হচ্চে যে!

সুভদ্র। হাঁ পঞ্চকদাদা। কিন্তু বেশিক্ষণ না—একবার দেখেই তখনি বন্ধ করে ফেলেচি। কোন্ প্রায়শ্চিত্ত করলে আমার পাপ যাবে?

পঞ্চক। ভুলে গেচি ভাই। প্রায়শ্চিত্ত বিশ পঁচিশ হাজার রকম আছে;—আমি যদি এই আয়তনে না আস্‌তুম তাহ'লে তা'র বারো আনাই কেবল পুঁথিতে লেখা থাক্‌ত—আমি আসার পর প্রায় তা'র সবকটাই ব্যবহারে লাগাতে পেরেচি, কিন্তু মনে রাখ্‌তে পারিনি।

(বালকদলের প্রবেশ)

প্রথম। অ্যাঁ, সুভদ্র! তুমি বুঝি এখানে!

দ্বিতীয়। জান পঞ্চকদাদা, সুভদ্র কি ভয়ানক পাপ করেচে?

পঞ্চক। চুপ্ চুপ্! ভয় নেই সুভদ্র, কাঁদ্‌চিস্ কেন ভাই? প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় ত করবি। প্রায়শ্চিত্ত করতে ভারি মজা। এখানে রোজই একঘেয়ে রকমের দিন কাটে, প্রায়শ্চিত্ত না থাক্‌লে ত মানুষ টিক্‌তেই পারত না।

প্রথম। (চুপি চুপি) জান পঞ্চকদাদা, সুভদ্র উত্তর দিকের জান্‌লা—

পঞ্চক। আচ্ছা, আচ্ছা, সুভদ্রের মত তোদের অমন সাহস আছে?

দ্বিতীয়। আমাদের আয়তনের উত্তর দিকটা যে একজটা দেবীর!

তৃতীয়। সেদিক থেকে আমাদের আয়তনের যদি একটুও হাওয়া ঢোকে তাহ'লে যে সে—

পঞ্চক। তাহ'লে কি?

তৃতীয়। সে যে ভয়ানক!

পঞ্চক। কি ভয়ানক শুনিই না।

তৃতীয়। জানিনে, কিন্তু সে ভয়ানক!

সুভদ্র। পঞ্চকদাদা, আমি আর কখনো খুল্‌ব না পঞ্চকদাদা! আমার কি হবে?

পঞ্চক। শোন্ বলি সুভদ্র, কিসে কি হয় আমি ভাই কিছুই জানিনে—কিন্তু যাই হোক না, আমি তা'তে একটুও ভয় করি নে।

সুভদ্র। ভয় কর না ?

সকল ছেলে। ভয় কর না ?

পঞ্চক। না। আমি ত বলি, দেখিই না কি হয়।

সকলে। (কাছে ঘেঁসিয়া) আচ্ছা দাদা, তুমি বুঝি অনেক দেখেচ ?

পঞ্চক। দেখেচি বই কি। ওমাসে শনিবারে যেদিন মহাময়ূরী দেবীর পূজা পড়ল সেদিন আমি কাঁসার থালায় ইঁদুরের গর্ত্তের মাটি রেখে তা'র উপর পাঁচটা শেয়ালকাঁটার পাতা আর তিনটে মাসকলাই সাজিয়ে নিজে আঠারো বার ফুঁ দিয়েচি।

সকলে। আঁা! কি ভয়ানক! আঠারো বার!

সুভদ্র। পঞ্চকদাদা, তোমার কি হ'ল ?

পঞ্চক। তিনদিনের দিনে যে সাপটা এসে আমাকে নিশ্চয় কামড়াবে কথা ছিল সে আজ পর্য্যন্ত আমাকে খুঁজে বের করতে পারে নি।

প্রথম। কিন্তু ভয়ানক পাপ করেচ তুমি!

দ্বিতীয়। মহাময়ূরী দেবী ভয়ানক রাগ করেচেন!

পঞ্চক। তাঁর রাগটা কি রকম সেইটে দেখবার জন্যেই ত একাজ করেচি।

সুভদ্র। কিন্তু পঞ্চকদাদা যদি তোমাকে সাপে কামড়াত ?

পঞ্চক। তাহ'লে এ সম্বন্ধে মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত কোথাও কোনো সন্দেহ থাক্‌ত না।

প্রথম। কিন্তু পঞ্চকদাদা, আমাদের উত্তর দিকের জানলাটা—

পঞ্চক। সেটা আমাকেও একবার খুলে দেখতে হবে স্থির করেচি।

সুভদ্র। তুমিও খুলে দেখবে?

পঞ্চক। হাঁ ভাই সুভদ্র, তাহ'লে তুই তোর দলের একজন পাবি।

প্রথম। না পঞ্চকদাদা, পায়ে পড়ি পঞ্চকদাদা, তুমি—

পঞ্চক। কেন রে, তোদের তা'তে ভয় কি?

দ্বিতীয়। সে যে ভয়ানক!

পঞ্চক। ভয়ানক না হ'লে মজা কিসের?

তৃতীয়। সে যে ভয়ানক পাপ।

প্রথম। মহাপঞ্চকদাদা আমাদের বলে' দিয়েচেন, ওতে মাতৃহত্যার পাপ হয়। কেন না, উত্তর দিকটা যে একজটা দেবীর!

পঞ্চক। মাতৃহত্যা করলুম না অথচ মাতৃহত্যার পাপটা করলুম সেই মজাটা কি রকম, দেখতে আমার ভয়ানক কৌতূহল।

প্রথম। তোমার ভয় করবে না?

পঞ্চক। কিছু না। ভাই সুভদ্র তুই কি দেখলি বল্ দেখি।

দ্বিতীয়। না, না, বলিসনে!

তৃতীয়। না, সে আমরা শুনতে পারব না—কি ভয়ানক!

প্রথম। আচ্ছা, একটু, খুব একটুখানি বল্ ভাই।

সুভদ্র। আমি দেখলুম সেখানে পাহাড়, গোরু চরচে—

বালকগণ। (কানে আঙুল দিয়া) ও বাবা, না, না, আর শুনব না! আর বোলো না সুভদ্র! ঐ যে উপাধ্যায় মশায় আসচেন। চল্ চল—আর না!

পঞ্চক। কেন? এখন তোমাদের কি?

প্রথম। বেশ, তাও জান না বুঝি? আজ যে পূর্বফাল্গুনী নক্ষত্র—

পঞ্চক। তা'তে কি?

দ্বিতীয়। আজ কাকিনী সরোবরের নৈঋত কোণে ঢোঁড়া সাপের খোলস খুঁজতে হবে না?

পঞ্চক। কেন রে?

প্রথম। তুমি কিছু জান না পঞ্চক দাদা! সেই খোলস কালো রঙের ঘোড়ার ল্যাজের সাতগাছি চুল দিয়ে বেঁধে পুড়িয়ে ধোঁয়া করতে হবে যে।

দ্বিতীয়। আজ যে পিতৃপুরুষেরা সেই ধোঁয়া ঘ্রাণ করতে আসবেন।

পঞ্চম। তা'তে তাঁদের কষ্ট হবে না?

প্রথম। পুণ্য হবে যে, ভয়ানক পুণ্য!

(বালকগণের প্রস্থান)

(উপাধ্যায়ের প্রবেশ)

উপাধ্যায়। পঞ্চককে শিশুদের দলেই প্রায় দেখতে পাই।

পঞ্চক। এই আয়তনে ওদের সঙ্গেই আমার বুদ্ধির একটু মিল হয়। ওরা একটু বড় হ'লেই আর তখন—

উপাধ্যায়। কিন্তু তোমার সংসর্গে যে ওরা অসংযত হ'য়ে উঠ্‌চে। সেদিন পটুবর্ম্ম আমার কাছে এসে নালিশ করেচে শুক্রবারের প্রথম প্রহরেই উপতিষ্য তা'র গায়ের উপর হাই তুলে দিয়েচে।

পঞ্চক। তা দিয়েচে বটে, আমি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলুম।

উপাধ্যায়। সে আমি অনুমানেই বুঝেচি নইলে এত বড় আয়ুক্ষয়কর অনিয়মটা ঘট্‌বে কেন? শুনেচি তুমি না কি সকলের সাহস বাড়িয়ে দেবার জন্য পটুবর্ম্মকে ডেকে তোমার গায়ের উপর একশোবার হাই তুল্‌তে বলেছিলে?

পঞ্চক। আপনি ভুল শুনেচেন।

উপাধ্যায়। ভুল শুনেচি?

পঞ্চক। একলা পটুবর্ম্মকে নয় সেখানে যত ছেলে ছিল প্রত্যেককেই আমার গায়ের উপর অন্তত দশটা করে' হাই তুলে যাবার জন্যে ডেকেছিলুম—পক্ষপাত করিনি।

উপাধ্যায়। প্রত্যেককেই ডেকেছিলে?

পঞ্চক। প্রত্যেককেই। আপনি বরঞ্চ জিজ্ঞাসা করে' জানবেন। কেউ সাহস করে' এগল না। তা'রা

হিসেব করে' দেখ্‌লে পনেরোজন ছেলেতে মিলে দেড় শো হাই তুল্লে তা'তে আমার সমস্ত আয়ুক্ষয় হ'য়ে গিয়েও আরো অনেকটা বাকি থাকে, সেই উদ্বৃত্তটাকে নিয়ে যে কি হবে তাই স্থির করতে না পেরে তা'রা মহাপঞ্চকদাদাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে গেল, তা'তেই ত আমি ধরা পড়ে' গেচি।

উপাধ্যায়। দেখ, তুমি মহাপঞ্চকের ভাই বলে' এত দিন অনেক সহ্য করেচি কিন্তু আর চল্‌বে না। আমাদের গুরু আস্‌চেন শুনেচ?

পঞ্চক। গুরু আস্‌চেন? নিশ্চয় সংবাদ পেয়েচেন?

উপাধ্যায়। হাঁ। কিন্তু এতে তোমার উৎসাহের ত কোনো কারণ নেই।

পঞ্চক। আমারই ত গুরুর দরকার বেশি, আমার যে কিছুই শেখা হয়নি।

(সুভদ্রের প্রবেশ)

সুভদ্র। উপাধ্যায় মশায়!

পঞ্চক। আরে পালা পালা! উপাধ্যায় মশায়ের কাছ থেকে একটু পরমার্থতত্ত্ব শুন্‌চি এখন বিরক্ত করিস্‌নে, একেবারে দৌড়ে পালা!

উপাধ্যায়। কি সুভদ্র, তোমার বক্তব্য কি শীঘ্র বলে' যাও।

সুভদ্র। আমি ভয়ানক পাপ করেচি!

পঞ্চক। ভারি পণ্ডিত কিনা! পাপ করেচি! পালা বল্‌চি!

উপাধ্যায়। (উৎসাহিত হইয়া) ওকে তাড়া দিচ্চ কেন? সুভদ্র শুনে যাও।

পঞ্চক। আর রক্ষা নেই, পাপের একটুকু গন্ধ পেলে একেবারে মাছির মত ছোটে।

উপাধ্যায়। কি বল্‌ছিলে?

সুভদ্র। আমি পাপ করেচি।

উপাধ্যায়। পাপ করেচ? আচ্ছা বেশ, তা'হলে বোসো। শোনা যাক্‌।

সুভদ্র। আমি আয়তনের উত্তর দিকের

উপাধ্যায়। বল, বল, উত্তর দিকের দেয়ালে আঁক কেটেচ?

সুভদ্র। না, আমি উত্তর দিকের জানলায়—

উপাধ্যায়। বুঝেচি কনুই ঠেকিয়েচ? তা'হলে ত সেদিকে যতগুলি যজ্ঞের পাত্র আছে সমস্তই ফেলা যাবে। সাত মাসের বাছুরকে দিয়ে ঐ জানলা না চাটাতে পারলে শোধন হবে না।

পঞ্চক। এটা আপনি ভুল বল্‌চেন। ক্রিয়াসংগ্রহে আছে ভূমিকুষ্মাণ্ডের বোঁটা দিয়ে একবার—

উপাধ্যায়। তোমার ত স্পর্দ্ধা কম দেখিনে। কুলদত্তের ক্রিয়াসংগ্রহের অষ্টাদশ অধ্যায়টি কি কোনো দিন খুলে দেখা হয়েচে?

পঞ্চক। (জনান্তিকে) সুভদ্র, যাও তুমি!—কিন্তু কুল-দণ্ডকে আমি—

উপাধ্যায়। কুলদণ্ডকে মান না? আচ্ছা, ভরদ্বাজ মিশ্রের প্রয়োগপ্রজ্ঞপ্তি ত মানতেই হবে,—তাতে—

সুভদ্র। উপাধ্যায় মশায় আমি ভয়ানক পাপ করেচি!

পঞ্চক। আবার! সেই কথাই ত হচ্চে। তুই চুপ কর্।

উপাধ্যায়। সুভদ্র, উত্তরের দেয়ালে যে আঁক কেটেচ সে চতুষ্কোণ, না গোলাকার?

সুভদ্র। আঁক কাটিনি। আমি জানলা খুলে বাইরে চেয়েছিলুম।

উপাধ্যায়। (বসিয়া পড়িয়া) আঃ সর্ব্বনাশ! করেচিস্ কি? আজ তিন শো পঁয়তাল্লিশ বছর ঐ জান্‌লা কেউ খোলেনি জানিস?

সুভদ্র। আমার কি হবে?

পঞ্চক। (সুভদ্রকে আলিঙ্গন করিয়া) তোমার জয়জয়কার হবে সুভদ্র! তিন শো পঁয়তাল্লিশ বছরের আগল তুমি ঘুচিয়েচ! তোমার এই অসামান্য সাহস দেখে উপাধ্যায় মশায়ের মুখে আর কথা নেই!

(সুভদ্রকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান)

উপাধ্যায়। জানিনে কি সর্ব্বনাশ হবে! উত্তরের অধিষ্ঠাত্রী যে একজটাদেবী! বালকের দুই চক্ষু মুহূর্ত্তেই

পাথর হ'য়ে গেল না কেন তাই ভাব্‌চি! যাই আচার্য্য-দেবকে জানাইগে!

(প্রস্থান)

(আচার্য্য ও উপাচার্য্যের প্রবেশ)

আচার্য্য। এতকাল পরে আমাদের গুরু আস্‌চেন।

উপাচার্য্য। তিনি প্রসন্ন হয়েচেন।

আচার্য্য। প্রসন্ন হয়েচেন? তা হবে! হয়ত প্রসন্নই হয়েচেন। কিন্তু কেমন করে' জান্‌ব?

উপাচার্য্য। নইলে তিনি আসবেন কেন?

আচার্য্য। এক এক সময়ে মনে ভয় হয় যে হয়ত অপরাধের মাত্রা পূর্ণ হয়েচে বলেই তিনি আস্‌চেন।

উপাচার্য্য। না আচার্য্যদেব, এমন কথা বল্‌বেন না। আমরা কঠোর নিয়ম সমস্তই নিঃশেষে পালন করেচি—কোনো ত্রুটি ঘটেনি।

আচার্য্য। কঠোর নিয়ম? হাঁ সমস্তই পালিত হয়েচে।

উপাচার্য্য। বজ্রশুদ্ধিব্রত আমাদের আয়তনে এইবার নিয়ে সাতাত্তর বার পূর্ণ হয়েচে। আর কোনো আয়তনে একি সম্ভবপর হয়?

আচার্য্য। না আর কোথাও হ'তে পারে না।

উপাচার্য্য। কিন্তু তবু আপনার মনে এমন দ্বিধা হচ্চে কেন?

আচার্য্য। দ্বিধা? তা দ্বিধা হচ্চে সে কথা স্বীকার করি।

(কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া) দেখ সূতসোম, অনেক দিন থেকে মনের মধ্যে বেদনা জেগে উঠ্‌চে, কাউকে বল্‌তে পারচিনে। আমি এই আয়তনের আচার্য্য ; আমার মনকে যখন কোনো সংশয় বিদ্ধ করতে থাকে তখন একলা চুপ করে' বহন কর্ত্তে হয়। এতদিন তাই বহন করে' এসেচি। কিন্তু যে দিন পত্র পেয়েচি গুরু আস্‌চেন সেই দিন থেকে মনকে আর যেন চুপ করিয়ে রাখ্‌তে পারচিনে। সে কেবলি আমাদের প্রতিদিনের সকল কাজেই বলে' বলে' উঠ্‌চে—বৃথা, বৃথা, সমস্তই বৃথা !

উপাচার্য্য। আচার্য্যদেব বলেন কি ! বৃথা সমস্তই বৃথা ?

আচার্য্য। সূতসোম, আমরা এখানে কতদিন হ'ল এসেচি মনে পড়ে কি ? কত বছর হবে ?

উপাচার্য্য। সময় ঠিক করে' বলা বড় কঠিন। এখানে মনের পক্ষে প্রাচীন হ'য়ে উঠ্‌তে বয়সের দরকার হয় না। আমার ত মনে হয় আমি জন্মের বহু পূর্ব্ব হ'তেই এখানে স্থির হ'য়ে বসে' আছি।

আচার্য্য। দেখ সূতসোম, প্রথম যখন এখানে সাধনা আরম্ভ করেছিলুম তখন নবীন বয়স, তখন আশা ছিল সাধনার শেষে একটা কিছু পাওয়া যাবে। সেই জন্যে সাধনা যতই কঠিন হচ্ছিল উৎসাহ আরো বেড়ে উঠ্‌ছিল। তা'র পরে সেই সাধনার চক্রে ঘুরতে ঘুরতে

একেবারেই ভুলে বসেছিলুম যে সিদ্ধি বলে' কিছু একটা আছে। আজ গুরু আস্‌বেন শুনে হঠাৎ মনটা থম্‌কে দাঁড়াল—আজ নিজেকে জিজ্ঞাসা করলুম, ওরে পণ্ডিত, তোর সব শাস্ত্রই ত পড়া হ'ল, সব ব্রতই ত পালন করলি, এখন বল্ মূর্খ কি পেয়েচিস্? কিছু না, কিছু না, সূতসোম! আজ দেখ্‌চি—এই অতি দীর্ঘকালের সাধনা কেবল আপনাকেই আপনি প্রদক্ষিণ করেচে—কেবল প্রতিদিনের অনুষ্ঠান পুনরাবৃত্তি রাশীকৃত হ'য়ে জমে' উঠেচে।

উপাচার্য্য। বোলো না, বোলো না, এমন কথা বোলো না! আচার্য্যদেব, আজ কেন হঠাৎ তোমার মন এত উদ্‌ভ্রান্ত হ'ল?

আচার্য্য। সূতসোম, তোমার মনে কি তুমি শান্তি পেয়েচ?

উপাচার্য্য। আমার ত একমুহূর্ত্তের জন্যে অশান্তি নেই।

আচার্য্য। অশান্তি নেই?

উপাচার্য্য। কিছুমাত্র না। আমার অহোরাত্র একেবারে নিয়মে বাঁধা। সে হাজার বছরের বাঁধন। ক্রমেই সে পাথরের মত বজ্রের মত শক্ত হ'য়ে জমে' গেচে। এক মুহূর্ত্তের জন্যেও কিছুই ভাবতে হয় না। এর চেয়ে আর শান্তি কি হ'তে পারে?

আচার্য্য। না, না, তবে আমি ভুল করছিলুম সূতসোম, ভুল

করছিলুম। যা আছে, এই ঠিক এই-ই ঠিক। যে করেই হোক এর মধ্যে শান্তি পেতেই হবে।

উপাচার্য। সেই জন্যেই ত অচলায়তন ছেড়ে আমাদের কোথাও বেরনো নিষেধ। তাতে যে মনের বিক্ষেপ ঘটে—শান্তি চলে যায়।

আচার্য। ঠিক্, ঠিক্,—ঠিক্ বলেচ সূতসোম! অচেনার মধ্যে গিয়ে কোথায় তার অন্ত পাব? এখানে সমস্তই জানা, সমস্তই অভ্যস্ত—এখানকার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর এখানকারই সমস্ত শাস্ত্রের ভিতর থেকে পাওয়া যায়—তার জন্যে একটুও বাইরে যাবার দরকার হয় না। এই ত নিশ্চল শান্তি! গুরু, তুমি যখন আসবে, কিছু সরিয়ো না, কিছু আঘাত কোরো না—চারিদিকেই আমাদের শান্তি, সেই বুঝে পা ফেলো। দয়া কোরো, দয়া কোরো আমাদের! আমাদের পা অসাড় হ'য়ে গেচে, আমাদের আর চলবার শক্তি নেই। অনেক বৎসর অনেক যুগ যে এমনি করেই কেটে গেল—প্রাচীন, প্রাচীন, সমস্ত প্রাচীন হ'য়ে গেচে—আজ হঠাৎ বোলো না যে নূতনকে চাই—আমাদের আর সময় নেই!

উপাচার্য। আচার্যদেব, তোমাকে এমন বিচলিত হ'তে কখনো দেখিনি।

আচার্য। কি জানি, আমার কেমন মনে হচ্চে কেবল

একলা আমিই না, চারদিকে সমস্ত বিচলিত হ'য়ে উঠেচে। আমার মনে হচ্চে আমাদের এখানকার দেয়ালের প্রত্যেক পাথরটা পর্য্যন্ত বিচলিত। তুমি এটা অনুভব করতে পারচ না সূতসোম?

উপাচার্য্য। কিছুমাত্র না। এখানকার অটল স্তব্ধতার লেশ-মাত্র বিচ্যুতি দেখ্‌তে পাচ্চিনে। আমাদের ত বিচলিত হবার কথাও না। আমাদের সমস্ত শিক্ষা কোন্ কালে সমাধা হ'য়ে গেচে। আমাদের সমস্ত লাভ সমাপ্ত, সমস্ত সঞ্চয় পর্য্যাপ্ত।

আচার্য্য। আজ আমার একটু একটু মনে পড়চে বহু পূর্ব্বে সব প্রথমে সেই ভোরের বেলা অন্ধকার থাক্‌তে থাক্‌তে যাঁর কাছে শিক্ষা আরম্ভ করেছিলুম তিনি গুরুই—তিনি পুঁথি নন্, শাস্ত্র নন, বৃত্তি নন, তিনি গুরু। তিনি যা ধরিয়ে দিলেন তাই নিয়ে আরম্ভ করলুম—এতদিন মনে করে' নিশ্চিন্ত ছিলুম সেইটেই বুঝি আছে, ঠিক চল্‌চে—কিন্তু—

উপাচার্য্য। ঠিক আছে, ঠিকই চল্‌চে, আচার্য্যদেব, ভয় নেই! প্রভু, আমাদের এখানে সেই প্রথম উষার বিশুদ্ধ অন্ধকারকে হাজার বছরেও নষ্ট হ'তে দিইনি। তা'রই পবিত্র অস্পষ্ট ছায়ার মধ্যে আমরা আচার্য্য এবং ছাত্র, প্রবীণ এবং নবীন, সকলেই স্থির হ'য়ে বসে' আছি। তুমি কি বল্‌তে চাও এতদিন পরে

কেউ এসে সেই আমদের ছায়া নাড়িয়ে দিয়ে যাবে!
সর্ব্বনাশ! সেই ছায়া।

আচার্য্য। সর্ব্বনাশই ত!

উপাচার্য্য। তা হ'লে হবে কি! এতদিন যারা স্তব্ধ হ'য়ে আছে তাদের কি আবার উঠ্‌তে হবে?

আচার্য্য। আমি ত তাই সাম্‌নে দেখ্‌চি। সে কি আমার স্বপ্ন? অথচ আমার ত মনে হচ্চে এই সমস্তই স্বপ্ন, এই পাথরের প্রাচীর, এই বন্ধ দরজা, এই সব নানা রেখার গণ্ডী, এই স্তূপাকার পুঁথি, এই অহোরাত্র মন্ত্রপাঠের গুঞ্জনধ্বনি—সমস্তই স্বপ্ন!

উপাচার্য্য। ঐ যে পঞ্চক আসচে। পাথরের মধ্যে কি ঘাস বেরয়? এমন ছেলে আমাদের আয়তনে কি ক'রে সম্ভব হ'ল? শিশুকাল থেকেই ওর ভিতর এমন একটা প্রবল অনিয়ম আছে, তা'কে কিছুতেই দমন করা গেল না। ঐ বালককে আমার ভয় হয়। ও-ই আমাদের কুলক্ষণ। এই আয়তনের মধ্যে ও কেবল তোমাকেই মানে। তুমি ওকে একটু ভৎ'সনা ক'রে দিয়ো।

আচার্য্য। আচ্ছা তুমি যাও। আমি ওর সঙ্গে একটু নিভৃতে কথা ক'য়ে দেখি।

(উপাচার্য্যের প্রস্থান)

(পঞ্চকের প্রবেশ)

আচার্য্য। (পঞ্চকের গায়ে হাত দিয়া) বৎস, পঞ্চক!

পঞ্চক। করলেন কি? আমাকে ছুঁলেন?

আচার্য্য। কেন, বাধা কি আছে?

পঞ্চক। আমি যে আচার রক্ষা করতে পারিনি।

আচার্য্য। কেন পারনি বৎস?

পঞ্চক। প্রভু, কেন, তা আমি বল্‌তে পারিনে। আমার পারবার উপায় নেই।

আচার্য্য। সৌম্য, তুমি ত জান, এখানকার যে নিয়ম সেই নিয়মকে আশ্রয় করে' হাজার বছর হাজার হাজার লোক নিশ্চিন্ত আছে। আমরা যে-খুসি তাকে কি ভাঙ্‌তে পারি?

পঞ্চক। আচার্যদেব, যে নিয়ম সত্য তাকে ভাঙ্‌তে না দিলে তা'র যে পরীক্ষা হয় না।

আচার্য্য। নিয়মের জন্য ভয় নয়, কিন্তু যে লোক ভাঙ্‌তে যাবে তা'রই বা দুর্গতি ঘট্‌তে দেব কেন?

পঞ্চক। আমি কোনো তর্ক করব না। আপনি নিজমুখে যদি আদেশ করেন যে, আমাকে সমস্ত নিয়ম পালন করতেই হবে তাহ'লে পালন করব। আমি আচার অনুষ্ঠান কিছুই জানিনে, আমি আপনাকেই জানি।

আচার্য্য। আদেশ করব—তোমাকে? সে আর আমার দ্বারা হ'য়ে উঠ্‌বে না।

পঞ্চক। কেন আদেশ করবেন না প্রভু?

আচার্য্য। কেন? বল্‌ব বৎস? তোমাকে যখন দেখি আমি মুক্তিকে যেন চোখে দেখ্‌তে পাই। এত চাপেও যখন দেখলুম তোমার মধ্যে প্রাণ কিছুতেই মরতে চায় না তখনই আমি প্রথম বুঝ্‌তে পারলুম মানুষের মন মন্ত্রের চেয়ে সত্য, হাজার বছরের অতি প্রাচীন আচারের চেয়ে সত্য। যাও বৎস, তোমার পথে তুমি যাও। আমাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা কোরো না।

পঞ্চক। আচার্য্যদেব, আপনি জানেন না কিন্তু আপনিই আমাকে নিয়মের চাকার নীচে থেকে টেনে নিয়েচেন।

আচার্য্য। কেমন করে' বৎস?

পঞ্চক। তা জানিনে, কিন্তু আপনি আমাকে এমন একটা কিছু দিয়েচেন যা আচারের চেয়ে নিয়মের চেয়ে অনেক বেশি।

আচার্য্য। তুমি কি কর না কর আমি কোনো দিন জিজ্ঞাসা করিনে, কিন্তু আজ একটা কথা জিজ্ঞাসা করব। তুমি কি অচলায়তনের বাইরে গিয়ে শোণপাংশু জাতির সঙ্গে মেশ?

পঞ্চক। আপনি কি এর উত্তর শুন্‌তে চান?

আচার্য্য। না, না, থাক্, বোলো না। কিন্তু শোণপাংশুরা যে অত্যন্ত ম্লেচ্ছ। তাদের সহবাস কি—

পঞ্চক। তাদের সম্বন্ধে আপনার কি কোনো বিশেষ আদেশ আছে ?

আচার্য্য। না, না, আদেশ আমার কিছুই নেই। যদি ভুল করতে হয় তবে ভুল করগে—তুমি ভুল করগে—আমাদের কথা শুনো না। আমাদের গুরু আস্চেন পঞ্চক—তাঁর কাছে তোমার মত বালক হ'য়ে যদি বস্‌তে পারি—তিনি যদি আমার জরার বন্ধন খুলে দেন, আমাকে ছেড়ে দেন, তিনি যদি অভয় দিয়ে বলেন আজ থেকে ভুল করে' করে' সত্য জান্‌বার অধিকার তোমাকে দিলুম, আমার মনের উপর থেকে হাজার দুহাজার বছরের পুরাতন ভার যদি তিনি নামিয়ে দেন !

পঞ্চক। ঐ উপাচার্য্য আস্‌চেন—বোধ করি কাজের কথা আছে—বিদায় হই।

(প্রস্থান)

(উপাধ্যায় ও উপাচার্য্যের প্রবেশ)

উপাচার্য্য। (উপাধ্যায়ের প্রতি) আচার্য্যদেবকে ত বল্‌তেই হবে। উনি নিতান্ত উদ্বিগ্ন হবেন—কিন্তু দায়িত্ব যে ওঁরই।

আচার্য্য। উপাধ্যায়, কোনো সংবাদ আছে নাকি ?

উপাধ্যায়। অত্যন্ত মন্দ সংবাদ।

আচার্য্য। অতএব সেটা সত্বর বলা উচিত।

উপাচার্য্য। উপাধ্যায়, কথাটা বলে' ফেল। এদিকে প্রতি-
কারের সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে যাচ্চে। আমাদের গ্রহাচার্য্য
বল্‌চেন আজ তিন প্রহর সাড়ে তিন দণ্ডের মধ্যে
দ্ব্যাত্মকচরাংশলগ্নে যা কিছু করবার সময়—সেটা
অতিক্রম করলেই গো-পরিক্রমণ আরম্ভ হবে, তখন
প্রায়শ্চিত্তের কেবল এক পাদ হবে বিপ্র, অর্দ্ধ পাদ
বৈশ্য, বাকি সমস্তটাই শূদ্র।

উপাধ্যায়। আচার্য্যদেব, সুভদ্র আমাদের আয়তনের উত্তর
দিকের জান্‌লা খুলে বাইরে দৃষ্টিপাত করেচে।

আচার্য্য। উত্তরদিকটা ত একজটা দেবীর।

উপাধ্যায়। সেই ত ভাবনা। আমাদের আয়তনের মন্ত্রপূত
রুদ্ধ বাতাসকে সেখানকার হাওয়া কতটা দূর পর্য্যন্ত
আক্রমণ করেচে বলা ত যায় না।

উপাচার্য্য। এখন কথা হচ্চে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত
কি?

আচার্য্য। আমার ত স্মরণ হয় না। উপাধ্যায় বোধ
করি—

উপাধ্যায়। না, আমিও ত মনে আন্‌তে পারিনে। আজ
তিনশো বছর এ প্রায়শ্চিত্তটার প্রয়োজন হয়নি—
সবাই ভুলেই গেছে। ঐ যে মহাপঞ্চক আস্‌চে—
যদি কারো জানা থাকে ত সে ওর।

(মহাপঞ্চকের প্রবেশ)

উপাধ্যায়। মহাপঞ্চক, সব শুনেচ বোধ করি।

মহাপঞ্চক। সেই জন্যেই ত এলুম; আমরা এখন সকলেই অশুচি, বাহিরের হাওয়া আমাদের আয়তনে প্রবেশ করেচে।

উপাচার্য্য। এর প্রায়শ্চিত্ত কি, আমাদের কারো স্মরণ নেই —তুমিই বল্‌তে পার।

মহাপঞ্চক। ক্রিয়া-কল্পতরুতে এর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না—একমাত্র ভগবান্ জ্বলনানন্তকৃত আধিকর্ম্মিক বর্ষায়ণে লিখ্‌চে অপরাধীকে ছয় মাস মহাতামস সাধন করতে হবে।

উপাচার্য্য। মহাতামস ?

মহাপঞ্চক। হাঁ, আলোকের এক রশ্মিমাত্র সে দেখ্‌তে পাবে না। কেন না আলোকের দ্বারা যে অপরাধ অন্ধকারের দ্বারাই তা'র ক্ষালন।

উপাচার্য্য। তাহ'লে, মহাপঞ্চক, সমস্ত ভার তোমার উপর রইল।

উপাধ্যায়। চল আমিও তোমার সঙ্গে যাই। ততক্ষণ সুভদ্রকে হিঙ্গুমর্দ্দনকুণ্ডে স্নান করিয়ে আনিগে।

(সকলের গমনোদ্যম)

আচার্য্য। শোন, প্রয়োজন নেই।

উপাধ্যায়। কিসের প্রয়োজন নেই ?

আচার্য্য। প্রায়শ্চিত্তের।

মহাপঞ্চক। প্রয়োজন নেই বল্‌চেন! আধিকর্ম্মিক বর্ষায়ণ খুলে আমি এখনি দেখিয়ে দিচ্চি—

আচার্য্য। দরকার নেই—সুভদ্রকে কোনো প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না, আমি আশীর্ব্বাদ করে' তা'র—

মহাপঞ্চক। এও কি কখনো সম্ভব হয়? যা কোনো শাস্ত্রে নেই আপনি কি তাই—

আচার্য্য। না, হ'তে দেব না, যদি কোনো অপরাধ ঘটে সে আমার। তোমাদের ভয় নেই।

উপাধ্যায়। এ রকম দুর্ব্বলতা ত আপনার কোনো দিন দেখিনি। এই ত সেবার অষ্টাঙ্গশুদ্ধি উপবাসে তৃতীয় রাত্রে বালক কুশলশীল জল জল করে' পিপাসায় প্রাণত্যাগ করলে কিন্তু তবু তা'র মুখে যখন এক বিন্দু জল দেওয়া গেল না তখন ত আপনি নীরব হ'য়ে ছিলেন। তুচ্ছ মানুষের প্রাণ আজ আছে কাল নেই, কিন্তু সনাতন ধর্ম্মবিধি ত চিরকালের।

(সুভদ্রকে লইয়া পঞ্চকের প্রবেশ)

পঞ্চক। ভয় নেই সুভদ্র, তোর কোনো ভয় নেই—এই শিশুটিকে অভয় দাও প্রভু!

আচার্য্য। বৎস, তুমি কোনো পাপ করনি বৎস, যারা বিনা অপরাধে তোমাকে হাজার হাজার বৎসর ধরে' মুখ

বিকৃত করে' ভয় দেখাচ্চে পাপ তাদেরই। এস পঞ্চক।

(সুভদ্রকে কোলে লইয়া পঞ্চকের সঙ্গে প্রস্থান)

উপাধ্যায়। এ কি হ'ল উপাচার্য্য মশায় ?

মহাপঞ্চক। আমরা অশুচি হ'য়ে রইলুম, আমাদের যাগ যজ্ঞ ব্রত উপবাস সমস্তই পণ্ড হ'তে থাক্‌ল, এ ত সহ্য করা শক্ত।

উপাধ্যায়। এ সহ্য করা চলবেই না। আচার্য্য কি শেষে আমাদের ম্লেচ্ছের সঙ্গে সমান করে' দিতে চান ?

মহাপঞ্চক। উনি আজ সুভদ্রকে বাঁচাতে গিয়ে সনাতন ধর্ম্মকে বিনাশ করবেন! এ কি রকম বুদ্ধি-বিকার ওঁর ঘটল ? এ অবস্থায় ওঁকে আচার্য্য বলে' গণ্য করাই চল্‌বে না।

উপাচার্য্য। সে কি হয় ? যিনি একবার আচার্য্য হয়েচেন, তাঁকে কি আমাদের ইচ্ছামত—

মহাপঞ্চক। উপাচার্য্য মশায়, আপনাকেও আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে হবে।

উপাচার্য্য। নূতন কিছুতে যোগ দেবার বয়স আমার নয়।

উপাধ্যায়। আজ বিপদের সময় বয়স-বিচার!

উপাচার্য্য। ধর্ম্মকে বাঁচাবার জন্যে যা করবার কর। আমাকে দাঁড়াতে হবে আচার্য্যদেবের পাশে। আমরা

একসঙ্গে এসেছিলুম, যদি বিদায় হবার দিন এসে থাকে তবে একসঙ্গেই বাহির হ'য়ে যাব।

মহাপঞ্চক। কিন্তু একটা কথা চিন্তা করে' দেখ্‌বেন। আচার্য্যদেবের অভাবে আপনারই আচার্য্য হবার অধিকার।

উপাচার্য্য। মহাপঞ্চক, সেই প্রলোভনে আমি আচার্য্যদেবের বিরুদ্ধে দাঁড়াব? এ কথা বল্‌বার জন্যে তুমি যে মুখ খুলেচ সে কি এখানকার উত্তরদিকের জান্‌লা খোলার চেয়ে কম পাপ!

(প্রস্থান)

মহাপঞ্চক। চল উপাধ্যায়, আর বিলম্ব নয়। আচার্য্য অদীনপুণ্য যতক্ষণ এ আয়তনে থাক্‌বেন ততক্ষণ ক্রিয়া কর্ম্ম সমস্ত বন্ধ, ততক্ষণ আমাদের অশৌচ।

২

পাহাড় মাঠ

পঞ্চকের গান

এ পথ গেছে কোন্ খানে গো কোন খানে—
তা কে জানে তা কে জানে!
কোন্ পাহাড়ের পারে, কোন্ সাগরের ধারে,
কোন দুরাশার দিক্ পানে—
তা কে জানে তা কে জানে!
এ পথ দিয়ে কে আসে যায় কোন্ খানে
তা কে জানে তা কে জানে!
কেমন যে তা'র বাণী, কেমন হাসিখানি,
যায় সে কাহার সন্ধানে
তা কে জানে তা কে জানে!

(পশ্চাতে আসিয়া শোণপাংশুদলের নৃত্য)

পঞ্চক। ও কি রে! তোরা কখন্ পিছনে এসে নাচ্‌তে লেগেচিস্।

প্রথম শোণপাংশু। আমরা নাচ্‌বার সুযোগ পেলেই নাচি, পা দুটোকে স্থির রাখ্‌তে পারিনে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। আয় ভাই ওকে সুদ্ধ কাঁধে করে' নিয়ে একবার নাচি।

পঞ্চক। আরে না না, আমাকে ছুঁস্‌নেরে ছুঁসনে!

তৃতীয় শোণপাংশু। ঐ রে! ওকে অচলায়তনের ভূতে পেয়েচে! শোণপাংশুকে ও ছোঁবে না।

পঞ্চক। জানিস্, আমাদের গুরু আস্‌বেন?

প্রথম শোণপাংশু। সত্যি নাকি? তিনি মানুষটি কি রকম? তাঁর মধ্যে নতুন কিছু আছে?

পঞ্চক। নতুনও আছে, পুরোনোও আছে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। আচ্ছা এলে খবর দিয়ো—একবার দেখ্‌ব তাঁকে।

পঞ্চক। তোরা দেখ্‌বি কি রে! সর্বনাশ! তিনি ত শোণপাংশুদের গুরু নন। তাঁর কথা তোদের কানে পাছে এক অক্ষরও যায় সে জন্যে তোদের দিকের প্রাচীরের বাইরে সাত সার রাজার সৈন্য পাহারা দেবে। তোদেরও ত গুরু আছে—তাঁকে নিয়েই—

তৃতীয় শোণপাংশু। গুরু! আমাদের আবার গুরু কোথায়! আমরা ত হলুম দাদা-ঠাকুরের দল। এ পর্যন্ত আমরা ত কোনো গুরুকে মানি নি।

প্রথম শোণপাংশু। সেই জন্যেই ত ও জিনিষটা কি রকম দেখ্‌তে ইচ্ছে করে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। আমাদের মধ্যে একজন, তাঁর নাম

চণ্ডক—তা'র কি জানি ভারি লোভ হয়েচে; সে ভেবেচে তোমাদের কোনো গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়ে আশ্চর্য্য কি একটা ফল পাবে---তাই সে লুকিয়ে চলে' গেচে।

তৃতীয় শোণপাংশু। কিন্তু শোণপাংশু বলে' কেউ তা'কে মন্ত্র দিতে চায় না। সে-ও ছাড়বার ছেলে নয় সে লেগেই রয়েচে। তোমরা মন্ত্র দাও না বলেই মন্ত্র আদায় করবার জন্যে তা'র এত জেদ।

প্রথম শোণপাংশু। কিন্তু পঞ্চক দাদা, আমাদের ছুঁলে কি তোমার গুরু রাগ করবেন?

পঞ্চক। বল্‌তে পারি নে—কি জানি যদি অপরাধ নেন! ওরে, তোরা যে সবাই সব রকম কাজই করিস—সেইটে যে বড় দোষ! তোরা চাষ করিস ত?

প্রথম শোণপাংশু। চাষ করি বই কি, খুব করি! পৃথিবীতে জন্মেচি পৃথিবীকে সেটা খুব কষে বুঝিয়ে দিয়ে তবে ছাড়ি!

গান

আমরা চাষ করি আনন্দে।
মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হ'তে সন্ধ্যে।
রৌদ্র ওঠে, বৃষ্টি পড়ে, বাঁশের বনে পাতা নড়ে,
বাতাস ওঠে ভরে' ভরে' চষা মাটির গন্ধে।

সবুজ প্রাণের গানের লেখা রেখায় রেখায় দেয়রে দেখা,
মাতেরে কোন তরুণ কবি নৃত্যদোদুল ছন্দে।
ধানের শীষে পুলক ছোটে, সকল ধরা হেসে ওঠে,
অঘ্রাণেরি সোনার রোদে পূর্ণিমারি চন্দ্রে।

পঞ্চক। আচ্ছা, না হয় তোরা চাষই করিস্ সেও কোনো মতে সহ্য হয়—কিন্তু কে বল্‌ছিল তোরা কাঁকুড়ের চাষ করিস্?

প্রথম শোণপাংশু। করি বই কি।

পঞ্চক। কাঁকুড়! ছি ছি! খেঁসারিডালেরও চাষ করিস্ বুঝি?

তৃতীয় শোণপাংশু। কেন করব না! এখান থেকেই ত কাঁকুড় খেঁসারিডাল তোমাদের বাজারে যায়।

পঞ্চক। তা ত যায়, কিন্তু জানিস্ নে কাঁকুড় আর খেঁসারিডাল যারা চাষ করে তাদের আমরা ঘরে ঢুকতে দিইনে।

প্রথম শোণপাংশু। কেন?

পঞ্চক। কেন কি রে? ওটা যে নিষেধ!

প্রথম শোণপাংশু। কেন নিষেধ?

পঞ্চক। শোন একবার! নিষেধ, তা'র আবার কেন! সাধে তোদের মুখদর্শন পাপ! এই সহজ কথাটা বুঝিস্‌নে যে কাঁকুড় আর খেঁসারিডালের চাষটা ভয়ানক খারাপ!

দ্বিতীয় শোণপাংশু। কেন? ওটা কি তোমরা খাও না?

পঞ্চক। খাই বই কি, খুব আদর করে' খাই—কিন্তু ওটা যারা চাষ করে তাদের ছায়া মাড়াই নে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। কেন?

পঞ্চক। ফের কেন! তোরা যে এত বড় নিরেট মূর্খ তা জানতুম না। আমাদের পিতামহ বিষ্কম্ভী কাঁকুড়ের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন সে খবর রাখিস্‌নে বুঝি?

দ্বিতীয় শোণপাংশু। কাঁকুড়ের মধ্যে কেন?

পঞ্চক। আবার কেন? তোরা যে ঐ এক কেনর জ্বালায় আমাকে অতিষ্ঠ করে' তুল্লি।

তৃতীয় শোণপাংশু। আর, খেঁসারির ডাল?

পঞ্চক। একবার কোন্ যুগে একটা খেঁসারিডালের গুঁড়ো উপবাসের দিন কোন্ এক মস্ত বুড়োর ঠিক গোঁফের উপর উড়ে পড়েছিল; তা'তে তাঁর উপবাসের ফল থেকে ষষ্টিসহস্র ভাগের এক ভাগ কম পড়ে' গিয়েছিল; তাই তখনি সেইখানে দাঁড়িয়ে উঠে তিনি জগতের সমস্ত খেঁসারিডালের ক্ষেতের উপর অভিশাপ দিয়ে গেচেন। এত বড় তেজ! তোরা হ'লে কি করতিস্ বল্ দেখি!

প্রথম শোণপাংশু। আমাদের কথা বল কেন! উপবাসের দিনে খেঁসারিডাল যদি গোঁফের উপর পর্য্যন্ত এগিয়ে আসে তাহ'লে তা'কে আর একটু এগিয়ে নিই।

পঞ্চক। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সত্যি করে' বলিস্—তোরা কি লোহার কাজ করে' থাকিস ?

প্রথম শোণপাংশু। লোহার কাজ করি বই কি, খুব করি ?

পঞ্চক। রাম রাম! আমরা সনাতন কাল থেকে কেবল তামা পিতলের কাজ করে' আস্‌চি। লোহা গলাতে পারি কিন্তু সব দিন নয়। ষষ্ঠীর দিনে যদি মঙ্গলবার পড়ে তবেই স্নান করে' আমরা তাপর ছুঁতে পারি কিন্তু তাই বলে' লোহা পিটোনো সে ত হ'তেই পারে না!

তৃতীয় শোণপাংশু। আমরা লোহার কাজ করি, তাই লোহাও আমাদের কাজ করে।

গান

কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন
ও তা'র ঘুম ভাঙাইনু রে!
লক্ষযুগের অন্ধকারে ছিল সঙ্গোপন
ওগো তায় জাগাইনু রে।
পোষ মেনেচে হাতের তলে
যা বলাই সে তেমনি বলে,
দীর্ঘ দিনের মৌন তাহার আজ ভাগাইনু রে!
অচল ছিল, সচল হ'য়ে
ছুটেচে ঐ জগৎজয়ে,
নির্ভয়ে আজ দুই হাতে তা'র রাশ বাগাইনু রে।

পঞ্চক। সেদিন উপাধ্যায় মশায় একঘর ছাত্রের সাম্‌নে বল্লেন, শোণপাংশু জাতটা এমনি বিশ্রী যে তা'রা নিজের হাতে লোহার কাজ করে। আমি তাঁকে বল্লুম, ও বেচারারা পড়াশুনো কিছুই করেনি সে আমি জানি—এমন কি এই পৃথিবটা যে ত্রিশিরা রাক্ষসীর মাথামুড়োনো চুলের জটা দিয়ে তৈরি তাও ঐ মূর্খরা জানে না, আবার সে কথা বল্‌তে গেলে মারতে আসে,—তাই বলে' ভালোমন্দর জ্ঞান কি ওদের এতটুকুও নেই যে লোহার কাজ নিজের হাতে করবে! আজ ত স্পষ্টই দেখ্‌তে পাচ্চি যার যে বংশে জন্ম তা'র সেই রকম বুদ্ধিই হয়!

প্রথম শোণপাংশু। কেন, লোহা কি অপরাধটা করেচে?

পঞ্চক। আরে ওটা যে লোহা সে ত তোকে মান্‌তেই হবে।

প্রথম শোণপাংশু। তা ত হবে।

পঞ্চক। তবে আর কি—এই বুঝে নে না!

দ্বিতীয় শোণপাংশু। তবু একটা ত কারণ আছে!

পঞ্চক। কারণ নিশ্চয়ই আছে কিন্তু কেবল সেটা পুঁথির মধ্যে। সুতরাং মহাপঞ্চকদাদা ছাড়া আর অতি অল্প লোকেরই জানবার সম্ভাবনা আছে। সাধে মহাপঞ্চকদাদাকে ওখানকার ছাত্রেরা একেবারে পূজা করে। যা হোক ভাই তোরা যে আমাকে ক্রমেই আশ্চর্য্য করে' দিলিরে! তোরা ত খেঁসারিডাল চাষ

করচিস্ আবার লোহাও পিটচ্চিস্, এখনো তোরা কোনো দিক্ থেকে কোনো পাঁচ চোখ কিম্বা সাত মাথাওয়ালার কোপে পড়িস নি ?

প্রথম শোণপাংশু। যদি পড়ি তবে আমাদেরও লোহা আছে তা'রও কোপ বড় কম নয় !

পঞ্চক। আচ্ছা, তোদের মন্ত্র কেউ পড়ায় নি ?

দ্বিতীয় শোণপাংশু। মন্ত্র ! কিসের মন্ত্র ?

পঞ্চক। এই মনে কর্ যেমন বজ্রবিদারণ মন্ত্র—তট তট তোতয় তোতয়—

তৃতীয় শোণপাংশু। ওর মানে কি ?

পঞ্চক। আবার ! মানে ! তোর আস্পর্দ্ধা ত কম নয় ! সব কথাতেই মানে ! কেয়ূরী মন্ত্রটা জানিস্ ?

প্রথম শোণপাংশু। না।

পঞ্চক। মরীচি ?

প্রথম শোণপাংশু। না।

পঞ্চক। মহাশীতবতী ?

প্রথম শোণপাংশু। না।

পঞ্চক। উষ্ণীষবিজয় ?

প্রথম শোণপাংশু। না।

পঞ্চক। নাপিত ক্ষৌর করতে করতে যেদিন তোদের বাঁ গালে রক্ত পাড়িয়ে দেয় সেদিন করিস কি ?

তৃতীয় শোণপাংশু। সেদিন নাপিতের দুইগালে চড় কসিয়ে দিই।

পঞ্চক। না রে না, আমি বল্‌চি সেদিন নদীপার হবার দরকার হ'লে তোরা খেয়া নৌকয় উঠ্‌তে পারিস ?

তৃতীয় শোণপাংশু। খুব পারি।

পঞ্চক। ওরে, তোরা আমাকে মাটি করলি রে! আমি আর থাক্‌তে পারচিনে! তোদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে আর সাহস হচ্চে না। এমন জবাব যদি আর একটা শুন্‌তে পাই তাহ'লে তোদের বুকে করে' পাগলের মত নাচব, আমার জাত-মান কিছু থাক্‌বে না। ভাই, তোরা সব কাজই করতে পাস্? তোদের দাদাঠাকুর কিছুতেই তোদের মানা করে না?

শোণপাংশুগণের গান

সব কাজে হাত লাগাই মোরা সব কাজেই।
বাঁধাবাঁধন নেই গো নেই।
দেখি, খুঁজি, বুঝি,
কেবল ভাঙি, গড়ি, যুঝি,
মোরা সব দেশেতেই বেড়াই ঘুরে সব সাজেই।
পারি, নাই বা পারি,
না হয় জিতি কিম্বা হারি,
যদি অম্‌নিতে হাল ছাড়ি, মরি সেই লাজেই।

আপন হাতের জোরে
আমরা তুলি সৃজন করে',
আমরা প্রাণ দিয়ে ঘর বাঁধি, থাকি তা'র মাঝেই।

পঞ্চক। সর্ব্বনাশ করলে রে—আমার সর্ব্বনাশ করলে! আমার আর ভদ্রতা রাখ্‌লে না। এদের তালে তালে আমারো পা দুটো নেচে উঠ্‌চে। আমাকে সুদ্ধ এরা টানবে দেখচি। কোনো দিন আমিও লোহা পিটব রে লোহা পিটব—কিন্তু খেঁসারির ডাল—না, না, পালা ভাই, পালা তোরা। দেখচিস নে পড়ব বলে' পুঁথি সংগ্রহ করে' এনেচি।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। ও কি পুঁথি দাদা? ওতে কি আছে?

পঞ্চক। এ আমাদের দিক্‌চক্রচন্দ্রিকা—এতে বিস্তর কাজের কথা আছে রে!

প্রথম শোণপাংশু। কি রকম?

পঞ্চক। দশটা দিকের দশ রকম রং গন্ধ আর স্বাদ আছে কি না এতে তা'র সমস্ত খোলসা করে' লিখেচে। দক্ষিণদিকের রংটা হচ্চে রুইমাছের পেটের মত, ওর গন্ধটা দধির গন্ধ, স্বাদটা ঈষৎ মিষ্টি; পূর্বদিকের রংটা হচ্চে সবুজ, গন্ধটা মদমত্ত হাতীর মত, স্বাদটা বকুলের ফলের মত কষা,—নৈঋৎ কোণের—

দ্বিতীয় শোণপাংশু। আর বল্‌তে হবে না দাদা। কিন্তু দশ দিকে ত আমরা এসব রং গন্ধ দেখ্‌তে পাইনে।

পঞ্চক। দেখ্‌তে পেলে ত দেখাই যেত। যে ঘোর মূর্খ সেও দেখ্‌ত। এ সব কেবল পুঁথিতে পড়তে পাওয়া যায় জগতে কোথাও দেখবার জো নেই।

প্রথম শোণপাংশু। তা হ'লে দাদা তুমি পুঁথিই পড়, আমরা চল্লুম।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। এদের মত চোখ কান বুজে যদি আমাদের বসে' বসে' ভাবতে হ'ত তা হ'লে ত আমরা পাগল হ'য়ে যেতুম।

তৃতীয় শোণপাংশু। চল ভাই ঘুরে আসি, শিকারের সন্ধান পেয়েচি। নদীর ধারে গণ্ডারের পায়ের চিহ্ন দেখা গেচে।

(প্রস্থান)

পঞ্চক। এই শোণপাংশুগুলো বাইরে থাকে বটে কিন্তু দিনরাত্রি এমনি পাক খেয়ে বেড়ায় যে, বাহিরটাকে দেখ্‌তেই পায় না। এরা যেখানে থাকে সেখানে একেবারে অস্থিরতার চোটে চতুর্দ্দিক ঘুলিয়ে যায়। এরা একটু থেমেচে অমনি সমস্ত আকাশটা যেন গান গেয়ে উঠেচে। এই শোণপাংশুদের দেখ্‌চি ওরা চুপ কর্‌লেই আর কিছু শুনতে পায় না—ওরা নিজের গোলমালটা শোনে সেই জন্যে এত গোল কর্‌তে ভালবাসে। কিন্তু এই আলোতে ভরা নীল আকাশটা

আমার রক্তের ভিতরে গিয়ে কথা কচ্চে আমার সমস্ত শরীরটা গুন্ গুন্ করে' বেড়াচ্চে!

গান

ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে।
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে!
আলোতে কোন্ গগনে
মাধবী জাগ্‌ল বনে,
এল সেই ফুল জাগানোর খবর নিয়ে।
সারাদিন সেই কথা সে যায় বুনিয়ে।
কেমনে রহি ঘরে,
মন যে কেমন করে,
কেমনে কাটে যে দিন দিন গুনিয়ে।
কি মায়া দেয় বুলায়ে,
দিল সব কাজ ভুলায়ে,
বেলা যায় গানের সুরে জাল বুনিয়ে।
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে।

(শোণপাংশুদলের পুনঃপ্রবেশ)

প্রথম শোণপাংশু। ও ভাই পঞ্চক, দাদাঠাকুর আস্‌চে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। এখন রাখ তোমার পুঁথি রাখ— দাদাঠাকুর আস্‌চে।

(দাদাঠাকুরের প্রবেশ)

প্রথম শোণপাংশু। দাদাঠাকুর!

দাদাঠাকুর। কি রে!

দ্বিতীয় শোণপাংশু। দাদাঠাকুর!

দাদাঠাকুর। কি চাই রে!

তৃতীয় শোণপাংশু। কিছু চাইনে—একবার তোমাকে ডেকে নিচ্চি।

পঞ্চক। দাদাঠাকুর!

দাদাঠাকুর। কি ভাই, পঞ্চক যে!

পঞ্চক। ওরা সবাই তোমায় ডাক্‌চে, আমারো কেমন ডাক্‌তে ইচ্ছে হ'ল। যতই ভাবচি ওদের দলে মিশব না ততই আরো জড়িয়ে পড়চি।

প্রথম শোণপাংশু। আমাদের দাদাঠাকুরকে নিয়ে আবার দল কিসের! উনি আমাদের সব দলের শতদল পদ্ম।

গান

এই একলা মোদের হাজার মানুষ
দাদাঠাকুর!
এই আমাদের মজার মানুষ
দাদাঠাকুর!
এই ত নানা কাজে,
এই ত নানা সাজে,
এই আমাদের খেলার মানুষ
দাদাঠাকুর!

সব মিলনে মেলার মানুষ
দাদাঠাকুর !
এই ত হাসির দলে,
এই ত চোখের জলে,
এই ত সকল ক্ষণের মানুষ
দাদাঠাকুর !
এই ত ঘরে ঘরে,
এই ত বাহির করে,
এই আমাদের কোণের মানুষ
দাদাঠাকুর !
এই আমাদের মনের মানুষ
দাদাঠাকুর !

পঞ্চক। ও ভাই, তোদের দাদাঠাকুরকে নিয়ে তোরা ত দিনরাত মাতামাতি করচিস্ একবার আমাকে ছেড়ে দে, আমি একটু নিরালায় বসে' কথা কই। ভয় নেই, ওঁকে আমাদের অচলায়তনে নিয়ে গিয়ে কপাট দিয়ে রাখ্‌ব না।

প্রথম শোণপাংশু। নিয়ে যাও না! সে ত ভালোই হয়! তাহ'লে কপাটের বাপের সাধ্য নেই বন্ধ থাকে। উনি গেলে তোমাদের অচলায়তনের পাথরগুলো সুদ্ধ নাচ্‌তে আরম্ভ করবে, পুঁথিগুলোর মধ্যে বাঁশি বাজবে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। আচ্ছা আয় ভাই আমাদের কাজগুলো

সেরে আসি। দাদাঠাকুরকে নিয়ে পঞ্চকদাদা একটু বস্থক।

(প্রস্থান)

পঞ্চক। ঐ শোণপাংশুগুলো গেচে, এইবার তোমার পায়ের ধূলো নিই দাদাঠাকুর। ওরা দেখ্‌লে হেসে অস্থির হ'ত তাই ওদের সাম্‌নে করিনে।

দাদাঠাকুর। দরকার কি ভাই পায়ের ধূলোয় ?

পঞ্চক। নিতে ইচ্ছে করে। বুকের ভিতরটা যখন ভরে' ওঠে, তখন বুঝি তা'র ভারে মাথা নীচু হ'য়ে পড়ে—ভক্তি না করে' যে বাঁচিনে।

দাদাঠাকুর। ভাই, আমিও থাক্‌তে পারিনে। স্নেহ যখন আমার হৃদয়ে ধরে না, তখন সেই স্নেহই আমার ভক্তি।

পঞ্চক। অচলায়তনে প্রণাম করে' করে' ঘাড়ে ব্যথা হ'য়ে গেচে। তা'তে নিজেকেই কেবল ছোট করেচি, বড়কে পাইনি।

দাদাঠাকুর। এই আমার সবার-বাড়া বড়র মধ্যে এসে যখন বসি তখন যা করি তাই প্রণাম হ'য়ে ওঠে। এই যে খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মন তোমাকে আশীর্ব্বাদ করচে এও আমার প্রণাম।

পঞ্চক। দাদাঠাকুর, তোমার দুই চোখ দিয়ে এই যে তুমি

কেবল সেই বড়কে দেখ্‌চ, তোমাকে যখন দেখি তখন তোমার সেই দেখাটিকেও আমি যেন পাই। তখন পশু পাখী গাছ পালা আমার কাছে আর কিছুই ছোট থাকে না। এমন কি, তখন ঐ শোণপাংশুদের সঙ্গে মাতামাতি করতেও আমার আর বাধে না।

দাদাঠাকুর। আমিও যে ওদের সঙ্গে খেলে বেড়াই সে খেলা আমার কাছে মস্ত খেলা। আমার মনে হয় আমি ঝরণার ধারার সঙ্গে খেল্‌চি, সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে খেল্‌চি।

পঞ্চক। তোমার কাছে সবই বড় হ'য়ে গিয়েচে।

দাদাঠাকুর। না ভাই, বড় হয়নি, সত্য হ'য়ে উঠেচে—সত্য যে বড়ই, ছোটই ত মিথ্যা।

পঞ্চক। তোমার বাধা কেটে গেচে দাদাঠাকুর, সব বাধা কেটে গেচে। এমন হাসতে খেল্‌তে মিল্‌তে মিশ্‌তে কাজ করতে কাজ ছাড়্‌তে কে পারে! দাদাঠাকুর, শুনচি আমাদের গুরু আস্‌বেন।

দাদাঠাকুর। গুরু! কি বিপদ! ভারি উৎপাত করবে তা হ'লে ত।

পঞ্চক। একটু উৎপাত হ'লে যে বাঁচি। চুপচাপ থেকে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠ্‌চে।

দাদাঠাকুর। তোমার যে শিক্ষা কাঁচা রয়েচে, মনে ভয় হচ্চে না?

পঞ্চক। আমার ভয় সব চেয়ে কম—আমার একটি ভুলও হবে না।

দাদাঠাকুর। হবে না?

পঞ্চক। একেবারে কিছুই জানিনে, ভুল করবার জায়গাই নেই। নির্ভয়ে চুপ করে' থাক্‌ব।

দাদাঠাকুর। আচ্ছা বেশ, তোমার গুরু এলে তাকে দেখে নেওয়া যাবে। এখন তুমি আছ কেমন বল ত?

পঞ্চক। ভয়ানক টানাটানির মধ্যে আছি ঠাকুর! মনে মনে প্রার্থনা করচি গুরু এসে যেদিকে হোক একদিকে আমাকে ঠিক করে' রাখুন—হয় এখানকার খোলা হাওয়ার মধ্যে অভয় দিয়ে ছাড়া দিন, নয়ত খুব কষে' পুঁথি চাপা দিয়ে রাখুন; মাথা থেকে পা পর্যান্ত আগাগোড়া একেবারে সমান চ্যাপ্টা হ'য়ে যাই!

দাদাঠাকুর। তা, তোমার গুরু তোমার উপর যত পুঁথির চাপই চাপান না কেন তা'র নীচের থেকে তোমাকে আস্ত টেনে বের করে' আনতে পারব।

পঞ্চক। তা তুমি পারবে সে আমি জানি। কিন্তু দেখ ঠাকুর একটা কথা তোমাকে বলি—অচলায়তনের মধ্যে ঐ যে আমরা দরজা বন্ধ করে' আছি, দিব্যি আছি। ওখানে আমাদের সমস্ত বোঝাপড়া একেবারে শেষ হ'য়ে গেচে। ওখানকার মানুষ সেই জন্যে

বড় নিশ্চিন্ত। কিছুতে কারো একটু সন্দেহ হবার জো নেই। যদি দৈবাৎ কারো মনে এমন প্রশ্ন ওঠে যে, আচ্ছা ঐ যে চন্দ্রগ্রহণের দিনে শোবার ঘরের দেয়ালে তিনবার শাদা ছাগলের দাড়ি বুলিয়ে দিয়ে আওড়াতে হয় "হুন হুন তিষ্ঠ তিষ্ঠ বন্ধ বন্ধ অমৃতে হুঁফট্ স্বাহা" এর কারণটা কি—তাহ'লে কেবলমাত্র চারটে সুপুরি আর একমাষা সোনা হাতে করে' যাও তখনি মহাপঞ্চকদাদার কাছে, এমনি উত্তরটি পাবে যে আর কথা সরবে না। হয় সেটা মান, নয় কানমলা খেয়ে বেরিয়ে যাও, মাঝে অন্য রাস্তা নেই। তাই সমস্তই চমৎকার সহজ হ'য়ে গেচে। কিন্তু ঠাকুর, সেখান থেকে বের করে' তুমি আমাকে এই যে জায়গাটাতে এনেচ এখানে কোনো মহাপঞ্চকদাদার টিকি দেখবার জো নেই—বাঁধা জবাব পাই কার কাছে! সব কথারই বারো আনা বাকি থেকে যায়। তুমি এমন করে' মনটাকে উতলা করে' দিলে—তা'র পর?

দাদাঠাকুর। তা'র পরে?

গান

যা হবার তা হবে!
যে আমাকে কাঁদায় সে কি অমনি ছেড়ে র'বে!
পথ হ'তে যে ভুলিয়ে আনে, পথ যে কোথায় সেই তা জানে,
ঘর যে ছাড়ায় হাত সে বাড়ায় সেই ত ঘরে ল'বে।

পঞ্চক। এত বড় ভরসা তুমি কেমন করে' দিচ্চ ঠাকুর? তুমি কোনো ভয় কোনো ভাবনাই রাখ্‌তে দেবে না? অথচ জন্মাবধি আমাদের ভয়ের অন্ত নেই। মৃত্যু-ভয়ের জন্যে অমিতায়ুর্ধারিণী মন্ত্র পড়্‌চি, শত্রু ভয়ের জন্যে মহাসাহস্র-প্রমর্দ্দিনী, ঘরের ভয়ের জন্যে গৃহ-মাতৃকা, বাইরের ভয়ের জন্যে অভয়ঙ্করা, সাপের ভয়ের জন্যে মহাময়ূরী, বজ্রভয়ের জন্যে বজ্রগান্ধারি, ভূতের ভয়ের জন্যে চণ্ডভট্টারিকা, চোরের ভয়ের জন্যে হরাহরহৃদয়া। এমন আর কত নাম করব।

দাদাঠাকুর। আমার বন্ধু এমন মন্ত্র আমাকে পড়িয়েচেন যে তাতে চিরদিনের জন্য ভয়ের বিষদাঁত ভেঙে যায়।

পঞ্চক। তোমাকে দেখে তা বোঝা যায়। কিন্তু সেই বন্ধুকে পেলে কোথা ঠাকুর?

দাদাঠাকুর। পাবই বলে' সাহস করে' বুক বাড়িয়ে দিলুম, তাই পেলুম। কোথাও যেতে হয়নি।

পঞ্চক। সে কি রকম?

দাদাঠাকুর। যে ছেলের ভরসা নেই সে অন্ধকারে বিছানায় মাকে না দেখ্‌তে পেলেই কাঁদে, আর যার ভরসা আছে সে হাত বাড়ালেই মাকে তখনি বুক ভরে' পায়। তখন ভয়ের অন্ধকারটাই আরো নিবিড় মিষ্টি হ'য়ে ওঠে। মা তখন যদি জিজ্ঞাসা করে,

আলো চাই, ছেলে বলে তুমি থাকলে আমার আলোও যেমন অন্ধকারও তেমন।

পঞ্চক। দাদাঠাকুর, আমরা অচলায়তন ছেড়ে অনেক সাহস করে' তোমার কাছ অবধি এসেচি কিন্তু তোমার ঐ বন্ধু পর্যন্ত যেতে সাহস করতে পারচিনে।

দাদাঠাকুর। কেন, তোমার ভয় কিসের?

পঞ্চক। খাঁচায় যে পাখীটার জন্ম, সে আকাশকেই সবচেয়ে ডরায়। সে লোহার শলাগুলোর মধ্যে দুঃখ পায় তবু দরজাটা খুলে দিলে তা'র বুক দুরদুর করে, ভাবে, বন্ধ না থাকলে বাঁচব কি করে'? আপনাকে যে নির্ভয়ে ছেড়ে দিতে শিখিনি। এইটেই আমাদের চিরকালের অভ্যাস।

দাদাঠাকুর। তোমরা অনেকগুলো তালা লাগিয়ে সিন্ধুক বন্ধ করে' রাখাকেই মস্ত লাভ মনে কর—কিন্তু সিন্ধুকে যে আছে কি তা'র খোঁজ রাখ না!

পঞ্চক। আমার দাদা বলে, জগতে যা কিছু আছে সমস্তকে দূর করে' ফেলতে পারলে তবেই আসল জিনিষটিকে পাওয়া যায়। সেইজন্যেই দিনরাত্রি আমরা কেবল দূরই করচি আমাদের কতটা গেল সেই হিসাবটাই আমাদের হিসাব সে হিসাবের অন্তও পাওয়া যাচ্ছে না।

দাদাঠাকুর। তোমার দাদা ত ঐ বলে, কিন্তু আমার দাদা

বলে, যখন সমস্ত পাই তখনি আসল জিনিষকে পাই। সেইজন্যে ঘরে আমি দরজা দিতে পারিনে—দিনরাত্রি সব খুলে রেখে দিই। আচ্ছা পঞ্চক, তুমি যে তোমাদের আয়তন থেকে বেরিয়ে আস কেউ তা জানে না?

পঞ্চক। আমি জানি যে আমাদের আচার্য্য জানেন। কোনো দিন তাঁর সঙ্গে এ নিয়ে কোনো কথা হয়নি—তিনিও জিজ্ঞাসা করেন না আমিও বলিনে। কিন্তু আমি যখন বাইরে থেকে ফিরে যাই তিনি আমাকে দেখ্‌লেই বুঝতে পারেন। আমাকে তখন কাছে নিয়ে বসেন, তাঁর চোখের যেন একটা কি ক্ষুধা তিনি আমাকে দেখে মেটান। যেন বাইরের আকাশটাকে তিনি আমার মুখের মধ্যে দেখে নেন। ঠাকুর, যেদিন তোমার সঙ্গে আচার্য্যদেবকে মিলিয়ে দিতে পারব সেদিন আমার অচলায়তনের সব দুঃখ ঘুচবে।

দাদাঠাকুর। সেদিন আমারও শুভ দিন হবে।

পঞ্চক। ঠাকুর, আমাকে কিন্তু তুমি বড় অস্থির করে' তুলেচ। এক এক সময় ভয় হয় বুঝি কোনো দিন আর মন শান্ত হবে না।

দাদাঠাকুর। আমিই কি স্থির আছি ভাই? আমার মধ্যে ঢেউ উঠেচে বলেই তোমারও মধ্যে ঢেউ তুলচি।

পঞ্চক। কিন্তু তবে যে তোমার ঐ শোণপাংশুরা বলে

তোমার কাছে তা'রা খুব শান্তি পায়, কই শান্তি কোথায়! আমি ত দেখিনে।

দাদাঠাকুর। ওদের যে শান্তি চাই। নইলে কেবলই কাজের ঘষণে ওদের কাজের মধ্যেই দাবানল লেগে যেত, ওদের পাশে কেউ দাঁড়াতে পারত না।

পঞ্চক। তোমাকে দেখে ওরা শান্তি পায়?

দাদাঠাকুর। এই পাগল যে পাগল হয়েচে শান্তিও পেয়েচে। তাই সে কাউকে ক্ষ্যাপায় কাউকে বাঁধে। পূর্ণিমার চাঁদ সাগরকে উতলা করে যে মন্ত্রে, সেই মন্ত্রেই পৃথিবীকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে।

পঞ্চক। ঢেউ তোলো ঠাকুর ঢেউ তোলো, কূল ছাপিয়ে যেতে চাই। আমি তোমায় সত্যি বলচি আমার মন ক্ষেপেচে, কেবল জোর পাচ্চিনে—তাই দাদাঠাকুর মন কেবল তোমার কাছে আসতে চায়—তুমি জোর দাও—তুমি জোর দাও—তুমি আর দাঁড়াতে দিয়ো না!

গান

আমি কারে ডাকি গো
আমার বাঁধন দাও গো টুটে!
আমি হাত বাড়িয়ে আছি
আমায় লও কেড়ে লও লুটে!

তুমি	ডাক এমনি ডাকে
যেন	লজ্জা ভয় না থাকে,
যেন	সব ফেলে যাই, সব ঠেলে যাই,
	যাই ধেয়ে যাই ছুটে।
আমি	স্বপন দিয়ে বাঁধা,
কেবল	ঘুমের ঘোরের বাধা,
সে যে	জড়িয়ে আছে প্রাণের কাছে
	মুদিয়ে আঁখিপুটে ;
ওগো	দিনের পরে দিন
আমার	কোথায় হ'ল লীন,
কেবল	ভাষাহারা অশ্রুধারায়
	পরাণ কেঁদে উঠে !

আচ্ছা দাদাঠাকুর, তোমাকে আর কাঁদতে হয় না ? তুমি যাঁর কথা বল তিনি তোমার চোখের জল মুছিয়েচেন ?

দাদাঠাকুর। তিনি চোখের জল মোছান কিন্তু চোখের জল ঘোচান না।

পঞ্চক। কিন্তু দাদা, আমি তোমার ঐ শোণপাংশুদের দেখি আর মনে ভাবি ওরা চোখের জল ফেলতে শেখেনি। ওদের কি তুমি একেবারেই কাঁদাতে চাও না ?

দাদাঠাকুর। ওরা বর্ষণ চায় না, তা'তে ওদের কাজ কামাই যায়, সে ওরা কিছুতেই সহ্য করতে পারে না, ঐ রকমই ওদের স্বভাব !

পঞ্চক। ঠাকুর, আমি ত সেই বর্ষণের জন্যে তাকিয়ে আছি। যতদূর শুকোবার তা শুকিয়েচে, কোথাও একটু সবুজ আর কিছু বাকি নেই, এইবার ত সময় হয়েচে—মনে হচ্চে যেন দূর থেকে গুরু গুরু ডাক শুনতে পাচ্চি। বুঝি এবার ঘন নীল মেঘে তপ্ত আকাশ জুড়িয়ে যাবে ভরে' যাবে।

দাদাঠাকুর

গান

বুঝি এল, বুঝি এল, ওরে প্রাণ!
এবার ধর দেখি তোর গান!
ঘাসে ঘাসে খবর ছোটে
ধরা বুঝি শিউরে ওঠে,
দিগন্তে ঐ স্তব্ধ আকাশ পেতে আছে কান

পঞ্চক। ঠাকুর, আমার বুকের মধ্যে কি আনন্দ যে লাগ্‌চে সে আমি বলে' উঠতে পারিনে। এই মাটিকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে। ডাক ডাক, তোমার একটা ডাক দিয়ে এই আকাশ ছেয়ে ফেল।

গান

আজ যেমন করে' গাইচে আকাশ
তেমনি করে' গাও গো!
যেমন করে' চাইচে আকাশ
তেমনি করে' চাও গো।

আজ   হাওয়া যেমন পাতায় পাতায়
মর্ম্মরিয়া বনকে কাঁদায়,
তেমনি আমার বুকের মাঝে
কাঁদিয়া কাঁদাও গো!

শুনচ দাদা, ঐ কাঁসর বাজচে।

দাদাঠাকুর। হাঁ বাজচে

পঞ্চক। আমার আর থাকবার জো নেই।

দাদাঠাকুর। কেন?

পঞ্চক। আজ আমাদের দীপকেতন পূজা।

দাদাঠাকুর। কি করতে হবে?

পঞ্চক। আজ ডুমুরতলা থেকে মাটি এনে সেইটে পঞ্চগব্য দিয়ে মেখে বিরোচন মন্ত্র পড়তে হবে। তা'র পরে সেই মাটিতে ছোট ছোট মন্দির গড়ে' তা'র উপরে ধ্বজা বসিয়ে দিতে হবে। যেন হাজারটা গড়ে' তবে সূর্য্যাস্তের পরে জলগ্রহণ।

দাদাঠাকুর। ফল কি হবে?

পঞ্চক। প্রেতলোকে পিতামহদের ঘর তৈরি হ'য়ে যাবে।

দাদাঠাকুর। যারা ইহলোকে আছে তাদের জন্যে

পঞ্চক। তাদের জন্যে ঘর এত সহজে তৈরি হয় না। চল্লুম ঠাকুর, আবার কবে দেখা হবে জানিনে।

তোমার এই হাতের স্পর্শ নিয়ে চল্লুম—এই আমার সঙ্গে সঙ্গে যাবে—এই আমার নাগপাশ-বাঁধন আল্‌গা করে' দেবে! ঐ আস্‌চে শোণপাংশুর দল—আমরা এখানে বসে' আছি দেখে ওদের ভালো লাগ্‌চে না, ওরা ছট্‌ফট্ করচে। তোমাকে নিয়ে ওরা লুটোপুটি করতে চায়—করুক, ওরাই ধন্য—ওরা দিন রাত তোমাকে কাছে পায়।

দাদাঠাকুর। লুটোপুটি করলেই কি কাছে পাওয়া যায়? কাছে আস্‌বার রাস্তাটা কাছের লোকের চোখেই পড়ে না।

(শোণপাংশুদলের প্রবেশ)

প্রথম শোণপাংশু। ও কি ভাই পঞ্চক, যাও কোথায়?

পঞ্চক। আমার সময় হ'য়ে গেচে, আমাকে যেতেই হবে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। বাঃ সে কি হয়! আজ আমাদের বন-ভোজন, আজ তোমাকে ছাড়্‌চিনে।

পঞ্চক। না, ভাই, সে হবে না—ঐ কাঁসর বাজ্‌চে।

তৃতীয় শোণপাংশু। কিসের কাঁসর বাজ্‌চে?

পঞ্চক। তোরা বুঝবিনে। আজ দীপকেতন পূজা—আজ ছেলেমানুষি না। আমি চল্লুম।

(কিছু দূরে গিয়া হঠাৎ ছুটিয়া ফিরিয়া আসিয়া)

গান

হারে রে রে রে রে—
আমায় ছেড়ে দেরে দেরে !
যেমন ছাড়া বনের পাখী
মনের আনন্দে রে।
ঘন শ্রাবণ-ধারা
যেমন বাঁধন-হারা
বাদল বাতাস যেমন ডাকাত
আকাশ লুটে ফেরে।
হারে রে রে রে রে
আমায় রাখবে ধরে' কেরে !
দাবানলের নাচন যেমন
সকল কানন ঘেরে
বজ্র যেমন বেগে
গর্জ্জে ঝড়ের মেঘে
অট্টহাস্যে সকল বিঘ্ন-বাধার বক্ষ চেরে।

প্রথম শোণপাংশু। বেশ বেশ পঞ্চকদাদা, তা হ'লে চল আমাদের বনভোজনে।

পঞ্চক। বেশ, চল। (একটু থামিয়া দ্বিধা করিয়া) কিন্তু ভাই ঐ বন পর্য্যন্তই যাব ভোজন পর্য্যন্ত নয়।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। সে কি হয় ! সকলে মিলে ভোজন না করলে আনন্দ কিসের !

পঞ্চক। না রে, তোদের সঙ্গে ঐ জায়গাটাতে আনন্দ চলবে না।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। কেন চলবে না ? চালালেই চলবে।

পঞ্চক। চালালেই চলে এমন কোনো জিনিষ আমাদের ত্রিসীমানায় আসতে পারে না তা জানিস্। মারলে চলে না, ঠেল্‌লে চলে না, দশটা হাতী জুড়ে দিলে চলে না, আর তুই বলিস্ কিনা চালালেই চলবে।

তৃতীয় শোণপাংশু। আচ্ছা ভাই, কাজ কি! তুমি বনেই চল, আমাদের সঙ্গে খেতে বসতে হবে না।

পঞ্চক। খুব হবেরে খুব হবে। আজ খেতে বসবই, খাবই, —আজ সকলের সঙ্গে বসেই খাব—আনন্দে আজ ক্রিয়াকল্পতরুর ডালে ডালে আগুন লাগিয়ে দেব —পুড়িয়ে সব ছাই করে' ফেলব! দাদাঠাকুর, তুমি ওদের সঙ্গে খাবে না ?

দাদাঠাকুর। আমি রোজই খাই।

পঞ্চক। তবে তুমি আমাকে খেতে বলচ না কেন ?

দাদাঠাকুর। আমি কাউকে বলিনে ভাই, নিজে বসে' যাই।

পঞ্চক। না দাদা, আমার সঙ্গে অমন করলে চলবে না। আমাকে তুমি হুকুম কর তাহ'লে আমি বেঁচে যাই। আমি নিজের সঙ্গে কেবলি তর্ক করে' মরতে পারিনে।

দাদাঠাকুর। অত সহজে তোমাকে বেঁচে যেতে দেব না

পঞ্চক। যে দিন তোমার আপনার মধ্যে হুকুম উঠ্‌বে সেই দিন আমি হুকুম করব।

(একদল শোণপাংশুর প্রবেশ)

দাদাঠাকুর। কি রে, এত ব্যস্ত হ'য়ে ছুটে এলি কেন?

প্রথম শোণপাংশু। চণ্ডককে মেরে ফেলেচে।

দাদাঠাকুর। কে মেরেচে?

দ্বিতীয় শোণপাংশু। স্থবিরপত্তনের রাজা।

পঞ্চক। আমাদের রাজা? কেন, মারতে গেল কেন?

দ্বিতীয় শোণপাংশু। স্থবিরক হ'য়ে ওঠবার জন্যে চণ্ডক বনের মধ্যে এক পোড়ো মন্দিরে তপস্যা করছিল। ওদের রাজা মন্থর-গুপ্ত সেই খবর পেয়ে তাকে কেটে ফেলেচে।

তৃতীয় শোণপাংশু। আগে ওদের দেশের প্রাচীর পঁয়ত্রিশ হাত উঁচু ছিল, এবার আশি হাত উঁচু করবার জন্যে লোক লাগিয়ে দিয়েচে, পাছে পৃথিবীর সব লোক লাফ দিয়ে গিয়ে হঠাৎ স্থবিরক হ'য়ে ওঠে।

চতুর্থ শোণপাংশু। আমাদের দেশ থেকে দশজন শোণপাংশু ধরে' নিয়ে গেচে, হয়ত ওদের কালঝাণ্টি দেবীর কাছে বলি দেবে।

দাদাঠাকুর। চল তবে।

প্রথম শোণপাংশু। কোথায়?

দাদাঠাকুর। স্থবিরপত্তনে।

দ্বিতীয় শোণপাংশু। এখনি ?

দাদাঠাকুর। হাঁ এখনি।

সকলে। ওরে চল্‌রে চল্‌!

দাদাঠাকুর। আমাদের রাজার আদেশ আছে ওদের পাপ যখন প্রাচারের আকার ধরে' আকাশের জ্যোতি আচ্ছন্ন করতে উঠবে তখন সেই প্রাচীর ধুলোয় লুটিয়ে দিতে হবে।

প্রথম শোণপাংশু। দেব ধুলোয় লুটিয়ে।

সকলে। দেব লুটিয়ে।

দাদাঠাকুর। ওদের সেই ভাঙা প্রাচারের উপর দিয়ে রাজপথ তৈরি করে' দেব।

সকলে। হাঁ রাজপথ তৈরি করে' দেব।

দাদাঠাকুর। আমাদের রাজার বিজয়রথ তা'র উপর দিয়ে চল্‌বে।

সকলে। হাঁ চল্‌বে, চল্‌বে।

পঞ্চক। দাদাঠাকুর, এ কি ব্যাপার ?

দাদাঠাকুর। এই আমাদের বনভোজন।

প্রথম শোণপাংশু। চল, পঞ্চক, তুমি চল।

দাদাঠাকুর। না, না, পঞ্চক না। যাও ভাই তোমার অচলায়তনে ফিরে যাও। যখন সময় হবে দেখা হবে।

পঞ্চক। কি জানি ঠাকুর, যদিও আমি কোনো কর্ম্মেরি না, তবু ইচ্ছে করচে তোমাদের সঙ্গে ছুটে বেরিয়ে পড়ি।

দাদাঠাকুর। না পঞ্চক, তোমার গুরু আসবেন, তুমি অপেক্ষা করগে।

পঞ্চক। তবে ফিরে যাই। কিন্তু ঠাকুর, যতবার বাইরে এসে তোমার সঙ্গে দেখা হয় ততবার ফিরে গিয়ে অচলায়তনে আমাকে যেন আর ধরে না। হয় ওটাকে বড় করে' দাও, নয় আমাকে আর বাড়তে দিয়ো না।

দাদাঠাকুর। আয়রে, তবে যাত্রা করি।

৩

(মহাপঞ্চক, উপাধ্যায়, সঞ্জীব, বিশ্বম্ভর, জয়োত্তম)

বিশ্বম্ভর। আচার্য্য অদীনপুণ্য যদি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করেন তবে তিনি যেমন আছেন থাকুন কিন্তু আমরা তাঁর কোনো অনুশাসন মানব না।

জয়োত্তম। তিনি বলেন তাঁর গুরু তাঁকে যে আসনে বসিয়েচেন তাঁর গুরুই তাঁকে সেই আসন থেকে নামিয়ে দেবেন সেই জন্যে তিনি অপেক্ষা করচেন।

(একটি ছাত্রের প্রবেশ)

মহাপঞ্চক। কি হে তৃণাঞ্জন।

তৃণাঞ্জন। আজ দ্বাদশী, আজ আমার লোকেশ্বর ব্রতের পারণের দিন। কিন্তু কি করব, আমাদের আচার্য্য যে কে তা'র ত কোনো ঠিক হ'ল না—আমাদের সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড পণ্ড হ'তে বস্‌ল এর কি করা যায়!

মহাপঞ্চক। সে ত আমি তোমাদের বলে' রেখেচি—এখন আশ্রমে যা-কিছু কাজ হচ্চে সমস্তই নিষ্ফল হচ্চে।

উপাধ্যায়। শুধু নিষ্ফল হচ্চে তা নয়, আমাদের অপরাধ ক্রমেই জমে' উঠচে।

সঞ্জীব। এ যে বড় সর্ব্বনেশে কথা!

জয়োত্তম। কিন্তু আমাদের গুরু আসবার ত দেরি নেই, এর মধ্যে আর কত অনিষ্টই বা হবে!

সঞ্জীব। আরে রাখ তোমার তর্ক। অনিষ্ট হ'তে সময় লাগে না। মরার পক্ষে এক মুহূর্ত্তই যথেষ্ট।

(অধ্যেতার প্রবেশ)

উপাধ্যায়। কি গো অধ্যেতা, ব্যাপার কি?

অধ্যেতা। তোমরা ত আমাকে বলে' এলে সুভদ্রকে মহাতামসে বসাতে—কিন্তু বসায় কার সাধ্য?

মহাপঞ্চক। কেন কি বিঘ্ন ঘটেচে?

অধ্যেতা। মূর্ত্তিমান বিঘ্ন রয়েচে তোমার ভাই!

মহাপঞ্চক। পঞ্চক?

অধ্যেতা। হাঁ। আমি সুভদ্রকে তিন্দুমর্দ্দন কুণ্ডে স্নান করিয়ে সবে উঠেচি এমন সময় পঞ্চক এসে তাঁকে কেড়ে নিয়ে গেল!

মহাপঞ্চক। না, এই নরাধমকে নিয়ে আর চল্‌ল না। অনেক সহ্য করেচি। এবার ওকে নির্ব্বাসন দেওয়াই স্থির। কিন্তু অধ্যেতা, তুমি এটা সহ্য করলে?

অধ্যেতা। আমি কি তোমার পঞ্চককে ভয় করি? স্বয়ং

আচার্য্য অদীনপুণ্য এসে তাঁকে আদেশ করলেন তাই ত সে সাহস পেলে।

তৃণাঞ্জন। আচার্য্য অদীনপুণ্য!

সঞ্জীব। স্বয়ং আমাদের আচার্য্য!

বিশ্বম্ভর। ক্রমে এ সব হচ্চে কি! এতদিন এই আয়তনে আছি, কখনো ত এমন অনাচারের কথা শুনিনি। যে স্রোত তাঁকে তাঁর ব্রত থেকে ছিন্ন করে' আনে! আর স্বয়ং আমাদের আচার্য্যের এই কীর্ত্তি!

জয়োত্তম। তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করেই দেখা যাক না।

বিশ্বম্ভর। না, না, আচার্য্যকে আমরা—

মহাপঞ্চক। কি করবে আচার্য্যকে, বলেই ফেল।

বিশ্বম্ভর। তাই ত ভাবচি কি করা যায়। তুমিই বল না হয়— আপনি বলে' দিন না কি করতে হবে।

মহাপঞ্চক। আমি বল্‌চি তাঁকে সংযত করে' রাখতে হবে।

সঞ্জীব। কেমন করে'?

মহাপঞ্চক। কেমন করে' আবার কি? মত্ত হস্তীকে যেমন করে' সংযত করতে হয় তেমনি করে'।

জয়োত্তম। আমাদের আচার্য্যদেবকে কি তা হ'লে—

মহাপঞ্চক। হাঁ, তাঁকে বদ্ধ করে' রাখতে হবে। চুপ করে' রইলে যে! পারবে না?

তৃণাঞ্জন। কেন পারব না? আপনি যদি আদেশ করেন তাহ'লেই—

জয়োত্তম। কিন্তু শাস্ত্রে কি এর—

মহাপঞ্চক। শাস্ত্রে বিধি আছে।

তৃণাঞ্জন। তবে আর ভাবনা কি ?

উপাধ্যায়। মহাপঞ্চক, তোমার কিছুই বাধে না, আমার কিন্তু ভয় হচ্চে।

(আচার্য্যের প্রবেশ)

আচার্য্য। বৎস, এতদিন তোমরা আমাকে আচার্য্য বলে' মেনেচ আজ তোমাদের সামনে আমার বিচারের দিন এসেচে। আমি স্বীকার করচি অপরাধের অন্ত নেই, অন্ত নেই, তা'র প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করতে হবে।

তৃণাঞ্জন। তবে আর দেরি করেন কেন ? এ দিকে যে আমাদের সর্ব্বনাশ হয় !

জয়োত্তম। দেখ তৃণাঞ্জন, আঁস্তাকুড়ের ছাই দিয়ে তোমার এই মুখের গর্ত্তটা ভরিয়ে দিতে হবে! একটু থাম না।

আচার্য্য। গুরু চলে' গেলেন, আমরা তাঁর জায়গায় পুঁথি নিয়ে বসলুম; তা'র শুকনো পাতায় ক্ষুধা যতই মেটে না ততই পুঁথি কেবল বাড়াতে থাকি। খাদ্যের মধ্যে প্রাণ যতই কমে তা'র পরিমাণ ততই বেশি হয়। সেই জীর্ণপুঁথির ভাণ্ডারে প্রতিদিন তোমরা দলে

দলে আমার কাছে তোমাদের তরুণ হৃদয়টি মেলে ধরে' কি চাইতে এসেছিলে? অমৃতবাণী? কিন্তু আমার তালু যে শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেচে। রসনায় যে রসের লেশমাত্র নেই! এবার নিয়ে এস সেই বাণী, গুরু, নিয়ে এস হৃদয়ের বাণী! প্রাণকে প্রাণ দিয়ে জাগিয়ে দাও!

পঞ্চক। (ছুটিয়া প্রবেশ করিয়া) তোমার নববর্ষার সজল হাওয়ায় উড়ে যাক্ সব শুকনো পাতা—আয়রে নবীন কিশলয়—তোরা ছুটে আয়, তোরা ফুটে বেরো! ভাই জয়োত্তম, শুনচ না, আকাশের ঘন নীল মেঘের মধ্যে মুক্তির ডাক উঠেচে—আজ নৃত্য কররে নৃত্য কর।

গান

ওরে ওরে ওরে আমার মন মেতেচে
তা'রে আজ থামায় কেরে!
সে যে আকাশ পানে হাত পেতেচে
তা'রে আজ নামায় কেরে!

(প্রথমে জয়োত্তমের, পরে বিশ্বম্ভরের, পরে সঞ্জীবের নৃত্যগীতে যোগ)

মহাপঞ্চক। পঞ্চক, নির্লজ্জ বানর কোথাকার, থাম্ বল্‌চি থাম্!

পঞ্চক

গান

ওরে আমার মন মেতেচে
আমায় আজ থামায় কেবে !

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, তোমাকে কি বলিনি একজটা দেবীর শাপ আরম্ভ হয়েচে ? দেখ্‌চ, কি করে' তিনি আমাদের সকলের বুদ্ধিকে বিচলিত করে' তুলেচেন— ক্রমে দেখ্‌বে অচলায়তনের একটি পাথরও আর থাকবে না !

পঞ্চক। না, থাকবে না, থাকবে না, পাথরগুলো সব পাগল হ'য়ে যাবে ; তা'রা কে কোথায় ছুটে বেরিয়ে পড়বে, তা'রা গান ধরবে—

ওরে ভাই, নাচ্‌রে ও ভাই নাচ্‌রে-
আজ ছাড়া পেয়ে বাঁচ্‌রে—
লাজ ভয় ঘুচিয়ে দেরে !
তোরে আজ থামায় কেবে !

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, হাঁ করে' দাঁড়িয়ে দেখ্‌চ কি। সর্ব্বনাশ স্বরু হয়েচে, বুঝ্‌তে পারচ না ! ওরে সব ছন্নমতি মূর্খ, অভিশপ্ত বর্ব্বর, আজ তোদের নাচবার দিন ?

পঞ্চক। সর্ব্বনাশের বাজনা বাজলেই নাচ স্বরু হয় দাদা !

মহাপঞ্চক। চুপ্‌ কর লক্ষ্মীছাড়া ! ছাত্রগণ, তোমরা

আত্মবিস্মৃত হ'য়ো না! ঘোর বিপদ আসন্ন সে কথা স্মরণ রেখো।

বিশ্বম্ভর। আচার্য্যদেব আপনার পায়ে ধরি, সুভদ্রকে আমাদের হাতে দিন, তা'কে তা'র প্রায়শ্চিত্ত থেকে নিরস্ত করবেন না।

আচার্য্য। না, বৎস, এমন অনুরোধ কোরো না

সঞ্জীব। ভেবে দেখুন, সুভদ্রের কত বড় ভাগ্য। মহাতামস ক জন লোকে পারে! ও যে ধরাতলে দেবত্ব লাভ করবে!

আচার্য্য। গায়ের জোরে দেবতা গড়বার পাপে আমাকে লিপ্ত কোরো না! সে মানুষ, সে শিশু, সেইজন্যেই সে দেবতাদের প্রিয়।

তৃণাঞ্জন। দেখুন আপনি আমাদের আচার্য্য, আমাদের প্রণম্য, কিন্তু যে অন্যায় আজ করচেন, তা'তে আমরা বল প্রয়োগ করতে বাধ্য হব।

আচার্য্য। কর, বল প্রয়োগ কর, আমাকে মেনো না, আমাকে মার, আমি অপমানেরই যোগ্য, তোমাদের হাত দিয়ে আমার যে শাস্তি আরম্ভ হ'ল তা'তেই বুঝ্‌তে পারচি গুরুর আবির্ভাব হয়েচে। কিন্তু সেই জন্যেই বলচি শাস্তির কারণ আর বাড়তে দেব না। সুভদ্রকে তোমাদের হাতে দিতে পারব না।

তৃণাঞ্জন। পারবে না?

আচার্য্য। না।

মহাপঞ্চক। তা হ'লে আর দ্বিধা করা নয়। তৃণাঞ্জন, এখন তোমাদের উচিত ওঁকে জোর করে' ধরে' নিয়ে ঘরে বন্ধ করা। ভীরু, কেউ সাহস করচ না? আমাকেই তবে এ কাজ করতে হবে?

জয়োত্তম। খবরদার---আচার্য্যদেবের গায়ে হাত দিতে পারবে না!

বিশ্বম্ভর। না, না, মহাপঞ্চক, ওঁকে অপমান করলে আমরা সইতে পারব না।

সঞ্জীব। আমরা সকলে মিলে পায়ে ধরে' ওঁকে রাজি করাব। একা সুভদ্রের প্রতি দয়া করে' উনি কি আমাদের সকলের অমঙ্গল ঘটাবেন?

তৃণাঞ্জন। এই অচলায়তনের এমন কত শিশু উপবাসে প্রাণত্যাগ করেচে-- তাতে ক্ষতি কি হয়েচে?

(সুভদ্রের প্রবেশ)

সুভদ্র। আমাকে মহাতামস ব্রত করাও।

পঞ্চক। সর্ব্বনাশ করলে! ঘুমিয়ে পড়েচে দেখে আমি এখানে এসেছিলুম কখন জেগে উঠে চলে' এসেচে!

আচার্য্য। বৎস সুভদ্র, এস আমার কোলে। যাকে পাপ বলে' ভয় করচ সে পাপ আমার-- আমিই প্রায়শ্চিত্ত করব।

তৃণাঞ্জন। না, না, আয়রে আয় সুভদ্র, তুই মানুষ না, তুই দেবতা।

সঞ্জীব। তুই ধন্য!

বিশ্বম্ভর। তোর বয়সে মহাতামস করা আর কারো ভাগ্যে ঘটেনি। সার্থক তোর মা তোকে গর্ভে ধারণ করেছিল।

উপাধ্যায়। আহা সুভদ্র, তুই আমাদের অচলায়তনেরই বালক বটে।

মহাপঞ্চক। আচার্য, এখনো কি তুমি জোর করে এই বালককে এই মহাপুণ্য থেকে বঞ্চিত করতে চাও?

আচার্য। হায়, হায়, এই দেখেই আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্চে। তোমরা যদি ওকে কাঁদিয়ে আমার হাত থেকে ছিঁড়ে কেড়ে নিয়ে যেতে তাহলেও আমার এত বেদনা হত না। কিন্তু দেখচি হাজার বছরের নিষ্ঠুর বাহু অতটুকু শিশুর মনকেও পাথরের মুঠোয় চেপে ধরেচে, একেবারে পাঁচ আঙুলের দাগ বসিয়ে দিয়েচেরে! কখন সময় পেল সে? সে কি গর্ভের মধ্যেও কাজ করে?

পঞ্চক। সুভদ্র, আয় ভাই, প্রায়শ্চিত্ত করতে যাই—আমিও যাব তোর সঙ্গে।

আচার্য। বৎস, আমিও যাব।

সুভদ্র। না, না, আমাকে যে একলা থাকতে হবে—লোক থাক্‌লে যে পাপ হবে!

মহাপঞ্চক। ধন্য শিশু, তুমি তোমার ঐ প্রাচীন আচার্য্যকে আজ শিক্ষা দিলে! এস তুমি আমার সঙ্গে।

আচার্য্য। না, আমি যতক্ষণ তোমাদের আচার্য্য আছি ততক্ষণ আমার আদেশ ব্যতীত কোনো ব্রত আরম্ভ বা শেষ হ'তেই পারে না। আমি নিষেধ করচি! সুভদ্র, আচার্য্যের কথা অমান্য কোরো না—এস পঞ্চক ওকে কোলে করে' নিয়ে এস।

(সুভদ্রকে লইয়া পঞ্চকের ও আচার্য্যের এবং উপাধ্যায়ের প্রস্থান)

মহাপঞ্চক। ধিক্! তোমাদের মত ভীরুদের দুর্গতি হ'তে রক্ষা করে এমন সাধ্য কারো নেই। তোমরা নিজেও মরবে অন্য সকলকেও মারবে। তোমাদের উপাধ্যায়টিও তেমনি হয়েচেন—তাঁরও আর দেখা নেই।

(পদাতিকের প্রবেশ)

পদাতিক। রাজা আস্‌চেন।

মহাপঞ্চক। ব্যাপারখানা কি! এ যে আমাদের রাজা মন্থরগুপ্ত!

(রাজার প্রবেশ)

রাজা। নরদেবগণ, তোমাদের সকলকে নমস্কার।

সকলে। জয়োস্তু রাজন্।

মহাপঞ্চক। কুশল ত ?

রাজা। অত্যন্ত মন্দ সংবাদ। প্রত্যন্ত দেশের দূতেরা এসে খবর দিল যে দাদাঠাকুরের দল এসে আমাদের রাজ্য-সীমার প্রাচীর ভাঙতে আরম্ভ করেচে।

মহাপঞ্চক। দাদাঠাকুরের দল কা'রা ?

রাজা। ঐ যে শোণপাংশুরা ?

মহাপঞ্চক। শোণপাংশুরা যদি আমাদের প্রাচীর ভাঙে তাহ'লে যে সমস্ত লণ্ডভণ্ড করে' দেবে!

রাজা। সেই জন্যেই ত ছুটে এলুম! তোমাদের কাছে আমার প্রশ্ন এই যে আমাদের প্রাচীর ভাঙল কেন ?

মহাপঞ্চক। শিখাসচ্ছন্দ মহাভৈরব ত আমাদের প্রাচীর রক্ষা করচেন।

রাজা। তিনি অনাচারী শোণপাংশুদের কাছে আপন শিখা নত করলেন! নিশ্চয়ই তোমাদের মন্ত্র উচ্চারণ অশুদ্ধ হচ্চে, তোমাদের ক্রিয়া-পদ্ধতিতে স্খলন হচ্চে নইলে এ যে স্বপ্নের অতীত!

মহাপঞ্চক। আপনি সত্যই অনুমান করেচেন মহারাজ!

সঞ্জীব। একজটা দেবীর শাপ ত আর ব্যর্থ হ'তে পারে না!

রাজা। একজটা দেবীর শাপ! সর্ব্বনাশ! কেন তাঁর শাপ ?

মহাপঞ্চক। যে উত্তরদিকে তাঁর অধিষ্ঠান এখানে একদিন সেই দিককার জানলা খোলা হয়েচে।

রাজা। (বসিয়া পড়িয়া) তবে ত আর আশা নেই।

মহাপঞ্চক। আচার্য্য অদীনপুণ্য এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দিচ্চেন না।

তৃণাঞ্জন। তিনি জোর করে' আমদের ঠেকিয়ে রেখেচেন।

রাজা। তবে ত মিথ্যা আমি সৈন্য জড় করতে বলে' এলুম। দাও, দাও, অদীনপুণ্যকে এখনি নির্ব্বাসিত করে' দাও!

মহাপঞ্চক। আগামী অমাবস্যায়—

রাজা। না, না, এখন তিথি নক্ষত্র দেখবার সময় নেই! বিপদ আসন্ন। সঙ্কটের সময় আমি আমার রাজ অধিকার খাটাতে পারি— শাস্ত্রে তা'র বিধান আছে।

মহাপঞ্চক। হাঁ আছে। কিন্তু আচার্য্য কে হবে?

রাজা। তুমি, তুমি! এখনি আমি তোমাকে আচার্য্যের পদে প্রতিষ্ঠিত করে' দিলুম। দিকপালগণ সাক্ষী রইলেন, এই ব্রহ্মচারীরা সাক্ষী রইলেন।

মহাপঞ্চক। অদীনপুণ্যকে কোথায় নির্ব্বাসিত করতে চান?

রাজা। আয়তনের বাহিরে নয়—কি জানি যদি শত্রুপক্ষের সঙ্গে যোগ দেন। আমার পরামর্শ এই যে আয়তনের প্রান্তে যে দর্ভকদের পাড়া আছে এ কয়দিন সেইখানে তাঁকে বদ্ধ করে' রেখো।

জয়োত্তম। আচার্য্য অদীনপুণ্যকে দর্ভকদের পাড়ায়? তা'রা যে অন্ত্যজ পতিত জাতি!

মহাপঞ্চক। যিনি স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক আচার লঙ্ঘন করেন অনাচারীদের মধ্যে বাস করলেই তবে তাঁর চোখ ফুট্‌বে। মনে কোরো না আমার ভাই বলে' পঞ্চককে ক্ষমা করব—তা'রও সেইখানে গতি!

রাজা। দেখো মহাপঞ্চক, তোমার উপরই নির্ভর, যুদ্ধে জেতা চাই। আমার হার যদি হয় তবে সে তোমাদের অচলায়তনেরই অক্ষয় কলঙ্ক।

মহাপঞ্চক। কোনো ভয় করবেন না।

—০—

৪

দর্ভকপল্লী

পঞ্চক। নির্ব্বাসন, আমার নির্ব্বাসনরে! বেঁচে গেচি, বেঁচে গেচি! কিন্তু এখনো মনটাকে তা'র খোলসের ভিতর থেকে টেনে বের করতে পারচিনে কেন?

গান

এই মৌমাছিদের ঘরছাড়া কে করেচে রে!
তোরা আমায় বলে' দে ভাই বলে' দে রে!
ফুলের গোপন পরাণ মাঝে
নীরব সুরে বাঁশি বাজে—
ওদের সেই বাঁশিতে কেমনে মন হরেচে রে!
যে মধুটি লুকিয়ে আছে
দেয় না ধরা কারো কাছে
ওদের সেই মধুতে কেমনে মন ভরেচে রে!

(দর্ভকদলের প্রবেশ)

প্রথম দর্ভক। দাদাঠাকুর!

পঞ্চক। ওকি ও! দাদাঠাকুর বলচিস্ কা'কে? আমার গায়ে দাদাঠাকুর নাম লেখা হ'য়ে গেচে নাকি?

প্রথম দর্ভক। তোমাদের কি খেতে দেব ঠাকুর?

পঞ্চক। তোদের যা আছে তাই আমরা খাব।

দ্বিতীয় দর্ভক। আমাদের খাবার? সে কি হয়? সে যে সব ছোঁওয়া হ'য়ে গেচে।

পঞ্চক। সে জন্যে ভাবিস্‌নে ভাই। পেটের ক্ষিদে যে আগুন, সে কারো ছোঁওয়া মানে না, সবই পবিত্র করে। ওরে তোরা সকাল বেলায় করিস কি বলত! ষড়ক্ষরিত দিয়ে একবার ঘটশুদ্ধি করে' নিবিনে?

তৃতীয় দর্ভক। ঠাকুর, আমরা নীচ দর্ভক জাত—আমরা ওসব কিছুই জানিনে! আজ কত পুরুষ ধরে' এখানে বাস করে' আস্‌চি কোনো দিন ত তোমাদের পায়ের ধূলো পড়েনি। আজ তোমাদের মন্ত্র পড়ে' আমাদের বাপ পিতামহকে উদ্ধার করে' দাও ঠাকুর।

পঞ্চক। সর্ব্বনাশ! বলিস্ কি! এখানেও মন্ত্র পড়তে হবে! তাহ'লে নির্ব্বাসনের দরকার কি ছিল। তা, সকাল বেলা তোরা কি করিস বল্‌ত?

প্রথম দর্ভক। আমরা শাস্ত্র জানিনে, আমরা নাম গান করি।

পঞ্চক। সে কি রকম ব্যাপার? শোনা দেখি একটা।

দ্বিতীয় দর্ভক। ঠাকুর, সে তুমি শুনে হাস্‌বে।

পঞ্চক। আমিই ত ভাই এত দিন লোক হাসিয়ে আস্‌চি—তোরা আমাকেও হাসাবি—শুনেও মন খুসি হয়। আমি যে কি মূল্যের মানুষ সে তোরা খবর পাস্‌নি

বলে' এখনো আমার হাসিকে ভয় করিস। কিছু ভাবিস্‌নে—নির্ভয়ে শুনিয়ে দে।

প্রথম দর্ভক। আচ্ছা ভাই আয় তবে—গান ধর।

গান

ও অকূলের কূল, ও অগতির গতি,
ও অনাথের নাথ ও পতিতের পতি।
ও নয়নের আলো, ও রসনার মধু,
ও রতনের হার, ও পরাণের বঁধু!
ও অপরূপ রূপ, ও মনোহর কথা,
ও চরমের সুখ, ও মরমের ব্যথা।
ও ভিখারীর ধন, ও অবোলার বোল—
ও জনমের দোলা, ও মরণের কোল।

পঞ্চক। দে ভাই, আমার মন্ত্রতন্ত্র সব ভুলিয়ে দে, আমার বিদ্যাসাধ্যি সব কেড়ে নে, দে আমাকে তোদের ঐ গান শিখিয়ে দে!

প্রথম দর্ভক। আমাদের গান ?

পঞ্চক। হাঁরে, হাঁ ঐ অধমের গান, অক্ষমের কান্না। তোদের এই মূর্খের বিদ্যা এই কাঙালের সম্বল খুঁজেই ত আমার পড়াশুনা কিছু হ'ল না, আমার ক্রিয়াকর্ম্ম সমস্ত নিষ্ফল হ'য়ে গেল! ও ভাই, আর একটা শোনা —অনেক দিনকার তৃষ্ণা অল্পে মেটে না।

দর্ভকদলের গান

আমরা তা'রেই জানি তা'রেই জানি সাথের সাথী ;
তা'রেই করি টানাটানি দিবারাতি
সঙ্গে তা'রি চরাই ধেনু,
বাজাই বেণু,
তারি লাগি বটের ছায়ায় আসন পাতি
তা'রে হালের মাঝি করি
চালাই তরী,
ঝড়ের বেলায় ঢেউয়ের খেলায় মাতামাতি
সারাদিনের কাজ ফুরালে
সন্ধ্যা কালে
তাহার পথ চেয়ে ঘরে জ্বালাই বাতি

আচার্য্যের প্রবেশ)

আচার্য্য। সার্থক হ'ল আমার নির্ব্বাসন।

প্রথম দর্ভক। বাবাঠাকুর, আমাদের সমস্ত পাড়া আজ ত্রাণ পেয়ে গেল। এতদিন তোমার চরণধূলো ত এখানে পড়েনি।

আচার্য্য। সে আমার অভাগা, সে আমারি অভাগা।

দ্বিতীয় দর্ভক। বাবা, তোমার স্নানের জল কা'কে দিয়ে তোলাব? এখানে ত—

আচার্য্য। বাবা, তোরাই তুলে আন্‌বি।

প্রথম দর্ভক। আমরা তুলে আন্‌বো—সে কি হয়!

আচার্য্য। হাঁ বাবা, তোদের তোলা জলে আজ আমার অভিষেক হবে।

দ্বিতীয় দর্ভক। ওরে চল্ তবে ভাই চল্। আমাদের পাটলা নদী থেকে জল আনিগে।

(প্রস্থান)

আচার্য্য। দেখ পঞ্চক, কাল এখানে এসে আমার ভারি গ্লানি বোধ হচ্ছিল।

পঞ্চক। আমি ত কাল রাত্রে ঘরের বাইরে শুয়েই কাটিয়ে দিয়েচি।

আচার্য্য। যখন এই রকম অত্যন্ত কুন্ঠিত হ'য়ে আপনাকে আদ্যোপান্ত পাপলিপ্ত মনে করে' বসে' আছি এমন সময় ওরা সন্ধ্যা বেলায় ওদের কাজ থেকে ফিরে এসে সকলে মিলে গান ধরলে—

পারের কাণ্ডারী গো, এবার ঘাট কি দেখা যায় ?
নাম্‌বে কি সব বোঝা এবার ঘুচবে কি সব দায় ?

শুন্‌তে শুনতে মনে হ'ল আমার যেন একটা পাথরের দেহ গলে' গেল। দিনের পর দিন কি ভার বয়েই বেড়িয়েচি! কিন্তু কতই সহজ—সরল প্রাণ নিয়ে সেই পারের কাণ্ডারীর খেয়ায় চড়ে' বসা!

পঞ্চক। আমি দেখ্‌চি দর্ভক জাতের একটা গুণ—ওরা একেবারে স্পষ্ট করে' নাম নিতে জানে। আর তট তট তোতয় তোতয় করতে করতে আমার জিবের

এমনি দশা হয়েচে যে, সহজ কথাটা কিছুতেই মুখ দিয়ে বেরতে চায় না। আচার্য্যদেব, কেবল ভালো করে' না ডাক্‌তে পেরেই আমাদের বুকের ভিতরটা এমন শুকিয়ে এসেচে, একবার খুব করে' গলা ছেড়ে ডাক্‌তে ইচ্ছা করচে। কিন্তু গলা খোলে না যে—রাজ্যের পুঁথি পড়ে' পড়ে' গলা বুজে গিয়েচে প্রভু! এমন হয়েচে আজ কান্না এলেও বেধে যায়!

আচার্য্য। সেই জন্যেই ত ভাব্‌চি আমাদের গুরু আস্‌বেন কবে। জঞ্জাল সব ঠেলে ফেলে দিয়ে আমাদের প্রাণটাকে একেবারে সরল করে' দিন—হাতে করে' ধরে' সকলের সঙ্গে মিল করিয়ে দিন।

পঞ্চক। মনে হচ্চে যেন ভিজে মাটির গন্ধ পাচ্চি, কোথায় যেন বন্যা নেমেচে!

আচার্য্য। ওই পঞ্চক শুন্‌তে পাচ্চ কি?

পঞ্চক। কি বলুন দেখি?

আচার্য্য। আমার মনে হচ্চে যেন সুভদ্র কাঁদ্‌চে!

পঞ্চক। এখান থেকে কি শোনা যাবে? এ বোধ হয় আর কোনো শব্দ!

আচার্য্য। তা হবে পঞ্চক, আমি তা'র কান্না আমার বুকের মধ্যে করে' এনেচি। তা'র কান্নাটা এমন করে' আমাকে বেজেচে কেন জান? সে যে কান্না রাখ্‌তে পারে না তবু কিছু মান্‌তে চায় না সে কাঁদ্‌চে।

পঞ্চক। এতক্ষণে ওরা তাঁ'কে মহাতামসে বসিয়েচে—আর সকলে মিলে খুব দূরে থেকে বাহবা দিয়ে বল্‌চে সুভদ্র দেবশিশু। আর কিছু না, আমি যদি রাজা হতুম তা হ'লে ওদের সবাইকে কানে ধরে' দেবতা করে' দিতুম—কিছুতে ছাড়তুম না।

আচার্য্য। ওরা ওদের দেবতাকে কাঁদাচ্চে পঞ্চক। সেই দেবতারই কান্নায় এ রাজ্যের সকল আকাশ আকুল হ'য়ে উঠেচে। তবু ওদের পাষাণের বেড়া এখনো শতধা বিদীর্ণ হ'য়ে গেল না।

পঞ্চক। প্রভু, আমরা তাঁকে সকলে মিলে কত কাঁদালুম তবু তাড়াতে পারলুম না। তাঁকে যে ঘরে বসালুম সে ঘরের আলো সব নিবিয়ে দিলুম—তাঁকে আর দেখ্‌তে পাইনে—তবু তিনি সেখানে বসে' আছেন!

গান

সকল জনম ভোরে
ও মোর দরদিয়া—
কাঁদি কাঁদাই তোরে
ও মোর দরদিয়া!
আছ হৃদয় মাঝে,
সেথা কতই ব্যথা বাজে
ওগো এ কি তোমায় সাজে
ও মোর দরদিয়া।

এই দুয়ার-দেওয়া ঘরে
কভু আঁধার নাহি সরে
তবু আছ তারি পরে
ও মোর দরদিয়া
সেথা আসন হয়নি পাতা
সেথা মালা হয়নি গাঁথা
আমার লজ্জাতে হেঁট মাথা
ও মোর দরদিয়া

(উপাচার্য্যের প্রবেশ)

আচার্য্য। এ কি সুতসোম! আমার কি সৌভাগ্য! কিন্তু তুমি এখানে এলে যে!

উপাচার্য্য। আর কোথা যাব বল? তুমি চলে' আসামাত্র অচলায়তন যে কি কঠিন হ'য়ে উঠল, কি শুকিয়ে গেল সে আমি বলতে পারিনে। এখন এস একবার কোলাকুলি করি।

আচার্য্য। আমাকে ছুঁয়ো না—কাল থেকে ঘটশুদ্ধি ভূতশুদ্ধি কিছুই করিনি।

উপাচার্য্য। তা হোক্ তা হোক্। তোমারও আলিঙ্গন যদি অশুচি হয় তবে সেই অশুচিতার পুণ্যদীক্ষাই আমাকে দাও।

(কোলাকুলি)

পঞ্চক। উপাচার্য্যদেব, অচলায়তনে তোমার কাছে যত

অপরাধ করেচি আজ এই দর্ভকপাড়ায় সে সমস্ত ক্ষমা করে' নাও।

উপাচার্য্য। এস বৎস, এস।

(আলিঙ্গন)

আচার্য্য। সুতসোম, গুরু ত শীঘ্রই আস্‌চেন, এখন তুমি সেখান থেকে চলে' এলে কি করে'?

উপাচার্য্য। সেই জন্যেই চলে' এলুম। গুরু আস্‌চেন, তুমি নেই। আর মহাপঞ্চক এসে গুরুকে বরণ করে' নেবে—এও দাঁড়িয়ে থেকে দেখ্‌তে হবে। ঐ শাস্ত্রের কীটটা গুরুকে আহ্বান করে' আনবার যোগ্য এমন কথা যদি স্বয়ং মহামহর্ষি জলধরগর্জ্জিতঘোষসুস্বরনক্ষত্রশঙ্কুসুমিত এসেও বলেন তবু আমি মানতে পারব না।

পঞ্চক। আঃ দেখ্‌তে দেখ্‌তে কি মেঘ করে' এল। শুনচ আচার্য্যদেব, বজ্রের পর বজ্র! আকাশকে একেবারে দিকে দিকে দগ্ধ করে' দিলে যে।

আচার্য্য। ঐ যে নেমে এল বৃষ্টি—পৃথিবীর কতদিনের পথ-চাওয়া বৃষ্টি—অরণ্যের কত রাতের স্বপন-দেখা বৃষ্টি।

পঞ্চক। মিট্‌ল এবার মাটির তৃষা—এই যে কালো মাটি—এই যে সকলের পায়ের নীচেকার মাটি।

(ডালিতে কেয়াফুল কদম্বফুল লইয়া বাদ্যসহ দর্ভকদলের প্রবেশ)

আচার্য্য। বাবা, তোমাদের এ কি সমারোহ! আজ এ কি কাণ্ড!

প্রথম দর্ভক। বাবাঠাকুর, আজ তোমাদের নিয়েই সমারোহ। কখনো পাইনি আজ পেয়েচি।

দ্বিতীয় দর্ভক। আমরা শাস্ত্র কিছুই জানিনে—তোমাদের দেবতা আমাদের ঘরে আসে না।

তৃতীয় দর্ভক। কিন্তু আজ দেবতা কি মনে করে' অতিথি হ'য়ে এই অধমদের ঘরে এসেচেন।

প্রথম দর্ভক। তাই আমাদের যা আছে তাই দিয়ে তোমাদের সেবা করে' নেব।

দ্বিতীয় দর্ভক। আমাদের মন্ত্র নেই বলে' আমরা শুধু গান গাই।

(মাদল বাজাইয়া নৃত্যগীত)

উতল ধারা বাদল ঝরে,
সকাল বেলা একা ঘরে।
সজল হাওয়া বহে বেগে,
পাগল নদী উঠে জেগে,
আকাশ ঘেরে কাজল মেঘে,
তমাল বনে আঁধার করে।

ওগো বঁধু দিনের শেষে
এলে তুমি কেমন বেশে।
আঁচল দিয়ে শুকাব জল
মুছাব পা আকুল কেশে।
নিবিড় হবে তিমির রাতি,
জ্বেলে দেব প্রেমের বাতি,
পরাণখানি দিব পাতি
চরণ রেখো তাহার পরে।

আচার্য্য। পঞ্চক, আমাদেরও তেমনি করে' ডাকতে হবে— বজ্ররবে যিনি দরজায় ঘা দিয়েচেন তাঁকে ঘরে ডেকে নাও—আর দেরি কোরো না।

ভুলে গিয়ে জীবন মরণ
লব তোমায় করে' বরণ,
করিব জয় সরমত্রাসে
দাঁড়াব আজ তোমার পাশে।
বাঁধন বাধা যাবে জ্বলে',
সুখ দুঃখ দেব দলে',
ঝড়ের রাতে তোমার সাথে
বাহির হব অভয় ভরে।

(সকলে)

উতল ধারা বাদল ঝরে—
দুয়ার খুলে এল ঘরে।

চোখে আমার ঝলক লাগে,
সকল মনে পুলক জাগে,
চাহিতে চাই মুখের বাগে
নয়ন মেলে কাঁপি ডরে।

পঞ্চক। ঐ আবার বজ্র।

আচার্য্য। দ্বিগুণ বেগে বৃষ্টি এল।

উপাচার্য্য। আজ সমস্ত রাত এমনি করেই কাটবে

৫

অচলায়তন

মহাপঞ্চক, তৃণাঞ্জন, সঞ্জীব, বিশ্বম্ভর, জয়োত্তম

মহাপঞ্চক। তোমরা অত ব্যস্ত হ'য়ে পড়চ কেন? কোনো ভয় নেই!

তৃণাঞ্জন। তুমি ত বল্‌চ ভয় নেই, এই যে খবর এল শত্রু সৈন্য অচলায়তনের প্রাচীর ফুটো ক'রে দিয়েচে।

মহাপঞ্চক। একথা বিশ্বাসযোগ্য নয়! শিলা জলে ভাসে। ম্লেচ্ছরা অচলায়তনের প্রাচীর ফুটো ক'রে দেবে। পাগল হয়েচ!

সঞ্জীব। কে যে বল্লে দেখে এসেচে।

মহাপঞ্চক। সে স্বপ্ন দেখেচে।

জয়োত্তম। আজই ত আমাদের গুরুর আসবার কথা।

মহাপঞ্চক। তাঁর জন্যে সমস্ত আয়োজন ঠিক হ'য়ে গেচে; কেবল যে-ছেলের মা বাপ ভাই বোন কেউ মরে নি এমন নবম গর্ভের সন্তান এখনো জুটিয়ে আনতে

পারলে না—দ্বারে দাঁড়িয়ে কে যে মহারক্ষা পড়বে ঠিক করতে পারচিনে।

সঞ্জীব। গুরু এলে তাঁকে চিনে নেবে কে? আচার্য অদীনপুণ্য তাঁকে জানতেন। আমরা ত কেউ তাঁকে দেখিনি।

মহাপঞ্চক। আমাদের আয়তনে যে শাঁখ বাজায় সেই বৃদ্ধ তাঁকে দেখেচে। আমাদের পূজার ফুল যে জোগায় সেও তাঁকে জানে।

বিশ্বম্ভর। ঐ যে উপাধ্যায় ব্যস্ত হ'য়ে ছুটে আসচেন।

মহাপঞ্চক। নিশ্চয় গুরু আসার সংবাদ পেয়েচেন। কিন্তু মহারক্ষা-পাঠের কি করা যায়? ঠিক লক্ষণসম্পন্ন ছেলে ত পাওয়া গেল না।

(উপাধ্যায়ের প্রবেশ)

মহাপঞ্চক। কত দূর?

উপাধ্যায়। কত দূর কি? এসে পড়েচে যে।

মহাপঞ্চক। কই, দ্বারে ত এখনো শাঁখ বাজালে না?

উপাধ্যায়। বিশেষ দরকার দেখিনে—কারণ দ্বারের চিহ্নও দেখতে পাচ্চিনে—ভেঙে চুরমার হ'য়ে গেচে।

মহাপঞ্চক। বল কি? দ্বার ভেঙেচে?

উপাধ্যায়। শুধু দ্বার নয়, প্রাচীরগুলোকে এমনি সমান

করে' শুইয়ে দিয়েচে যে তাদের সম্বন্ধে আর কোনো চিন্তা করবার দরকার নেই।

মহাপঞ্চক। কিন্তু আমাদের দৈবজ্ঞ যে গণনা করে' স্পষ্ট দেখিয়ে দিয়ে গেল যে—

উপাধ্যায়। তা'র চেয়ে ঢের স্পষ্ট দেখা যাচ্চে শত্রুসৈন্যদের রক্তবর্ণ টুপিগুলো!

ছাত্রগণ। কি সর্ব্বনাশ!

সঞ্জীব। কিসের মন্ত্র তোমার মহাপঞ্চক?

তৃণাঞ্জন। আমি ত তখন বলেছিলুম এ-সব কাজ এই কাঁচা বয়সের পুঁথিপড়া অকালপক্কদের দিয়ে হবার নয়!

বিশ্বম্ভর। কিন্তু এখন করা যায় কি?

তৃণাঞ্জন। আমাদের আচার্য্যদেবকে এখন ফিরিয়ে আনিগে। তিনি থাক্‌লে এ বিপত্তি ঘটতেই পারত না। হাজার হোক লোকটা পাকা।

সঞ্জীব। কিন্তু দেখ মহাপঞ্চক আমাদের আয়তনের যদি কোনো বিপত্তি ঘটে তা'হলে তোমাকে টুকরো-টুকরো করে' ছিঁড়ে ফেলব।

উপাধ্যায়। সে পরিশ্রমটা তোমাদের করতে হবে না, উপযুক্ত লোক আসচে।

মহাপঞ্চক। তোমরা মিথ্যা বিচলিত হচ্চ। বাইরের প্রাচীর ভাঙতে পারে, কিন্তু ভিতরের লোহার দরজা বন্ধ

আছে। সে যখন ভাঙবে তখন চন্দ্র সূর্য্য নিবে যাবে। আমি অভয় দিচ্চি তোমরা স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে অচলায়তনের রক্ষক দেবতার আশ্চর্য্য শক্তি দেখে নাও!

উপাধ্যায়। তা'র চেয়ে দেখি কোন দিক দিয়ে বেরবার রাস্তা।

তৃণাঞ্জন। আমাদেরও ত সেই ইচ্ছা। কিন্তু এখান থেকে বেরবার পথ যে জানিই নে। কোনো দিন বেরতে হবে বলে' স্বপ্নেও মনে করিনি।

সঞ্জীব। শুনচ—ঐ শুনচ, ভেঙে পড়ল সব।

ছাত্রগণ। কি হবে আমাদের। নিশ্চয়ই দরজা ভেঙেচে!

তৃণাঞ্জন। ধর মহাপঞ্চককে! বাঁধ ওকে! একজটাদেবীর কাছে ওকে বলি দেবে চল।

মহাপঞ্চক। সেই কথাই ভালো। দেবীর কাছে আমাকে বলি দেবে চল। তাঁর রোষ শান্তি হবে। এমন নিষ্পাপ বলি তিনি আর পাবেন কোথায়?

(বালকদলের প্রবেশ)

উপাধ্যায়। কিরে তোরা সব নৃত্য করচিস কেন?

প্রথম বালক। আজ এ কি মজা হ'ল।

উপাধ্যায়। মজাটা কি রকম শুনি?

দ্বিতীয় বালক। আজ চারদিক থেকেই আলো আসচে—সব যেন ফাঁক হ'য়ে গেচে।

তৃতীয় বালক। এত আলো ত আমরা কোনোদিন দেখিনি!

প্রথম বালক। কোথাকার পাখীর ডাক এখান থেকেই শোনা যাচ্চে।

দ্বিতীয় বালক। এ সব পাখীর ডাক আমরা ত কোনোদিন শুনিনি! এ ত আমাদের খাঁচার ময়নার মত একেবারেই নয়।

প্রথম বালক। আজ আমাদের খুব ছুটতে ইচ্চে করচে। তা'তে কি দোষ হবে মহাপঞ্চক দাদা!

মহাপঞ্চক। আজকের কথা ঠিক বলতে পারচিনে। আজ কোনো নিয়ম রক্ষা করা চলবে বলে' বোধ হচ্চে না।

প্রথম বালক। আজ তাহ'লে আমাদের ষড়াসন বন্ধ?

মহাপঞ্চক। হাঁ বন্ধ।

সকলে। ওরে কি মজারে মজা!

দ্বিতীয় বালক। আজ পংক্তিধৌতির দরকার নেই?

মহাপঞ্চক। না।

সকলে। ওরে কি মজা! আঃ আজ চারিদিকে কি আলো!

জয়োত্তম। আমারও মনটা নেচে উঠচে বিশ্বম্ভর! এ কি ভয়, না আনন্দ, কিছুই বুঝতে পারচিনে!

বিশ্বম্ভর। আজ একটা অদ্ভুত কাণ্ড হচ্চে জয়োত্তম!

সঞ্জীব। কিন্তু ব্যাপারটা যে কি ভেবে উঠতে পারচিনে!

ওরে ছেলেগুলো, তোরা হঠাৎ এত খুসি হ'য়ে উঠ্‌লি কেন বল দেখি!

প্রথম বালক। দেখ্‌চ না সমস্ত আকাশটা যেন ঘরের মধ্যে দৌড়ে এসেচে!

দ্বিতীয় বালক। মনে হচ্চে ছুটি—আমাদের ছুটি!

তৃতীয় বালক। সকাল থেকে পঞ্চকদাদার সেই গানটা কেবল আমরা গেয়ে বেড়াচ্চি।

জয়োত্তম। কোন গান?

প্রথম বালক। সেই যে—

গান

আলো, আমার আলো, ওগো
আলো ভুবনভরা।
আলো নয়ন-ধোওয়া আমার
আলো হৃদয়হরা!
নাচে আলো নাচে—ও ভাই
আমার প্রাণের কাছে,
বাজে আলো বাজে—ও ভাই
হৃদয়-বীণার মাঝে;
জাগে আকাশ ছোটে বাতাস
হাসে সকল ধরা।
আলো, আমার আলো ওগো
আলো ভুবনভরা।

আলোর স্রোতে পাল তুলেচে
হাজার প্রজাপতি।
আলোর ঢেউয়ে উঠল নেচে
মল্লিকা মালতী।
মেঘে মেঘে সোনা— ও ভাই
যায় না মাণিক গোণা,
পাতায় পাতায় হাসি— ও ভাই
পুলক রাশি রাশি,
সুরনদীর কূল ডুবেচে
সুধা-নিঝর-ঝরা।
আলো আমার আলো, ওগো
আলো ভুবনভরা।

বালকদের প্রস্থান

জয়োত্তম। দেখ মহাপঞ্চক দাদা, আমার মনে হচ্চে ভয় কিছুই নেই—নইলে ছেলেদের মন এমন অকারণে খুসি হ'য়ে উঠল কেন?

মহাপঞ্চক। ভয় নেই সে ত আমি বরাবর বলে' আসচি।

(শঙ্খবাদক ও মালীর প্রবেশ)

উভয়ে। গুরু আসচেন।

সকলে। গুরু!

মহাপঞ্চক। শুনলে ত! আমি নিশ্চয় জানতুম তোমার আশঙ্কা বৃথা!

সকলে। ভয় নেই আর ভয় নেই!

তৃণাঞ্জন। মহাপঞ্চক যখন আছেন তখন কি আমাদের ভয় থাকতে পারে!

সকলে। জয় আচার্য মহাপঞ্চকের।

যোদ্ধবেশে দাদাঠাকুরের প্রবেশ।

শঙ্খবাদক ও মালী। (প্রণাম করিয়া) জয় গুরুজির জয়!

(সকলে স্তম্ভিত)

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, এই কি গুরু?

উপাধ্যায়। তাই ত শুনচি।

মহাপঞ্চক। তুমি কি আমাদের গুরু?

দাদাঠাকুর। হাঁ। তুমি আমাকে চিনবে না কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু!

মহাপঞ্চক। তুমি গুরু? তুমি আমাদের সমস্ত নিয়ম লঙ্ঘন করে' এ কোন্ পথ দিয়ে এলে? তোমাকে কে মানবে?

দাদাঠাকুর। আমাকে মানবে না জানি, কিন্তু আমিই তোমাদের গুরু!

মহাপঞ্চক। তুমি গুরু? তবে এই শত্রুবেশে কেন?

দাদাঠাকুর। এই ত আমার গুরুর বেশ। তুমি যে আমার সঙ্গে লড়াই করবে—সেই লড়াই আমার গুরুর অভ্যর্থনা।

মহাপঞ্চক। কেন তুমি আমাদের প্রাচীর ভেঙে দিয়ে এলে ?

দাদাঠাকুর। তুমি কোথাও তোমার গুরুর প্রবেশের পথ রাখনি !

মহাপঞ্চক। তুমি কি মনে করেচ তুমি অস্ত্র হাতে করে' এসেচ বলে' আমি তোমার কাছে হার মানব ?

দাদাঠাকুর। না, এখনি না ! কিন্তু দিনে দিনে হার মানতে হবে, পদে পদে।

মহাপঞ্চক। আমাকে নিরস্ত্র দেখে ভাবচ আমি তোমাকে আঘাত করতে পারিনে ?

দাদাঠাকুর। আঘাত করতে পার কিন্তু আহত করতে পার না—আমি যে তোমার গুরু।

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, তোমরা এঁকে প্রণাম করবে না কি !

উপাধ্যায়। দয়া করে' উনি যদি আমাদের প্রণাম গ্রহণ করেন তাহ'লে প্রণাম করব বই কি—না হ'লে যে—

মহাপঞ্চক। না, আমি তোমাকে প্রণাম করব না।

দাদাঠাকুর। আমি তোমার প্রণাম গ্রহণ করব না—আমি তোমাকে প্রণত করব !

মহাপঞ্চক। তুমি আমাদের পূজা নিতে আসনি ?

দাদাঠাকুর। আমি তোমাদের পূজা নিতে আসিনি, অপমান নিতে এসেচি।

মহাপঞ্চক। তোমার পশ্চাতে অস্ত্রধারী এ কা'রা

দাদাঠাকুর। এরা আমার অনুবর্ত্তী—এরা শোণপাংশু।

সকলে। শোণপাংশু!

মহাপঞ্চক। এরাই তোমার অনুবর্ত্তী?

দাদাঠাকুর। হাঁ।

মহাপঞ্চক। এই মন্ত্রহীন কর্ম্মকাণ্ডহীন ম্লেচ্ছদল?

দাদাঠাকুর। এস ত, তোমাদের মন্ত্র এদের শুনিয়ে দাও। এদের কর্ম্মকাণ্ড কি রকম তাও ক্রমে দেখতে পাবে।

শোণপাংশুদের গান

যিনি সকল কাজের কাজী, মোরা
তাঁরি কাজের সঙ্গী।
যাঁর নানারঙের রঙ্গ, মোরা
তাঁরি রসের রঙ্গী।
তাঁর বিপুল ছন্দে ছন্দে
মোরা যাই চ'লে আনন্দে,
তিনি যেমনি বাজান ভেরী, মোদের
তেমনি নাচের ভঙ্গী।
এই জন্ম-মরণ খেলায়
মোরা মিলি তাঁরি মেলায়,
এই দুঃখ সুখের জীবন মোদের
তাঁরি খেলার অঙ্গী।
ওরে, ডাকেন তিনি যবে
তাঁর জলদমন্দ্র রবে,
ছুটি পথের কাঁটা পায়ে দ'লে
সাগর গিরি লঙ্ঘি।

মহাপঞ্চক। আমি এই আয়তনের আচার্য—আমি তোমাকে আদেশ করচি তুমি এখনি ঐ ম্লেচ্ছদলকে সঙ্গে নিয়ে বাহির হ'য়ে যাও।

দাদাঠাকুর। আমি যাকে আচার্য নিযুক্ত করব সেই আচার্য; আমি যা আদেশ করব সেই আদেশ।

মহাপঞ্চক। উপাধ্যায়, আমরা এমন করে' দাঁড়িয়ে থাক্‌লে চলবে না। এস আমরা এদের এখান থেকে বাহির করে' দিয়ে আমাদের আয়তনের সমস্ত দরজাগুলো আবার একবার দ্বিগুণ দৃঢ় করে' বন্ধ করি।

উপাধ্যায়। এরাই আমাদের বাহির করে' দেবে, সেই সম্ভাবনাটাই প্রবল বলে' বোধ হচ্চে।

প্রথম শোণপাংশু। অচলায়তনের দরজার কথা বলচ—সে আমরা আকাশের সঙ্গে দিব্যি সমান করে' দিয়েচি।

উপাধ্যায়। বেশ করেচ ভাই! আমাদের ভারি অসুবিধা হচ্ছিল। এত তালা-চাবির ভাবনাও ভাব্‌তে হ'ত!

মহাপঞ্চক। পাথরের প্রাচীর তোমরা ভাঙতে পার, লোহার দরজা তোমরা খুল্‌তে পার কিন্তু আমি আমার ইন্দ্রিয়ের সমস্ত দ্বার রোধ করে' বসলুম—যদি প্রায়োপবেশনে মরি তবু তোমাদের হাওয়া তোমাদের আলো লেশমাত্র আমাকে স্পর্শ করতে দেব না।

প্রথম শোণপাংশু। এ পাগলটা কোথাকার রে! এই তলোয়ারের ডগা দিয়ে ওর মাথার খুলিটা একটু

ফাঁক করে' দিলে ওর বুদ্ধিতে একটু হাওয়া লাগতে পারে।

মহাপঞ্চক। কিসের ভয় দেখাও আমায়! তোমরা মেরে ফেলতে পার, তা'র বেশি ক্ষমতা তোমাদের নেই!

প্রথম শোণপাংশু। ঠাকুর, এই লোকটাকে বন্দী করে' নিয়ে যাই—আমাদের দেশের লোকের ভারি মজা লাগবে।

দাদাঠাকুর। ওকে বন্দী করবে তোমরা? এমন কি বন্ধন তোমাদের হাতে আছে?

দ্বিতীয় শোণপাংশু। ওকে কি কোনো শাস্তি দেব না?

দাদাঠাকুর। শাস্তি দেবে! ওকে স্পর্শ করতেও পারবে না। ও আজ যেখানে বসেচে সেখানে তোমাদের তলোয়ার পৌঁছয় না।

(বালকদলের প্রবেশ)

সকলে। তুমি আমাদের গুরু।

দাদাঠাকুর। হাঁ, আমি তোমাদের গুরু।

সকলে। আমরা প্রণাম করি।

দাদাঠাকুর। বৎস, তোমরা মহাজীবন লাভ কর।

প্রথম বালক। ঠাকুর, তুমি আমাদের কি করবে?

দাদাঠাকুর। আমি তোমাদের সঙ্গে খেলব।

সকলে। খেলবে?

দাদাঠাকুর। নইলে তোমাদের গুরু হ'য়ে সুখ কিসের ?

সকলে। কোথায় খেল্‌বে ?

দাদাঠাকুর। আমার খেলার মস্ত মাঠ আছে।

প্রথম বালক। মস্ত! এই ঘরের মত মস্ত ?

দাদাঠাকুর। এর চেয়ে অনেক বড়।

দ্বিতীয় বালক। এর চেয়েও বড়! ঐ আঙিনাটার মত ?

দাদাঠাকুর। তা'র চেয়ে বড়।

দ্বিতীয় বালক। তা'র চেয়ে বড়! উঃ কি ভয়ানক!

প্রথম বালক। সেখানে খেল্‌তে গেলে পাপ হবে না ?

দাদাঠাকুর। কিসের পাপ ?

দ্বিতীয় বালক। খোলা জায়গায় গেলে পাপ হয় না ?

দাদাঠাকুর। না বাছা, খোলা জায়গাতেই সব পাপ পালিয়ে যায়।

সকলে। কখন নিয়ে যাবে ?

দাদাঠাকুর। এখানকার কাজ শেষ হ'লেই।

জয়োত্তম। (প্রণাম করিয়া) প্রভু, অমিও যাব।

বিশ্বম্ভর। সঞ্জীব, আর দ্বিধা করলে কেবল সময় নষ্ট হবে। প্রভু, ঐ বালকদের সঙ্গে আমাদেরও ডেকে নাও!

সঞ্জীব। মহাপঞ্চকদাদা, তুমিও এস না!

মহাপঞ্চক। না, আমি না।

৬

দর্ভকপল্লী

পঞ্চক

(গান)

আমি যে সব নিতে চাই, সব নিতে ধাইরে !
আমি আপনাকে ভাই মেল্‌ব যে বাইরে !
পালে আমার লাগ্‌ল হাওয়া,
হবে আমার সাগর যাওয়া,
ঘাটে তরী নাই বাঁধা নাইরে।
সুখে দুখে বুকের মাঝে
পথের বাঁশি কেবল বাজে,
সকল কাজে শুনি যে তাইরে।
পাগ্‌লামি আজ লাগ্‌ল পাখায়
পাখী কি আর থাক্‌বে শাখায় ?
দিকে দিকে সাড়া যে পাইরে !

(আচার্য্যের প্রবেশ)

পঞ্চক। দূরে থেকে নানা প্রকার শব্দ শুন্‌তে পাচ্চি আচার্য্যদেব ! অচলায়তনে বোধ হয় খুব সমারোহ চল্‌চে।

আচার্য্য। সময় ত হয়েচে। কালই ত তাঁর আসবার কথা ছিল। আমার মনটা ব্যাকুল হ'য়ে উঠেচে। একবার সুভদ্রসোমকে ওখানে পাঠিয়ে দিই।

পঞ্চক। তিনি আজ একাদশীর তর্পণ করবেন বলে' কোথায় ইন্দ্রতৃণ পাওয়া যায় সেই খোঁজেই বেরিয়েচেন।

(দর্ভকদলের প্রবেশ)

পঞ্চক। কি ভাই, তোরা এত ব্যস্ত কিসের?

প্রথম দর্ভক। শুনচি অচলায়তনে কা'রা সব লড়াই করতে এসেচে।

আচার্য্য। লড়াই কিসের? আজ ত গুরু-আসবার কথা।

দ্বিতীয় দর্ভক। না, না, লড়াই হচ্চে খবর পেয়েচি। সমস্ত ভেঙেচুরে একাকার করে' দিলে যে।

তৃতীয় দর্ভক। বাবাঠাকুর, তোমরা যদি হুকুম কর আমরা যাই ঠেকাই গিয়ে।

আচার্য্য। ওখানে ত লোক ঢের আছে তোমাদের ভয় নেই বাবা।

প্রথম দর্ভক। লোক ত আছে কিন্তু তা'রা লড়াই করতে পারবে কেন?

দ্বিতীয় দর্ভক। শুনেচি কত রকম মন্ত্রলেখা তাগাতাবিজ দিয়ে তা'রা দুখানা হাত আগাগোড়া কসে বেঁধে

রেখেচে। খোলে না, পাছে কাজ করতে গেলেই তাদের হাতের গুণ নষ্ট হয়।

পঞ্চক। আচার্যদেব, এদের সংবাদটা সত্যই হবে। কাল সমস্ত রাত মনে হচ্ছিল চারদিকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন ভেঙেচুরে পড়চে। ঘুমের ঘোরে ভাবছিলুম স্বপ্ন বুঝি।

আচার্য। তবে কি গুরু আসেন নি?

পঞ্চক। হয়ত বা দাদা ভুল করে' আমার গুরুরই সঙ্গে লড়াই বাধিয়ে বসেচেন। আটক নেই। রাত্রে তাঁকে হঠাৎ দেখে হয় ত যমদূত বলে' ভুল করেছিলেন।

প্রথম দর্ভক। আমরা শুনেচি কে বলছিল গুরুও এসেচেন।

আচার্য। গুরুও এসেচেন? সে কি রকম হ'ল?

পঞ্চক। তবে লড়াই করতে কারা এসেচে বল্ ত?

প্রথম দর্ভক। লোকের মুখে শুনি তাদের নাকি বলে দাদা-ঠাকুরের দল।

পঞ্চক। দাদাঠাকুরের দল! বল বল্ শুনি ঠিক বল্‌চিস ত রে?

দ্বিতীয় দর্ভক। হাঁ, সকলেই ত বল্‌চে দাদাঠাকুরের দল।

পঞ্চক। ওরে কি আনন্দরে কি আনন্দ!

আচার্য। এ কি পঞ্চক, হঠাৎ তুমি এ রকম উন্মত্ত হ'য়ে উঠলে কেন?

পঞ্চক। প্রভু, আমার মনের একটা বাসনা ছিল কোনো সুযোগে যদি আমাদের দাদাঠাকুরের সঙ্গে গুরুর মিলন করিয়ে দিতে পারি, তাহ'লে দেখি কে হারে কে জেতে!

আচার্য্য। পঞ্চক, তোমার কথা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারচিনে। তুমি দাদাঠাকুর বল্‌চ কা'কে?

পঞ্চক। আচার্য্যদেব, ঐটে আমার গোপন কথা, অনেকদিন থেকেই মনে রেখে দিয়েচি। এখন তোমাকে বল্‌ব না প্রভু, যদি তিনি এসে থাকেন, তাহ'লে একেবারে চোখে চোখে মিলিয়ে দেব।

প্রথম দর্ভক। বাবাঠাকুর, হুকুম কর, একবার ওদের সঙ্গে লড়ে' আসি—দেখিয়ে দিই এখানে মানুষ আছে।

পঞ্চক। আয় না ভাই আমিও তোদের সঙ্গে চল্‌বরে।

দ্বিতীয় দর্ভক। তুমি ত লড়্‌বে নাকি ঠাকুর?

পঞ্চক। হাঁ, লড়্‌ব।

আচার্য্য। কি বল্‌চ পঞ্চক! তোমাকে লড়্‌তে কে ডাক্‌চে?

পঞ্চক। আমার প্রাণ ডাক্‌চে। একটা কিসের মায়াতে মন জড়িয়ে রয়েচে প্রভু! যেন কেবলি স্বপ্ন দেখ্‌চি—আর যতই জোর করচি কিছুতেই জাগ্‌তে পারচিনে। কেবল এমন বসে' বসে' হবে না দেব! একেবারে

লড়াইয়ের মাঝখানে গিয়ে পড়্‌তে না পারলে কিছুতেই এ ঘোর কাট্‌বে না।

(গান)

আর নহে আর নয়।
আমি করিনে আর ভয়।
আমার ঘুচল বাঁধন ফলল সাধন
হ'ল বাঁধন ক্ষয়।
ঐ আকাশে ঐ ডাকে
আমায় আর কে ধরে' রাখে!
আমি সকল দুয়ার খুলেছি আজ
যাব সকলময়।
ওরা বসে' বসে' মিছে
শুধু মায়াজাল গাঁথিছে,
ওরা কি যে গোণে ঘরের কোণে
আমায় ডাকে পিছে।
আমার অস্ত্র হ'ল গড়া,
আমার বর্ম্ম হ'ল পরা,
এবার ছুটবে ঘোড়া পবনবেগে
করবে ভুবন জয়।

(মালীর প্রবেশ)

মালী। আচার্য্যদেব, আমাদের গুরু আসচেন।

আচার্য্য। বলিস কি? গুরু? তিনি এখানে আস্‌চেন? আমাকে আহ্বান করলেই ত আমি যেতুম।

প্রথম দর্ভক। এখানে তোমাদের গুরু এলে তাঁকে বসাব কোথায়?

দ্বিতীয় দর্ভক। বাবাঠাকুর, তুমি এখানে তাঁর বস্‌বার জায়গাটাকে একটু শোধন করে' নাও—আমরা তফাতে সরে' যাই।

(আর-একদল দর্ভকের প্রবেশ)

প্রথম দর্ভক। বাবাঠাকুর, এ তোমাদের গুরু নয়—সে এ পাড়ায় আস্‌বে কেন? এ যে আমাদের গোঁসাই!

দ্বিতীয় দর্ভক। আমাদের গোঁসাই?

প্রথম দর্ভক। হাঁরে হাঁ, আমাদের গোঁসাই! এমন সাজ তা'র আর কখনো দেখিনি। একেবারে চোখ ঝল্‌সে যায়।

তৃতীয় দর্ভক। ঘরে কি আছেরে ভাই সব বের কর।

দ্বিতীয় দর্ভক। বনের জাম আছেরে।

চতুর্থ দর্ভক। আমার ঘরে খেজুর আছে।

প্রথম দর্ভক। কালো গোরুর দুধ শীগ্‌গির দুয়ে আন দাদা।

(দাদাঠাকুরের প্রবেশ)

আচার্য্য। (প্রণাম করিয়া) জয় গুরুজির জয়!

পঞ্চক। এ কি! এযে দাদাঠাকুর! গুরু কোথায়?

দর্ভকদল। গোঁসাই ঠাকুর! প্রণাম হই! খবর দিয়ে এলে না কেন? তোমার ভোগ যে তৈরি হয়নি।

দাদাঠাকুর। কেন ভাই, তোদের ঘরে আজ রান্না চড়েনি নাকি? তোরাও মন্ত্র নিয়ে উপোষ করতে আরম্ভ করেচিস্ নাকিরে?

প্রথম দর্ভক। আমরা আজ শুধু মাষকলাই আর ভাত চাড়িয়েচি। ঘরে আর কিছু ছিল না।

দাদাঠাকুর। আমারো তা'তেই হ'য়ে যাবে।

পঞ্চক। দাদাঠাকুর, আমার ভারি গর্ব্ব ছিল এ রাজ্যে একলা আমিই কেবল চিনি তোমাকে। কারো যে চিনতে আর বাকি নেই।

প্রথম দর্ভক। ঐ ত আমাদের গোঁসাই পূর্ণিমার দিনে এসে আমাদের পিঠে খেয়ে গেচে, তা'রপর এই কতদিন পরে দেখা। চল ভাই আমাদের যা আছে সব সংগ্রহ করে' আনি।

(প্রস্থান)

দাদাঠাকুর। আচার্য্য, তুমি এ কি করেচ!

আচার্য্য। কি যে করেচি তা বোঝবারও শক্তি আমার নেই। তবে এইটুকু বুঝি—আমি সব নষ্ট করেচি!

দাদাঠাকুর। যিনি তোমাকে মুক্তি দেবেন তাঁকেই তুমি কেবল বাঁধবার চেষ্টা করেচ!

আচার্য্য। কিন্তু বাঁধতে ত পারিনি ঠাকুর। তাঁকে বাঁধচি মনে করে' যতগুলো পাক দিয়েচি সব পাক কেবল নিজের চারদিকেই জড়িয়েচি। যে-হাত দিয়ে সেই

বাঁধন খোলা যেতে পারত সেই হাতটা সুদ্ধ বেঁধে ফেলেচি !

দাদাঠাকুর। যিনি সব-জায়গায় আপনি ধরা দিয়ে বসে' আছেন তাঁকে একটা-জায়গায় ধরতে গেলেই তাঁকে হারাতে হয়।

আচার্য্য। তিনি যে আছেন এই খবরটা মনের মধ্যে পৌঁছায়নি বলে' মনে করে' বসে'ছিলুম তাঁকে বুঝি কৌশল করে' গড়ে' তুল্‌তে হয়। তাই দিন রাত বসে' বসে' এত ব্যর্থ চেষ্টার জাল পাকিয়েচি !

দাদাঠাকুর। তোমার যে-কারাগারটাতে তোমার নিজেকেই আঁটে না সেইখানে তাঁকে শিকল পরাবার আয়োজন না করে' তাঁরই এই খোলা মন্দিরের মধ্যে তোমার আসন পাতবার জন্যে প্রস্তুত হও।

আচার্য্য। আদেশ কর প্রভু ! ভুল করেছিলুম জেনেও ভুল ভাঙতে পারিনি। পথ হারিয়েচি তা জানতুম, যতই চলচি ততই পথ হ'তে কেবল বেশি দূরে গিয়ে পড়চি তাও বুঝতে পেরেছিলুম, কিন্তু ভয়ে থামতে পারছিলুম না। এই চক্রে হাজার বার ঘুরে বেড়ানকেই পথ খুঁজে পাবার উপায় বলে' মনে করেছিলুম।

দাদাঠাকুর। যে চক্র কেবল অভ্যাসের চক্র, যা কোনো জায়গাতেই নিয়ে যায় না, কেবল নিজের মধ্যেই ঘুরিয়ে মারে, তা'র থেকেই বের করে' সোজা রাস্তায়

বিশ্বের সকল যাত্রীর সঙ্গে দাঁড় করিয়ে দেবার জন্যেই আমি আজ এসেচি।

আচার্য। ধন্য করেচ!—কিন্তু এতদিন আসনি কেন প্রভু? আমাদের আয়তনের পাশেই এই দর্ভকপাড়ায় তুমি আনাগোনা করচ, আর কত বৎসর হ'য়ে গেল আমাদের আর দেখা দিলে না?

দাদাঠাকুর। এদের দেখা দেওয়ার রাস্তা যে সোজা। তোমাদের সঙ্গে দেখা করা ত সহজ করে' রাখনি।

পঞ্চক। ভালোই করেচি, তোমার শক্তি পরীক্ষা করে' নিয়েচি। তুমি আমাদের পথ সহজ করে' দেবে কিন্তু তোমার পথ সহজ নয়। এখন, আমি ভাবচি ডাক্‌ব কি বলে'? দাদাঠাকুর, না গুরু?

দাদাঠাকুর। যে জানতে চায় না যে আমি তাকে চালাচ্চি আমি তা'র দাদাঠাকুর, আর যে আমার আদেশ নিয়ে চল্‌তে চায় আমি তা'র গুরু।

পঞ্চক। প্রভু, তুমি তাহ'লে আমার দুইই! আমাকে আমিই চালাচ্চি, আর আমাকে তুমিই চালাচ্চ এই দুটোই আমি মিশিয়ে জানতে চাই। আমি শোণপাংশু না, তোমাকে মেনে চল্‌তে ভয় নেই। তোমার মুখের আদেশকেই আনন্দে আমার মনের ইচ্ছা করে' তুলতে পারব। এবার তবে তোমার সঙ্গে তোমারি বোঝা মাথায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ি ঠাকুর!

দাদাঠাকুর। আমি তোমার জায়গা ঠিক করে' রেখেচি।

পঞ্চক। কোথায় ঠাকুর ?

দাদাঠাকুর। ঐ অচলায়তনে।

পঞ্চক। আবার অচলায়তনে ? আমার কারাদণ্ডের মেয়াদ ফুরোয় নি ?

দাদাঠাকুর। কারাগার যা ছিল সে ত আমি ভেঙে ফেলেচি, এখন সেই উপকরণ দিয়ে সেইখানেই তোমাকে মন্দির গেঁথে তুল্‌তে হবে।

পঞ্চক। ঠাকুর, আমি তোমাকে জোড়হাত করে' বল্‌চি আর আমাকে বসিয়ে রাখার কাজে লাগিয়ো না। তোমার ঐ বীরবেশে আমার মন ভুলেচে—তোমাকে এমন মনোহর আর কখনো দেখিনি।

দাদাঠাকুর। ভয় নেই পঞ্চক! অচলায়তনে আর সেই শান্তি দেখ্‌তে পাবে না। তা'র দ্বার ফুটো করে' দিয়ে আমি তা'র মধ্যেই লড়াইয়ের ঝোড়ো হাওয়া এনে দিয়েচি। নিজের নাসাগ্রভাগের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বসে' থাক্‌বার দিন এখন চিরকালের মত ঘুচিয়ে দিয়েচি।

পঞ্চক। কিন্তু অচলায়তনের লোকে যে আমাকে আপন বলে' গ্রহণ করবে না প্রভু '

দাদাঠাকুর। আমি বল্‌চি তুমি অচলায়তনের লোকের সকলের চেয়ে আপন।

পঞ্চক। কিন্তু দাদাঠাকুর, আমি কেবল একলা, একলা, ওরা আমাকে সবাই ঠেলে রেখে দেবে।

দাদাঠাকুর। ওরা তোমাকে গ্রহণ করতে চাচ্চে না, সেই জন্যেই ওখানে তোমার সব চেয়ে দরকার। ওরা তোমাকে ঠেলে দিচ্চে বলেই তুমি ওদের ঠেলতে পারবে না।

পঞ্চক। আমাকে কি করতে হবে?

দাদাঠাকুর। যে যেখানে ছড়িয়ে আছে সবাইকে ডাক দিয়ে আনতে হবে।

পঞ্চক। সবাইকে কি কুলবে?

দাদাঠাকুর। না যদি কুলয় তাহ'লে এমনি করে' দেয়াল আবার আর-একদিন ভাঙতেই হবে সেই বুঝে গেঁথো—আমার আর কাজ বাড়িয়ো না।

পঞ্চক। শোণপাংশুদের—

দাদাঠাকুর। হাঁ, ওদেরও ডেকে এনে বসাতে হবে, ওরা একটু বস্‌তে শিখুক্।

পঞ্চক। ওদের বসিয়ে রাখা? সর্ব্বনাশ! তার চেয়ে ওদের ভাঙতে চুরতে দিলে ওরা বেশি ঠাণ্ডা থাকে! ওরা যে কেবল ছট্‌ফট্ করাকেই মুক্তি মনে করে!

দাদাঠাকুর। ছোট ছেলেকে পাকা বেল দিলে সে খুসি হ'য়ে মনে করে এটা খেলার গোলা। কেবল সেটাকে গড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। ওরাও সেই রকম

স্বাধীনতাকে বাইরে থেকে ভারি একটা মজার জিনিষ বলে' জানে—জানে না স্থির হ'য়ে বসে' তা'র ভিতর থেকে সার পদার্থটা বের করে' নিতে হয়। কিছু দিনের জন্যে তোমার মহাপঞ্চকদাদার হাতে ওদের ভার দিলেই খানিকটা ঠাণ্ডা হ'য়ে ওরা নিজের ভিতরের দিক্‌টাতে পাক ধরাবার সময় পাবে।

পঞ্চক। তাহ'লে আমার মহাপঞ্চকদাদাকে কি এখানেই—

দাদাঠাকুর। হাঁ এখানেই বই কি। তা'র ওখানে অনেক কাজ। এতদিন ঘর বন্ধ করে' অন্ধকারে ও মনে করছিল চাকাটা খুব চল্‌চে, কিন্তু চাকাটা কেবল এক জায়গায় দাঁড়িয়েই ঘুরছিল তা সে দেখ্‌তেও পায়নি। এখন আলোতে তা'র দৃষ্টি খুলে গেচে, সে আর সে-মানুষ নেই। কি করে' আপনাকে আপনি ছাড়িয়ে উঠ্‌তে হয় সেইটে শেখাবার ভার ওর উপর। ক্ষুধা তৃষ্ণা লোভ ভয় জীবন মৃত্যুর আবরণ বিদীর্ণ করে' আপনাকে প্রকাশ করার রহস্য ওর হাতে আছে।

আচার্য্য। আর এই চির-অপরাধীর কি বিধান করলে প্রভু?

দাদাঠাকুর। তোমাকে আর কাজ করতে হবে না আচার্য্য। তুমি আমার সঙ্গে এস।

আচার্য্য। বাঁচালে প্রভু, আমাকে রক্ষা করলে। আমার সমস্ত চিত্ত শুকিয়ে পাথর হ'য়ে গেচে—আমাকে আমারই এই পাথরের বেড়া থেকে বের করে' আন।

আমি কোনো সম্পদ চাই না—আমাকে একটু রস দাও!

দাদাঠাকুর। ভাবনা নেই আচার্য্য ভাবনা নেই—আনন্দের বন্যা নেমে এসেচে—তা'র ঝর ঝর শব্দে মন নৃত্য করচে আমার। বাইরে বেরিয়ে এলেই দেখ্‌তে পাবে চারিদিক ভেসে যাচ্চে। ঘরে বসে' ভয়ে কাঁপ্‌চে কা'রা? এ ঘনঘোর বন্যার কালো মেঘে আনন্দ, তীক্ষ্ণ বিদ্যুতে আনন্দ, বজ্রের গর্জ্জনে আনন্দ! আজ মাথার উষ্ণীষ যদি উড়ে যায় ত উড়ে যাক্, গায়ের উত্তরীয় যদি ভিজে যায় ত ভিজে যাক—আজ দুর্য্যোগ একে বলে কে? আজ ঘরের ভিত যদি ভেঙে গিয়ে থাকে যাক না ভেঙে—আজ একেবারে বড় রাস্তার মাঝখানে হবে মিলন!

স্তভদ্রের প্রবেশ

সুভদ্র। প্রভু!

দাদাঠাকুর। কি বাবা?

সুভদ্র। আমি যে পাপ করেচি তার ত প্রায়শ্চিত্ত শেষ হ'ল না।

দাদাঠাকুর। তা'র আর কিছু বাকি নেই।

সুভদ্র। বাকি নেই?

দাদাঠাকুর। না। আমি সমস্ত চুরমার করে' ধূলোয় লুটিয়ে দিয়েচি।

সুভদ্র। একজটা দেবী—

দাদাঠাকুর। একজটা দেবী! উত্তরের দিকের দেয়ালটা ভাঙবামাত্রই একজটা দেবীর সঙ্গে আমাদের এমনি মিল হ'য়ে গেল যে সে আর কোনোদিন জটা দুলিয়ে কাউকে ভয় দেখাবে না। এখন তাঁকে দেখ্‌লে মনে হবে সে আকাশের আলো—তাঁর সমস্ত জটা আষাঢ়ের নবীন মেঘের মধ্যে জড়িয়ে গিয়েচে।

সুভদ্র। এখন আমি কি করব?

পঞ্চক। এখন তুমি আছ ভাই আর আমি আছি। দুজনে মিলে কেবলি উত্তর দক্ষিণ পূব পশ্চিমের সমস্ত দরজা জানালাগুলো খুলে খুলে বেড়াব!

(উপাচার্য্যের প্রবেশ)

উপাচার্য্য। তৃণ পাওয়া গেল না—কোথায়ও তৃণ পাওয়া গেল না!

আচার্য্য। সূতসোম, তুমি বুঝি তৃণ খুঁজেই বেড়াচ্ছিলে?

উপাচার্য্য। হাঁ, ইন্দ্রতৃণ, সে ত কোথাও পাওয়া গেল না! হায়, হায়! এখন আমি করি কি! এমন জায়গাতেও মানুষ বাস করে!

আচার্য্য। থাক্ তোমার তৃণ! এদিকে একবার চেয়ে দেখ!

উপাচার্য্য। এ কি! এ যে আমাদের গুরু! এখানে! এই

দর্ভকদের পাড়ায় ? এখন উপায় কি ? ওঁকে কোথায়—

(দর্ভকগণের অর্ঘ্য লইয়া প্রবেশ)

প্রথম দর্ভক। গোঁসাই এই সব তোমার জন্যে এনেচি। কেতনের মাসি পশু পিঠে তৈরি করেছিল তারি কিছু বাকি আছে—

উপাচার্য্য। আরে, আরে সর্ব্বনাশ করলে রে! করিস্ কি! উনি যে আমাদের গুরু!

দ্বিতীয় দর্ভক। তোমাদের গুরু আবার কোথায়? এ ত আমাদের গোঁসাই!

দাদাঠাকুর। দে ভাই, আর কিছু এনেচিস ?

দ্বিতীয় দর্ভক। হাঁ, জাম এনেচি।

তৃতীয় দর্ভক। কিছু দই এনেচি।

দাদাঠাকুর। সব এখানে রাখ্। এস ভাই পঞ্চক, এস আচার্য্য অদীনপুণ্য—নূতন আচার্য্য আর পুরাতন আচার্য্য এস, এদের ভক্তির উপহার ভাগ করে' নিয়ে আজকের দিনটাকে সার্থক করি!

(বালকগণের প্রবেশ)

সকলে। গুরু!

দাদাঠাকুর। এস বাছা, তোমরা এস!

প্রথম বালক। কখন আমরা বের হব ?

দাদাঠাকুর। আর দেরি নেই—এখনি বের হ'তে হবে।

দ্বিতীয় বালক। এখন কি করব?

দাদাঠাকুর। এই যে তোমাদের ভোগ তৈরি হয়েচে!

প্রথম বালক। ও ভাই এই যে জাম—কি মজা!

দ্বিতীয় বালক। ওরে ভাই খেজুর—কি মজা!

তৃতীয় বালক। গুরু, এতে কোনো পাপ নেই?

দাদাঠাকুর। কিছু না—পুণ্য আছে।

প্রথম বালক। সকলের সঙ্গে এইখানে বসে' খাব?

দাদাঠাকুর। হাঁ এইখানেই।

(শোণপাংশুদলের প্রবেশ)

প্রথম শোণপাংশু। দাদাঠাকুর!

দ্বিতীয় শোণপাংশু। আর ত পারিনে! দেয়াল ত একটাও বাকি রাখিনি। এখন কি করব? বসে' বসে' পা ধরে' গেল যে!

দাদাঠাকুর। ভয় নেই রে! শুধু শুধু বসিয়ে রাখ্‌ব না! তোদের কাজ দেব।

সকলে। কি কাজ দেবে?

দাদাঠাকুর। আমাদের পঞ্চকদাদার সঙ্গে মিলে ভাঙা ভিতের উপর আবার গাঁথ্‌তে লেগে যেতে হবে।

সকলে। বেশ, বেশ, রাজি আছি!

দাদাঠাকুর। ঐ ভিতের উপর কাল যুদ্ধের রাত্রে স্থবিরকের রক্তের সঙ্গে শোণপাংশুর রক্ত মিলে গিয়েচে।

সকলে। হাঁ মিলেচে।

দাদাঠাকুর। সেই মিলনেই শেষ করলে চলবে না। এবার আর লাল নয়, এবার একেবারে শুভ্র। নূতন সৌধের শাদা ভিতকে আকাশের আলোর মধ্যে অভ্রভেদী করে' দাঁড় করাও। মেল তোমরা দুইদলে, লাগ তোমাদের কাজে!

সকলে। তাই লাগব! পঞ্চকদাদা, তাহ'লে তোমাকে উঠতে হচ্চে, অমন করে' ঠাণ্ডা হ'য়ে বসে' থাক্‌লে চলবে না। ত্বরা কর! আর দেরি না!

পঞ্চক। প্রস্তুত আছি! গুরু তবে প্রণাম করি! আচার্য্যদেব, আশীর্ব্বাদ কর!

সমাপ্ত

গীতি-মাল্য

গীতি-মাল্য

১

রাত্রি এসে যেথায় মেশে
দিনের পারাবারে
তোমায় আমায় দেখা হ'ল
সেই মোহানার ধারে।
সেইখানেতে সাদায় কালোয়
মিলে গেচে আঁধার আলোয়,
সেইখানেতে ঢেউ ছুটেচে
এপারে ঐপারে।

নিতল নীল নীরব মাঝে
বাজ্‌ল গভীর বাণী
নিকষেতে উঠ্‌ল ফুটে
সোনার রেখাখানি
মুখের পানে তাকাতে যাই
দেখি দেখি দেখ্‌তে না পাই,
স্বপন সাথে জড়িয়ে জাগা,
কাঁদি আকুলধারে।

শান্তিনিকেতন
১৩১৫

২

আজ প্রথম ফুলের পাব প্রসাদখানি
তাই ভোরে উঠেচি।
আজ শুনতে পাব প্রথম আলোর বাণী
তাই বাইরে ছুটেচি।
এই হ'ল মোদের পাওয়া,
তাই ধরেচি গান গাওয়া,
আজ লুটিয়ে হিরণ-কিরণ-পদ্মদলে
সোনার রেণু লুটেচি।

আজ পারুল দিদির বনে
মোরা চলব নিমন্ত্রণে,
আজ চাঁপা ভায়ের শাখা-ছায়ের তলে
মোরা সবাই জুটেচি।
আজ মনের মধ্যে ছেয়ে
সুনীল আকাশ ওঠে গেয়ে,
আজ সকালবেলায় ছেলেখেলার ছলে
সকল শিকল টুটেচি॥

শান্তিনিকেতন
১৩১৬

৬

ওগো শেফালি বনের মনের কামনা !

কেন সুদূর গগনে গগনে

আছ মিলায়ে পবনে পবনে ?

কেন কিরণে কিরণে ঝলিয়া

যাও শিশিরে শিশিরে গলিয়া ?

কেন চপল আলোতে ছায়াতে

আছ লুকায়ে আপন মায়াতে ?

তুমি মূরতি ধরিয়া চকিতে নাম না ।

ওগো শেফালি বনের মনের কামনা ।

আজি মাঠে মাঠে চল বিহরি'

তৃণ উঠুক্ শিহরি' শিহরি',

নামো তালপল্লব-বীজনে

নামো জলে ছায়াছবি সৃজনে ;

এসো সৌরভ ভরি আঁচলে

আঁখি আঁকিয়া সুনীল কাজলে ।

মম চোখের সমুখে ক্ষণেক থাম না ।

ওগো শেফালি বনের মনের কামনা !

ওগো সোনার স্বপন, সাধের সাধনা!
কত আকুল হাসি ও রোদনে
রাতে দিবসে স্বপনে বোধনে,
জ্বালি' জোনাকি প্রদীপ-মালিকা,
ভরি' নিশীথ-তিমির থালিকা,
প্রাতে কুসুমের সাজি সাজায়ে,
সাঁঝে ঝিল্লি-ঝাঁঝর বাজায়ে,
কত করেচে তোমার স্তুতি-আরাধনা।
ওগো সোনার স্বপন, সাধের সাধনা!

ঐ বসেচ শুভ্র আসনে
আজি নিখিলের সম্ভাষণে;
আহা শ্বেতচন্দন তিলকে
আজি তোমারে সাজায়ে দিল কে!
আহা বরিল তোমারে কে আজি
তা'র দুঃখ-শয়ন তেয়াজি',
তুমি ঘুচালে কাহার বিরহ-কাঁদনা।
ওগো সোনার স্বপন, সাধের সাধনা!

শান্তিনিকেতন
১৩১৬

৪

স্থির নয়নে তাকিয়ে আছি

মনের মধ্যে অনেক দূরে।

ঘোরাফেরা যায় যে ঘুরে।

গভীরধারা জলের ধারে,

আঁধার-করা বনের পারে,

সন্ধ্যামেঘে সোনার চূড়া

উঠেচে ঐ বিজনপারে

মনের মাঝে অনেক দূরে।

দিনের শেষে মলিন আলোয়

কোন নিরালা নীড়ের টানে

বিদেশবাসী হাঁসের সারি

উড়েচে সেই পারের পানে।

ঘাটের পাশে ধীর বাতাসে

উদাস ধ্বনি উধাও আসে,

বনের ঘাসে ঘুম-পাড়ানে

তান তুলেচে কোন নূপুরে

মনের মাঝে অনেক দূরে॥

নিচল জলে নীল নিকষে
সন্ধ্যাতারার পড়ল রেখা,
পারাপারের সময় গেল
খেয়াতরীর নাইক দেখা।
পশ্চিমে ঐ সৌধছাদে
স্বপ্ন লাগে ভগ্ন চাঁদে,
একলা কে যে বাজায় বাঁশি
বেদনভরা বেহাগ সুরে
মনের মাঝে অনেক দূরে।

সারাটা দিন দিনের কাজে
হয়নি কিছুই দেখাশোনা,
কেবল মাথার বোঝা বহে'
হাটের মাঝে আনাগোনা।
এখন আমায় কে দেয় আনি
কাচ-ছাড়ানো পত্রখানি ;
সন্ধ্যাদীপের আলোয় বসে'
ওগো আমার নয়ন ঝুরে
মনের মাঝে অনেক দূরে।

শিলাইদহ
১৫ই চৈত্র, ১৩১৮

৫

ভাগ্যে আমি পথ হারালেম
কাজের পথে।
নইলে অভাবিতের দেখা
ঘট্‌ত না ত কোনোমতে।
এই কোণে মোর ছিল বাসা,
এইখানে মোর যাওয়া-আসা,
সূর্য্য উঠে অস্তে মিলায়
এই রাঙা পর্ব্বতে,
প্রতিদিনের ভার বহে' যাই
এই কাজেরি পথে।

জেনেছিলেম কিছুই আমার
নাই অজ্ঞান।
যেখানে যা পাবার আছে
জানি সবার ঠিক-ঠিকানা।
ফসল নিয়ে গেচি হাটে,
ধেনুর পিছে গেচি মাঠে,
বর্ষা নদী পার করেচি
খেয়ার তরীখানা।
পথে পথে দিন গিয়েচে,
সকল পথই জানা॥

সেদিন আমি জেগেছিলেম
দেখে কারে ?
পসরা মোর পূর্ণ ছিল
চলেছিলেম রাজার দ্বারে।
সেদিন সবাই ছিল কাজে
গোঠের মাঝে মাঠের মাঝে,
ধরা সেদিন ভরা ছিল
পাকা ধানের ভারে।
ভোরের বেলা জেগেছিলেম
দেখেছিলেম কারে।

সেদিন চলে' যেতে যেতে
চমক লাগে।
মনে হ'ল বনের কোণে
হাওয়াতে কার গন্ধ জাগে।
পথের বাঁকে বটের ছায়ে
গেল কে যে চপল পায়ে
চকিতে মোর নয়ন দুটি
ভরিয়ে অরুণ রাগে।
সেদিন চলে' যেতে যেতে
মনে হ'ল কেমন লাগে॥

এত দিনের পথ হারালেম
এক নিমেষে;
জানিনে ত কোথায় এলেম
একটু পথের বাইরে এসে।
কেটেচে দিন দিনের পরে
এমনি পথে এমনি ঘরে,
জানিনে ত চলেছিলেম
কোন অচিন দেশে।
চিরকালের জানাশোনা
ঘুচল এক নিমেষে।

রইল পড়ে' পসরা মোর
পথের পাশে।
চারিদিকের আকাশ আজি
দিক্ ভোলানো হাসি হাসে।
সকল-জানার বুকের মাঝে
দাঁড়িয়েছিল অজানা যে
তাই দেখে আজ বেলা গেল
নয়ন ভরে' আসে।
পসরা মোর পাসরিলাম
রইল পথের পাশে।

শিলাইদহ
১৬ই চৈত্র, ১৩১৮

৬

আমি হাল ছাড়লে তবে
তুমি হাল ধরবে জানি।
যা হবার আপনি হবে
মিছে এই টানাটানি।
ছেড়ে দে দেগো ছেড়ে,
নীরবে যা তুই হেরে,
যেখানে আছিস বসে'
বসে' থাক ভাগ্য মানি।

আমার এই আলোগুলি
নেবে আর জ্বালিয়ে তুলি,
কেবলি ভাবি মিছে
তা নিয়েই থাকি ভুলি।
এবার এই আঁধারেতে
রহিলাম আঁচল পেতে
যখনি খুসি তোমার
নিয়ো সেই আসনখানি॥

শিলাইদা

১৭ই চৈত্র, ১৩১৮

৭

আমার এই পথ চাওয়াতেই
আনন্দ।
খেলে যায় রৌদ্র ছায়া
বর্ষা আসে
বসন্ত।
কা'রা এই সমুখ দিয়ে
আসে যায় খবর নিয়ে,
খুসি রই আপন মনে
বাতাস বহে
সুমন্দ॥

সারাদিন আঁখি মেলে
দুয়ারে র'ব একা
শুভখন হঠাৎ এলে
তখনি পাব দেখা।
ততখন ক্ষণে ক্ষণে
হাসি গাই মনে মনে,
ততখন রহি রহি
ভেসে আসে
সুগন্ধ
আমার এই পথ-চাওয়াতেই
আনন্দ।

১৭ই চৈত্র

৮

কোলাহল ত বারণ হ'ল,

এবার কথা কানে কানে।

এখন হবে প্রাণের আলাপ

কেবল মাত্র গানে গানে।

রাজার পথে লোক ছুটেচে

বেচাকেনার হাঁক উঠেচে,

আমার ছুটি অবেলাতেই

দিন-দুপুরের মধ্যখানে,

কাজের মাঝে ডাক পড়েচে

কেন যে তা কেইবা জানে।

মোর কাননে অকালে ফুল
উঠুক্ তবে মুঞ্জরিয়া।
মধ্য দিনে মৌমাছিরা
বেড়াক্ মৃদু গুঞ্জরিয়া।
মন্দ ভালোর দ্বন্দ্বে খেটে
গেচে ত দিন অনেক কেটে,
অলস বেলার খেলার সাথী
এবার আমার হৃদয় টানে।
বিনা কাজের ডাক পড়েচে
কেন যে তা কেইবা জানে?

শিলাইদা
১৮ই চৈত্র

৯

নামহারা এই নদীর পারে
ছিলে তুমি বনের ধারে
বলেনি কেউ আমাকে ;
শুধু কেবল ফুলের বাসে
মনে হ'ত খবর আসে
উঠ্‌ত হিয়া চমকে ।
শুধু যেদিন দখিন হাওয়ায়
বিরহ-গান মনকে গাওয়ায়
পরাণ-উনমাদনি,
পাতায় পাতায় কাঁপন ধরে,
দিগন্তরে ছড়িয়ে পড়ে
বনান্তরের কাঁদনি,
সেদিন আমার লাগে মনে
আছ যেন কাছের কোণে
একটুখানি আড়ালে,
জানি যেন সকল জানি,
ছুঁতে পারি বসনখানি
একটুকু হাত বাড়ালে ।

এ কি গভীর, এ কি মধুর,
এ কি হাসি পরাণ-বঁধুর
　　এ কি নীরব চাহনি,
এ কি ঘন গহন মায়া,
এ কি স্নিগ্ধ শ্যামল ছায়া
　　নয়ন-অবগাহনি।
লক্ষ তারের বিশ্ববীণা
এই নীরবে হ'য়ে লীনা
　　নিতেছে সুর কুড়ায়ে,
সপ্তলোকের আলোকধারা
এই ছায়াতে হ'ল হারা,
　　গেল গো তাপ জুড়ায়ে।
সকল রাজার রতন সজ্জা
লুকিয়ে গেল পেয়ে লজ্জা
　　বিনা সাজের কি বেশে!
আমার চির জীবনেরে
লও গো তুমি লও গো কেড়ে
　　একটি নিবিড় নিমেষে॥

শিলাইদা
১৯ চৈত্র, ১৩১৮

১০

কে গো তুমি বিদেশী !
সাপ-খেলানো বাঁশি তোমার
বাজালো সুর কি দেশী ?
নৃত্য তোমার দুলে দুলে,
কুন্তলপাশ পড়্‌চে খুলে,
কাঁপ্‌চে ধরা চরণে,
ঘুরে ঘুরে আকাশ জুড়ে
উত্তরী যে যাচ্চে উড়ে
ইন্দ্রধনুর বরণে।
আজকে ত আর ঘুমায় না কেউ,
জলের পরে লেগেচে ঢেউ,
শাখায় জাগে পাখীতে।
গোপন গুহার মাঝখানে যে
তোমার বাঁশি উঠ্‌চে বেজে
ধৈর্য্য নারি রাখিতে।

মিশিয়ে দিয়ে উঁচু নীচু
সুর ছুটেচে সবার পিছু,
বয় না কিছুই গোপনে।
ডুবিয়ে দিয়ে সূর্য্যচন্দ্রে
অন্ধকারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
পশিছে সুর স্বপনে।
নাটের লীলা হায় গো এ কি,
পুলক জাগে আজকে দেখি
নিদ্রা-ঢাকা পাতালে।
তোমার বাঁশি কেমন বাজে,
নিবিড় ঘন মেঘের মাঝে
বিদ্যুতেরে মাতালে।
লুকিয়ে র'বে কে গো মিছে,
ছুটেচে ডাক মাটির নাচে
ফুটায়ে ভুঁই চাঁপারে।
রুদ্ধঘরের ছিদ্রে ফাঁকে
শূন্য ভরে' তোমার ডাকে,
রইতে যে কেউ না পারে

কত কালের আঁধার ছেড়ে
বাহির হ'য়ে এল যে রে
হৃদয়-গুহার নাগিনী,

নত মাথায় লুটিয়ে আছে,
ডাকো তা'রে পায়ের কাছে
বাজিয়ে তোমার রাগিণী।
তোমার এই আনন্দ-নাচে
আছে গো ঠাঁই তা'রো আছে,
লও গো তা'রে ভুলায়ে ;
কালোতে তা'র পড়বে আলো,
তা'রো শোভা লাগ্‌বে ভালো,
নাচ্‌বে ফণা দুলায়ে।
মিল্‌বে সে আজ ঢেউয়ের সনে,
মিল্‌বে দখিন সমীরণে,
মিল্‌বে আলোয় আকাশে
তোমার বাঁশির বশ মেনেচে,
বিশ্বনাচের রস জেনেচে
র'বে না আর ঢাকা সে॥

শিলাইদা
২০এ চৈত্র, ১৩১৮

১১

"ওগো পথিক, দিনের শেষে
যাত্রা তোমার সে কোন্ দেশে,
এ পথ গেচে কোনখানে ?"
"কে জানে ভাই কে জানে।
চন্দ্রসূর্য্য গ্রহতারার
আলোক দিয়ে প্রাচীর ঘেরা
আছে যে এক নিকুঞ্জবন নিভৃতে,
চরাচরের হিয়ার কাছে
তারি গোপন দুয়ার আছে,
সেইখানে ভাই করব গমন নিশীথে॥"

"ওগো পথিক, দিনের শেষে
চলেচ যে এমন বেশে
কে আছে বা সেইখানে ?"
"কে জানে ভাই কে জানে।
বুকের কাছে প্রাণের সেতার
গুঞ্জরি নাম কহে যে তা'র,
শুনেছিলাম জ্যোৎস্নারাতের স্বপনে।
অপূর্ব্ব তা'র চোখের চাওয়া,
অপূর্ব্ব তা'র গায়ের হাওয়া,
অপূর্ব্ব তা'র আসা যাওয়া গোপনে॥"

"ওগো পথিক, দিনের শেষে
চলেচ যে এমন হেসে,
কিসের বিলাস সেইখানে ?"
"কে জানে ভাই কে জানে !
জগৎ-জোড়া সেই সে ঘরে
কেবল দুটি মানুষ ধরে
আর সেখানে ঠাঁই নাহি ত কিছুরি ;
সেথা মেঘের কোণে কোণে
কেবল দেখি ক্ষণে ক্ষণে
একটি নাচে আনন্দময় বিজুরী ॥"

"ওগো পথিক, দিনের শেষে
চলেচ যে, কেই বা এসে
পথ দেখাবে সেইখানে ?"
"কে জানে গো কে জানে !
শুনেচি সেই একটি বাণী
পথ দেখাবার মন্ত্রখানি
লেখা আছে সকল আকাশ মাঝে গো,
সে মন্ত্র সে প্রাণের পারে
অনাহত বীণার তারে
গভীর সুরে বাজে সকাল সাঁজে গো ॥"

শিলাইদা
২১ চৈত্র, ১৩১৮

১২

এই দুয়ারটি খোলা।

আমার খেলা খেল্‌বে বলে'

আপ্‌নি হেলায় আস চলে'

ওগো আপন-ভোলা।

ফুলের মালা দোলে গলে,

পুলক লাগে চরণতলে

কাঁচা নবীনঘাসে।

এস আমার আপন ঘরে,

বস' আমার আসন পরে,

লহ আমায় পাশে।

এম্‌নিতর লীলার বেশে

যখন তুমি দাঁড়াও এসে

দাও আমারে দোলা।

ওঠে হাসি, নয়নবারি,

তোমায় তখন চিনতে নারি

ওগো আপন-ভোলা॥

কত রাতে, কত প্রাতে,
কত গভীর বরষাতে,
কত বসন্তে,
তোমায় আমায় সকৌতুকে
কেটেচে দিন দুঃখে সুখে
কত আনন্দে।
আমার পরশ পাবে বলে'
আমায় তুমি নিলে কোলে
কেউ ত জানে না তা'
রইল আকাশ অবাক্ মানি,
করল কেবল কানাকানি
বনের লতাপাতা।
মোদের দোঁহার সেই কাহিনী
ধরেচে আজ কোন রাগিণী
ফুলের সুগন্ধে?
সেই মিলনের চাওয়া পাওয়া
গেয়ে বেড়ায় দখিন হাওয়া
কত বসন্তে॥

মাঝে মাঝে ক্ষণে ক্ষণে
যেন তোমায় হ'ল মনে
ধরা পড়েচ।

মন বলেচে "তুমি কে গো,
চেনা মানুষ চিনিনে গো,
কি বেশ ধরেচ ?"
রোজ দেখেচি দিনের কাজে
পথের মাঝে ঘরের মাঝে
করচ যাওয়া আসা,
হঠাৎ কবে এক নিমেষে
তোমার মুখের সাম্নে এসে
পাইনে খুঁজে ভাষা।
সেদিন দেখি পাখীর গানে
কি যে বলে কেউ না জানে ;—
কি গুণ করেচ !
চেনা মুখের ঘোমটা-আড়ে
অচেনা সেই উঁকি মারে,
ধরা পড়েচ ॥

শিলাইদা
২২এ চৈত্র ১৩১৮

১৩

এই যে এরা আঙিনাতে
এসেচে জুটি।
মাঠের গোরু গোঠে এসে
পেয়েচে ছুটি।
দোলে হাওয়া বেণুর শাখে
চিকণ পাতার ফাঁকে ফাঁকে,
অন্ধকারে সন্ধ্যাতারা
উঠেচে ফুটি॥

ঘরের ছেলে ঘরের মেয়ে
বসেচে মিলে।
তারি মাঝে তোমার আসন
তুমি যে নিলে।

আপন চেনা লোকের মত
নাম দিয়েছে তোমায় কত,
সে নাম ধরে' ডাকে ওরা
সন্ধ্যা নামিলে।

মানীর দ্বারে মান ওরা হায়
পায় না ত কেহ।
ওদের তরে রাজার ঘরে
বন্ধ যে গেহ।
জীর্ণ আঁচল ধূলায় পাতে
বসিয়ে তোমায় নৃত্যে মাতে,
কোন ভরসায় চরণ ধরে
মলিন ঐ দেহ॥

রাতের পাখী উঠ্‌ছে ডাকি
নদীর কিনারে।
কৃষ্ণপক্ষে চাঁদের রেখা
বনের ওপারে।
গাছে গাছে জোনাক জ্বলে,
পল্লীপথে লোক না চলে,
শূন্যমাঠে শৃগাল হাঁকে
গভীর আঁধারে।

জ্বলে নেভে কত সূর্য্য
নিখিল ভুবনে।
ভাঙে গড়ে কত প্রতাপ
রাজার ভবনে।
তারি মাঝে আঁধার রাতে
পল্লীঘরের আঙিনাতে
দীনের কণ্ঠে নামটি তোমার
উঠ্‌চে গগনে॥

শিলাইদা
২৩এ চৈত্র, ১৩১৮

১৮

অনেক কালের যাত্রা আমার
অনেক দূরের পথে,
প্রথম বাহির হয়েছিলেম
প্রথম আলোর রথে।
গ্রহে তারায় বেঁকে বেঁকে
পথের চিহ্ন এলেম এঁকে
কত যে লোক লোকান্তরের
অরণ্যে পর্ব্বতে ॥

সবার চেয়ে কাছে আসা
সবার চেয়ে দূর।
বড় কঠিন সাধনা, যার
বড় সহজ সুর।
পরের দ্বারে ফিরে, শেষে
আসে পথিক আপন দেশে,
বাহির ভুবন ঘুরে মেলে
অন্তরের ঠাকুর॥

"এই যে তুমি" এই কথাটি
বল্‌ব আমি বলে'
কত দিকেই চোখ ফেরালেম
কত পথেই চলে'।
ভরিয়ে জগৎ লক্ষ ধারায়
"আছ-আছ"র স্রোত বহে' যায়
"কই তুমি কই" এই কাঁদনের
নয়ন-জলে গলে'॥

শিলাইদা
২৪এ চৈত্র, ১৩১৮

১৫

আমি আমায় করব বড়
এই ত আমার মায়া ;—
তোমার আলো বাঁকিয়ে দিয়ে
ফেল্‌ব রঙান ছায়া।
তুমি তোমায় রাখ্‌বে দূরে,
ডাক্‌বে তা'রে নানা স্বরে,
আপ্‌নারি বিরহ তোমার
আমায় নিল কায়া॥

বিরহ গান উঠল বেজে
বিশ্বগগনময়।
কত রঙের কান্না হাসি
কত আশা ভয়।
কত যে ঢেউ ওঠে পড়ে,
কত স্বপন ভাঙে গড়ে,
আমার মাঝে রচিলে যে
আপন পরাজয়॥

এই যে তোমার আড়ালখানি
দিলে তুমি ঢাকা,
দিবানিশির তুলি দিয়ে
হাজার ছবি আঁকা ;—
এরি মাঝে আপনাকে যে
বাঁধা রেখে বস্‌লে সেজে,
সোজা কিছু রাখ্‌লে না, সব
মধুর বাঁকে বাঁকা।

আকাশ জুড়ে আজ লেগেচে
তোমার আমার মেলা।
দূরে কাছে ছড়িয়ে গেচে
তোমার আমার খেলা।
তোমার আমার গুঞ্জরণে
বাতাস মাতে কুঞ্জবনে,
তোমার আমার যাওয়া আসায়
কাটে সকল বেলা ॥

শিলাইদা
২৫এ চৈত্র, ১৩১৮

১৬

এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার
এই তরী।
তীরে বসে' যায় যে বেলা
মরি গো মরি।
ফুল ফোটানো সারা করে'
বসন্ত যে গেল সরে',
নিয়ে ঝরা ফুলের ডালা
বল কি করি॥

জল উঠেচে ছল ছলিয়ে
ঢেউ উঠেচে দুলে,
মর্ম্মরিয়ে ঝরে পাতা
বিজন তরুমূলে।
শূন্য মনে কোথায় তাকাস্‌?
সকল বাতাস সকল আকাশ
ঐ পারের ঐ বাঁশির সুরে
উঠে শিহরি॥

শিলাইদা
২৬এ চৈত্র, ১৩১৮

১৭

যেদিন ফুট্‌ল কমল কিছুই জানি নাই
আমি ছিলেম অন্যমনে।
আমার সাজিয়ে সাজি তা'রে আনি নাই
সে যে রইল সঙ্গোপনে।
মাঝে মাঝে হিয়া আকুলপ্রায়,
স্বপন দেখে' চম্‌কে উঠে' চায়,
মন্দ মধুর গন্ধ আসে হায়
কোথায় দখিন সমীরণে॥

ওগো সেই সুগন্ধে ফিরায় উদাসিয়া
আমায় দেশে দেশান্তে।
যেন সন্ধানে তা'র উঠে নিশ্বাসিয়া
ভুবন নবীন বসন্তে।
কে জানিত দূরে ত নেই সে,
আমারি গো আমারি সেই যে,
এ মাধুরী ফুটেছে হায়রে
আমার হৃদয়-উপবনে।

শিলাইদা
২৩এ চৈত্র, ১৩১৮

১৮

এখনো ঘোর ভাঙে না তোর যে

মেলে না তোর আঁখি,

কাঁটার বনে ফুল ফুটেচে রে

জানিস্‌নে তুই তা কি।

ওরে অলস জানিস্‌নে তুই তা কি?

জাগো এবার জাগো,

বেলা কাটাস্‌ না গো॥

কঠিন পথের শেষে
কোথায় অগম বিজন দেশে
ও সেই বন্ধু আমার একলা আছে গো
দিস্‌নে তা'রে ফাঁকি।
জাগো এবার জাগো
বেলা কাটাস্‌ না গো ॥

প্রখর রবির তাপে
না হয় শুষ্ক গগন কাঁপে,
না হয় দগ্ধ বালু তপ্ত আঁচলে
দিক্ চারিদিক ঢাকি।
পিপাসাতে দিক্ চারিদিক ঢাকি

মনের মাঝে চাহি
দেখ্‌রে আনন্দ কি নাহি ?
পথে পায়ে পায়ে দুখের বাঁশরী
বাজ্‌বে তোরে ডাকি'
মধুর সুরে বাজ্‌বে তোরে ডাকি।
জাগো এবার জাগো
বেলা কাটাস্‌ না গো ॥

শিলাইদা
২৭এ চৈত্র, ১৩১৮

১৯

ঝড়ে যায় উড়ে যায় গো
আমার মুখের আঁচলখানি।
ঢাকা থাকে না হায় গো
তা'রে রাখ্‌তে নারি টানি।

আমার রইল না লাজলজ্জা,
আমার ঘুচ্‌ল গো সাজসজ্জা,
তুমি দেখ্‌লে আমারে
এমন প্রলয় মাঝে আনি,
আমায় এমন মরণ হানি।

হঠাৎ আকাশ উজলি
কারে খুঁজে কে ঐ চলে।
চমক লাগায় বিজুলি
আমার আঁধার ঘরের তলে।
তবে নিশীথ গগন জুড়ে,
আমার যাক্ সকলি উড়ে,
এই দারুণ কল্লোলে
বাজুক আমার প্রাণের বাণী,
কোনো বাঁধন নাহি মানি॥

শিলাইদা
২৮এ চৈত্র, ১৩১৮

২০

তুমি একটু কেবল বসতে দিয়ো কাছে
আমায় শুধু ক্ষণেক তরে।
আজি হাতে আমার যা-কিছু কাজ আছে
আমি সাঙ্গ করব পরে।
না চাহিলে তোমার মুখপানে
হৃদয় আমার বিরাম নাহি জানে,
কাজের মাঝে ঘুরে বেড়াই যত
ফিরে কূলহারা সাগরে॥

বসন্ত আজ উচ্ছ্বাসে নিশ্বাসে
এল আমার বাতায়নে।
অলস ভ্রমর গুঞ্জরিয়া আসে
ফেরে কুঞ্জের প্রাঙ্গণে।
আজকে শুধু একান্তে আসীন
চোখে চোখে চেয়ে থাকার দিন,
আজকে জীবন-সমর্পণের গান
গাব নীরব অবসরে॥

শিলাইদা
২৯এ চৈত্র, ১৩১৮

২১

এবার তোরা আমার যাবার বেলাতে
সবাই জয়ধ্বনি কর্।
ভোরের আকাশ রাঙা হ'ল রে
আমার পথ হ'ল সুন্দর।
কি নিয়ে বা যাব সেথা
ওগো তোরা ভাবিস্‌নে তা,
শূন্য হাতেই চল্‌ব, বহিয়ে
আমার ব্যাকুল অন্তর॥

মালা পরে' যাব মিলন-বেশে
আমার পথিক-সজ্জা নয়
বাধা বিপদ আছে মাঝের দেশে
মনে রাখিনে সেই ভয়
যাত্রা যখন হবে সারা
উঠ্‌বে জ্বলে' সন্ধ্যাতারা,
পূরবীতে করুণ বাঁশরী
দ্বারে বাজ্‌বে মধুর স্বর॥

শিলাইদা
৩০এ চৈত্র, ১৩১৮

২২

কে গো অন্তরতর সে ?
আমার চেতনা আমার বেদনা
তারি সুগভীর পরশে।
আঁখিতে আমার বুলায় মন্ত্র,
বাজায় হৃদয়বীণার তন্ত্র,
কত আনন্দে জাগায় ছন্দ
কত সুখে দুখে হরষে।

সোনালি রূপালি সবুজে সুনীলে
সে এমন মায়া কেমনে গাঁথিলে,
তারি সে আড়ালে চরণ বাড়ালে
ডুবালে সে সুধাসরসে।
কত দিন আসে কত যুগ যায়
গোপনে গোপনে পরাণ ভুলায়,
নানা পরিচয়ে নানা নাম ল'য়ে
নিতি নিতি রস বরষে।

শান্তিনিকেতন
৬ই বৈশাখ, ১৩১৯

২৩

আমারে তুমি অশেষ করেচ
এমনি লীলা তব।
ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেচ
জীবন নব নব।
কত যে গিরি কত যে নদীতীরে
বেড়ালে বহি ছোট এ বাঁশিটিরে,
কত যে তান বাজালে ফিরে ফিরে
কাহারে তাহা কব॥

তোমারি ঐ অমৃতপরশে
আমার হিয়াখানি
হারাল সীমা বিপুল হরষে
উথলি উঠে বাণী।
আমার শুধু একটি মুঠি ভরি
দিতেচ দান দিবসবিভাবরী,
হ'ল না সারা কত না যুগ ধরি,
কেবলি আমি লব॥

শান্তিনিকেতন
৭ই বৈশাখ, ১৩১৯

২৪

হার-মানা হার পরাব তোমার গলে।
দূরে র'ব কত আপন বলের ছলে।
জানি আমি জানি ভেসে যাবে অভিমান,
নিবিড় ব্যথায় ফাটিয়া পড়িবে প্রাণ,
শূন্য হিয়ার বাঁশিতে বাজিবে গান,
পাষাণ তখন গলিবে নয়নজলে।

শতদল-দল খুলে যাবে থরে থরে
লুকানো র'বে না মধু চিরদিন তরে।
আকাশ জুড়িয়া চাহিবে কাহার আঁখি,
ঘরের বাহিরে নীরবে লইবে ডাকি,
কিছুই সেদিন কিছুই র'বে না বাকি
পরম মরণ লভিব চরণতলে॥

শান্তিনিকেতন
৭ই বৈশাখ,

২৫

এমনি করে' ঘুরিব দূরে বাহিরে,
আর ত গতি নাহিরে মোর নাহিরে।
যে-পথে তব রথের রেখা ধরিয়া
আপনা হ'তে কুসুম উঠে ভরিয়া,
চন্দ্র ছুটে সূর্য্য ছুটে
সে পথতলে পড়িব লুটে,
সবার পানে রহিব শুধু চাহিরে।
এমনি করে' ঘুরিব দূরে বাহিরে ॥

তোমার ছায়া পড়ে যে সরোবরে গো
কমল সেথা ধরে না, নাহি ধরে গো।
জলের ঢেউ তরল তানে
সে ছায়া ল'য়ে মাতিল গানে :
ঘিরিয়া তা'রে ফিরিব তরী বাহি রে।
যে বাঁশিখানি বাজিছে তব ভবনে
সহসা তাহা শুনিব মধু পবনে।
তাকায়ে র'ব দ্বারের পানে,
সে তানখানি লইয়া কানে
বাজায়ে বীণা বেড়াব গান গাহিরে।
এমনি করে' ঘুরিব দূরে বাহিরে।

৯ই বৈশাখ, ১৩১৯
শান্তিনিকেতন

২৬

পেয়েছি ছুটি বিদায় দেহ ভাই
সবারে আমি প্রণাম করে' যাই।
ফিরায়ে দিনু দ্বারের চাবি
রাখি না আর ঘরের দাবী,
সবার আজি প্রসাদবাণী চাই,
সবারে আমি প্রণাম করে' যাই॥

অনেক দিন ছিলাম প্রতিবেশী
দিয়েছি যত নিয়েছি তা'র বেশী।
প্রভাত হ'য়ে এসেচে রাতি,
নিবিয়া গেল কোণের বাতি,
পড়েচে ডাক চলেচি আমি তাই,
সবারে আমি প্রণাম করে' যাই॥

শান্তিনিকেতন
৯ই বৈশাখ, ১৩১৯

২৭

আজিকে এই সকালবেলাতে
বসে' আছি আমার প্রাণের
সুরটি মেলাতে।
আকাশে ঐ অরুণ রাগে
মধুর তান করুণ লাগে,
বাতাস মাতে আলো ছায়ার
মায়ার খেলাতে॥

নীলিমা এই নিলীন হ'ল
আমার চেতনায়;
সোনার আভা জড়িয়ে গেল
মনের কামনায়।
লোকান্তরের ওপার হ'তে
কে উদাসী বায়ুর স্রোতে
ভেসে বেড়ায় দিগন্তে ঐ
মেঘের ভেলাতে॥

শান্তিনিকেতন
১৩ই বৈশাখ, ১৩১৯

২৮

প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে

মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ।

তব ভুবনে তব ভবনে

মোরে আরো আরো আরো দাও স্থান।

আরো আলো আরো আলো

এই নয়নে প্রভু ঢালো।

সুরে সুরে বাঁশি পূরে

তুমি আরো আরো আরো দাও তান॥

আরো বেদনা আরো বেদনা

দাও মোরে আরো চেতনা।

দ্বার ছুটায়ে বাধা টুটায়ে

মোরে কর ত্রাণ মোরে কর ত্রাণ।

আরো প্রেমে আরো প্রেমে

মোর আমি ডুবে যাক্ নেমে

সুধাধারে আপনারে

তুমি আরো আরো আরো কর দান

লোহিত সমুদ্র

৩রা জুন, ১৯১২

২৯

তব রবিকর আসে কর বাড়াইয়া
এ আমার ধরণীতে।
সারাদিন দ্বারে রহে কেন দাঁড়াইয়া
কি আছে কি চায় নিতে।
রাতের আঁধারে ফিরে যায় যবে, জানি
নিয়ে যায় বহি মেঘ-আবরণখানি,
নয়নের জলে রচিত ব্যাকুল বাণী
খচিত ললিত গীতে॥

নব নব রূপে বরণে বরণে ভরি
বুকে লহ তুলি' সেই মেঘ-উত্তরী।
লঘু সে চপল কোমল শ্যামল কালো,
হে নিরঞ্জন, তাই বাস তা'রে ভালো,
তা'রে দিয়ে তুমি ঢাক আপনার আলো
সকরুণ ছায়াটিতে॥

The Heath
Holford Road
Hampstead
২৩এ জুন, ১৯১২

৩০

সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি
তারায় তারায় খচিত,
স্বর্ণে রত্নে শোভন লোভন জানি
বর্ণে বর্ণে রচিত।
খড়্গ তোমার আরো মনোহর লাগে
বাঁকা বিদ্যুতে আঁকা সে,
গরুড়ের পাখা রক্ত রবির রাগে
যেন গো অস্ত আকাশে।
জীবন-শেষের শেষ জাগরণসম
ঝলসিছে মহাবেদনা—
নিমেষে দহিয়া যাহা কিছু আছে মম
তীব্র ভীষণ চেতনা।
সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি
তারায় তারায় খচিত—
খড়্গ তোমার, হে দেব বজ্রপাণি,
চরম শোভায় রচিত।

The Heath
2 Holford Road
Hampstead
২৫এ জুন, ১৯১২

৩২

"কে নিবি গো কিনে আমায়, কে নিবি গো কিনে?"
পসরা মোর হেঁকে হেঁকে বেড়াই রাতে দিনে।
এমনি করে' হায়, আমার
দিন যে চলে' যায়,
মাথার পরে বোঝা আমার বিষম হ'ল দায়।
কেউ বা আসে, কেউ বা হাসে, কেউ বা কেঁদে চায়।

মধ্যদিনে বেড়াই রাজার পাষাণ-বাঁধা পথে,
মুকুট মাথে অস্ত্র হাতে রাজা এল রথে।
বল্‌লে হাতে ধরে,' "তোমায়
কিন্‌ব আমি জোরে",
জোর যা ছিল ফুরিয়ে গেল টানাটানি করে'।
মুকুট মাথে ফিরল রাজা সোনার রথে চড়ে'।

রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখ দিয়ে ফিরতেছিলেম গলি।
দুয়ার খুলে বৃদ্ধ এল হাতে টাকার থলি।
করলে বিবেচনা, বল্‌লে
"কিনব দিয়ে সোনা",
উজাড় করে' দিয়ে থলি করলে আনাগোনা।
বোঝা মাথায় নিয়ে কোথায় গেলেম অন্যমনা।

সন্ধ্যাবেলায় জ্যোৎস্না নামে মুকুলভরা গাছে।
সুন্দরী সে বেরিয়ে এল বকুলতলার কাছে।
বল্‌লে কাছে এসে, "তোমায়
কিনব আমি হেসে",
হাসিখানি চোখের জলে মিলিয়ে এল শেষে;
ধীরে ধীরে ফিরে গেল বনছায়ার দেশে।

সাগরতীরে রোদ পড়েচে, ঢেউ দিয়েচে জলে,
ঝিনুক নিয়ে খেলে শিশু বালুতটের তলে।
যেন আমায় চিনে' বল্‌লে
"অমনি নেব কিনে!"
বোঝা আমার খালাস হ'ল তখনি সেই দিনে
খেলার মুখে বিনামূলো নিল আমায় জিনে!

Vale of Health
Hampstead.
জুলাই ১৯১২

৩২

তোমারি নাম বল্‌ব নানা ছলে।
বল্‌ব একা বসে', আপন
মনের ছায়াতলে
বল্‌ব বিনা ভাষায়,
বল্‌ব বিনা আশায়,
বল্‌ব মুখের হাসি দিয়ে,
বল্‌ব চোখের জলে॥

বিনা প্রয়োজনের ডাকে
ডাক্‌ব তোমার নাম,
সেই ডাকে মোর শুধু শুধুই
পূরবে মনস্কাম
শিশু যেমন মাকে
নামের নেশায় ডাকে
বল্‌তে পারে এই সুখেতেই
মায়ের নাম সে বলে॥

16 More's Garden
Cheyne Walk, Lodon
৮ই ভাদ্র ১৩২০

৩৩

অসীম ধন ত আছে তোমার
তাহে সাধ না মেটে।
নিতে চাও তা আমার হাতে
কণায় কণায় বেঁটে।
দিয়ে তোমার রতনমণি
আমায় করলে ধনী,
এখন দ্বারে এসে ডাক
রয়েছি দ্বার এঁটে।

আমায় তুমি করবে দাতা
আপনি ভিক্ষু হবে
বিশ্বভুবন মাতল যে তাই
হাসির কলরবে।
তুমি রইবে না ঐ রথে
নামবে ধূলাপথে
যুগযুগান্ত আমার সাথে
চল্‌বে হেঁটে হেঁটে।

Cheyne Walk
৮ই ভাদ্র, ১৩২০

৩৪

এ মণিহার আমায় নাহি সাজে।
পরতে গেলে লাগে, এরে
ছিঁড়তে গেলে বাজে
কণ্ঠ যে রোধ করে
সুর ত নাহি সরে,
ঐ দিকে যে মন পড়ে' রয়
মন লাগে না কাজে।

তাই ত বসে' আছি।
এ হার তোমায় পরাই যদি
তবে আমি বাঁচি!
ফুলমালার ডোরে
বরিয়া লও মোরে
তোমার কাছে দেখাইনে মুখ
মণিমালার লাজে॥

Cheyne Walk
৮ই ভাদ্র, ১৩২০

৬৫

ভোরের বেলায় কখন এসে
পরশ করে' গেচ হেসে।
আমার ঘুমের দুয়ার ঠেলে
কে সেই খবর দিল মেলে,
জেগে দেখি আমার আঁখি
আঁখির জলে গেচে ভেসে॥

মনে হ'ল আকাশ যেন
কইল কথা কানে কানে
মনে হ'ল সকল দেহ
পূর্ণ হ'ল গানে গানে;
হৃদয় যেন শিশিরনত
ফুটল পূজার ফুলের মত,
জীবননদী কূল ছাপিয়ে
ছড়িয়ে গেল অসীমদেশে॥

Cheyne Walk
৯ই ভাদ্র

৩৬

প্রাণে খুসির তুফান উঠেচে।
ভয় ভাবনার বাধা টুটেচে।
দুঃখকে আজ কঠিন বলে'
জড়িয়ে ধরতে বুকের তলে
উধাও হ'য়ে হৃদয় ছুটেচে।
প্রাণে খুসির তুফান উঠেচে॥

হেথায় কারো ঠাঁই হবে না
মনে ছিল এই ভাবনা,
দুয়ার ভেঙে সবাই জুটেচে
যতন করে' আপ্‌নাকে যে
রেখেছিলেম ধুয়ে মেজে,
আনন্দে সে ধূলায় লুটেচে।
প্রাণে খুসির তুফান উঠেচে॥

Cheyne Walk
৯ই ভাদ্র

৩৭

জীবন যখন ছিল ফুলের মত
পাপড়ি তাহার ছিল শত শত।
বসন্তে সে হ'ত যখন দাতা
ঝরিয়ে দিত দু চারটে তা'র পাতা,
তবুও যে তা'র বাকি রইত কত

আজ বুঝি তা'র ফল ধরেচে, তাই
হাতে তাহার অধিক কিছু নাই।
হেমন্তে তা'র সময় হ'ল এবে
পূর্ণ করে' আপনাকে সে দেবে,
রসের ভারে তাই সে অবনত॥

Far Oakridge
১১ই ভাদ্র

৩৮

ভেলার মত বুকে টানি
কলমখানি
মন যে ভেসে চলে।
ঢেউয়ে ঢেউয়ে বেড়ায় দুলে
কূলে কূলে
স্রোতের কলকলে
ভবের স্রোতের কলকলে

এবার কেড়ে লও এ ভেলা
ঘুচাও খেলা
জলের কোলাহলে।
আঁধার জলের কোলাহলে।
এবার তুমি ডুবাও তা'রে
একবারে
রসের রসাতলে।
গভীর রসের রসাতলে।

S. S. City of Lahore
মধ্যধরণী সাগর
১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৩

৩৯

বাজাও আমারে বাজাও।
বাজালে যে সুরে প্রভাত আলোরে
সেই সুরে মোরে বাজাও।
যে সুর ভরিলে ভাষাভোলা গীতে
শিশুর নবীন জীবন-বাঁশিতে
জননীর মুখ-তাকানো হাসিতে,—
সেই সুরে মোরে বাজাও।

সাজাও আমারে সাজাও।
যে সাজে সাজালে ধরার ধূলিরে
সেই সাজে মোরে সাজাও।
সন্ধ্যামালতী সাজে যে ছন্দে
শুধু আপনারি গোপন গন্ধে,
যে সাজ নিজেরে ভোলে আনন্দে
সেই সাজে মোরে সাজাও।

S. S. City of Lahore
মধ্যধরণী সাগর
১৪ই সেপ্টেম্বর

৪০

জানি গো দিন যাবে

এ দিন যাবে।

একদা কোন্ বেলাশেষে

মলিন রবি করুণ হেসে

শেষ বিদায়ের চাওয়া আমার

মুখের পানে চাবে।

পথের ধারে বাজবে বেণু,

নদীর কূলে চরবে ধেনু,

আঙিনাতে খেলবে শিশু,

পাখিরা গান গাবে

তবুও দিন যাবে

এ দিন যাবে

তোমার কাছে আমার

এ মিনতি।

যাবার আগে জানি যেন

আমায় ডেকেছিল কেন

আকাশপানে নয়ন তুলে

শ্যামল বসুমতী ?

কেন নিশার নীরবতা
শুনিয়েছিল তারার কথা,
পরাণে ঢেউ তুলেছিল
কেন দিনের জ্যোতি ?
তোমার কাছে আমার এই মিনতি।

সাঙ্গ যবে হবে
ধরার পালা
যেন আমার গানের শেষে
থামতে পারি সমে এসে,
ছয়টি ঋতুর ফুলে ফলে
ভরতে পারি ডালা।
এই জীবনের আলোকেতে
পারি তোমায় দেখে যেতে,
পরিয়ে যেতে পারি তোমায়
আমার গলার মালা,
সাঙ্গ যবে হবে ধরার পালা।

S. S. City of Lahore
রোহিত সাগর
১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৩

৪১

নয় এ মধুর খেলা,
তোমায় আমায় সারাজীবন
সকাল সন্ধ্যাবেলা
নয় এ মধুর খেলা।
কতবার যে নিব্‌ল বাতি,
গর্জ্জে এল ঝড়ের রাতি,
সংসারের এই দোলায় দিলে
সংশয়েরি ঠেলা।

বারে বারে বাঁধ ভাঙিয়া
বন্যা ছুটেচে
দারুণ দিনে দিকে দিকে
কান্না উঠেচে।
ওগো রুদ্র, দুঃখে সুখে
এই কথাটি বাজ্‌ল বুকে—
তোমার প্রেমে আঘাত আছে
নাইক অবহেলা॥

রোহিত সাগর
১৯এ সেপ্টেম্বর, ১৯১৩

৪২

যদি প্রেম দিলে না প্রাণে
কেন ভোরের আকাশ ভরে' দিলে
এমন গানে গানে।
কেন তারার মালা গাঁথা,
কেন ফুলের শয়ন পাতা,
কেন দখিন হাওয়া গোপন কথা
জানায় কানে কানে ?

যদি প্রেম দিলে না প্রাণে
কেন আকাশ তবে এমন চাওয়া
চায় এ মুখের পানে ?
তবে ক্ষণে ক্ষণে কেন
আমার হৃদয় পাগল-হেন
তরী সেই সাগরে ভাসায়, যাহার
কূল সে নাহি জানে ?

শান্তিনিকেতন
২৮এ আশ্বিন, ১৩২০

৪৩

নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে ফুলবনে
তারি মধু কেন মন-মধুপে খাওয়াও না ?
নিত্যসভা বসে তোমার প্রাঙ্গণে
তোমার ভৃত্যেরে সেই সভায় কেন গাওয়াও না ?

বিশ্বকমল ফুটে চরণচুম্বনে
সে যে তোমার মুখে মুখ তুলে চায় উন্মনে,
আমার চিত্ত-কমলটিরে সেই রসে
কেন তোমার পানে নিত্য-চাওয়া চাওয়াও না ?

আকাশে ধায় রবি তারা ইন্দুতে,
তোমার বিরামহারা নদীরা ধায় সিন্ধুতে,
তেমনি করে' সুধাসাগরসন্ধানে
আমার জীবনধারা নিত্য কেন ধাওয়াও না ?

পাখীর কণ্ঠে আপনি জাগাও আনন্দ,
তুমি ফুলের বক্ষে ভরিয়া দাও সুগন্ধ ;
তেমনি করে' আমার হৃদয়ভিক্ষুরে
কেন দ্বারে তোমার নিত্যপ্রসাদ পাওয়াও না ?

শান্তিনিকেতন
২৯এ আশ্বিন

৪৪

আমার মুখের কথা তোমার
নাম দিয়ে দাও ধুয়ে,
আমার নীরবতায় তোমার
নামটি রাখ থুয়ে।
রক্তধারার ছন্দে আমার
দেহ-বীণার তার
বাজাক্ আনন্দে তোমার
নামেরি ঝঙ্কার।

ঘুমের পরে জেগে থাকুক্
নামের তারা তব।
জাগরণের ভালে আঁকুক্
অরুণলেখা নব।
সব আকাঙ্ক্ষা আশায় তোমার
নামটি জ্বলুক শিখা
সকল ভালবাসায় তোমার
নামটি রহুক্ লিখা।
সকল কাজের শেষে তোমার
নামটি উঠুক্ ফলে',
রাখ্‌ব কেঁদে হেসে তোমার
নামটি বুকে কোলে
জীবনপথে সঙ্গোপনে
র'বে নামের মধু,
তোমায় দিব মরণক্ষণে
তোমারি নাম বঁধু।

২রা কার্ত্তিক, ১৩২০
শান্তিনিকেতন

৪৫

আমার যে আসে কাছে যে যায় চলে' দূরে,
কভু পাই বা কভু না পাই যে বন্ধুরে,
যেন এই কথাটি বাজে মনের সুরে
তুমি আমার কাছে এসেচ।

কভু মধুর রসে ভরে হৃদয়খানি,
কভু নিঠুর বাজে প্রিয় মুখের বাণী,
তবু নিত্য যেন এই কথাটি জানি
তুমি স্নেহের হাসি হেসেচ॥

ওগো কভু সুখের কভু দুখের দোলে
মোর জীবন জুড়ে কত তুফান তোলে,
যেন চিত্ত আমার এই কথা না ভোলে
তুমি আমায় ভালবেসেচ।

যবে মরণ আসে নিশীথে গৃহদ্বারে,
যবে পরিচিতের কোল হ'তে সে কাড়ে
যেন জানি গো সেই অজানা পারাবারে
এক তরীতে তুমিও ভেসেচ

১লা কার্ত্তিক
শান্তিনিকেতন

৪৬

কেবল থাকিস সরে' সরে'
পাসনে কিছুই হৃদয় ভরে'।
আনন্দভাণ্ডারের থেকে
দূত যে তোরে গেল ডেকে,
কোণে বসে' দিসনে সাড়া
সব খোয়ালি এমনি করে'।

জীবনকে আজ তোল্ জাগিয়ে,
মাঝে সবার আয় আগিয়ে।
চলিসনে পথ মেপে মেপে,
আপনাকে দে নিখিল ব্যেপে,
যেটুকু দিন বাকি আছে—
কাটাসনে তা ঘুমের ঘোরে।

৫ই কার্ত্তিক
শান্তিনিকেতন

৪৭

লুকিয়ে আস আঁধার রাতে
তুমি আমার বন্ধু।
লও যে টেনে কঠিন হাতে
তুমি আমার আনন্দ॥

দুঃখরথের তুমিই রথী
তুমিই আমার বন্ধু,
তুমি সঙ্কট তুমিই ক্ষতি
তুমি আমার আনন্দ॥

শত্রু আমারে কর গো জয়
তুমিই আমার বন্ধু,
রুদ্র তুমি হে ভয়ের ভয়
তুমি আমার আনন্দ॥

বজ্র এসেছে বক্ষ চিরে
তুমিই আমার বন্ধু,
মৃত্যু লও হে বাঁধন ছিঁড়ে
তুমি আমার আনন্দ॥

১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩২০
শান্তিনিকেতন

৪৮

আমার কণ্ঠ তাঁরে ডাকে,
তখন হৃদয় কোথায় থাকে?
যখন হৃদয় আসে ফিরে
আপন নীরব নীড়ে,
আমার জীবন তখন কোন গহনে
বেড়ায় কিসের পাকে?

যখন মোহ আমায় ডাকে
তখন লজ্জা কোথায় থাকে?
যখন আনেন তমোহারী
আলোক-তরবারি
তখন পরাণ আমার কোন কোণে যে
লজ্জাতে মুখ ঢাকে?

১৫ই অগ্রহায়ণ
শান্তিনিকেতন

৪৯

আমার সকল কাঁটা ধন্য করে'
ফুট্‌বে গো ফুল ফুট্‌বে।
আমার সকল ব্যথা রঙীন হ'য়ে
গোলাপ হ'য়ে উঠ্‌বে।
আমার অনেকদিনের আকাশ চাওয়া
আস্‌বে ছুটে দখিন-হাওয়া
হৃদয় আমার আকুল করে'
সুগন্ধ ধন লুট্‌বে।

আমার লজ্জা যাবে যখন পাব
দেবার মত ধন।
যখন রূপ ধরিয়ে বিকশিবে
প্রাণের আরাধন।
আমার বন্ধু যখন রাত্রিশেষে
পরশ তা'রে করবে এসে,
ফুরিয়ে গিয়ে দলগুলি সব
চরণে তা'র লুট্‌বে॥

১৫ই অগ্রহায়ণ

৫০

গাব তোমার সুরে
দাও সে বীণাযন্ত্র।
শুনব তোমার বাণী
দাও সে অমর মন্ত্র।
করব তোমার সেবা
দাও সে পরম শক্তি,
চাইব তোমার মুখে
দাও সে অচল ভক্তি॥

সইব তোমার আঘাত
দাও সে বিপুল ধৈর্য।
বইব তোমার ধ্বজা
দাও সে অটল স্থৈর্য॥
নেব সকল বিশ্ব
দাও সে প্রবল প্রাণ,
করব আমায় নিঃস্ব
দাও সে প্রেমের দান।
যাব তোমার সাথে
দাও সে দখিন হস্ত,
লড়ব তোমার রণে
দাও সে তোমার অস্ত্র
জাগ্‌ব তোমার সত্যে
দাও সেই আহ্বান।
ছাড়ব সুখের দাস্য
দাও দাও কল্যাণ॥

৭ই পৌষ
শান্তিনিকেতন

৫১

প্রভু,   তোমার বীণা যেম্নি বাজে
আঁধার মাঝে,
অম্নি ফোটে তারা।
যেন   সেই বীণাটি গভীর তানে
আমার প্রাণে
বাজে তেম্নি ধারা॥

তখন নূতন সৃষ্টি প্রকাশ হবে
কি গৌরবে
হৃদয়-অন্ধকারে !
তখন স্তরে স্তরে আলোকরাশি
উঠ্‌বে ভাসি
চিত্ত-গগন-পারে ॥
তখন তোমারি সৌন্দর্য্যছবি
ওগো কবি
আমায় পড়বে আঁকা—
তখন বিস্ময়ে র'বে না সীমা
ঐ মহিমা
আর যাবে না ঢাকা।
তখন তোমার প্রসন্ন হাসি
পড়বে আসি
নবজীবন পরে।
তখন আনন্দ-অমৃতে তব
ধন্য হব
চিরদিনের তরে ॥

১৪ই পৌষ, ১৩২০
শান্তিনিকেতন

৫২

তোমায় আমায় মিলন হবে বলে'
　　আলোয় আকাশ ভরা।
তোমায় আমায় মিলন হবে বলে'
　　ফুল্লশ্যামল ধরা।
তোমায় আমায় মিলন হবে বলে'
রাত্রি জাগে জগৎ ল'য়ে কোলে,
ঊষা এসে পূর্ব্ব দুয়ার খোলে
　　কলকণ্ঠস্বরা॥

চল্‌চে ভেসে মিলন-আশা-তরী
　　অনাদিস্রোত বেয়ে।
কত কালের কুসুম উঠে ভরি
　　বরণডালি ছেয়ে।
তোমায় আমায় মিলন হবে বলে'
যুগে যুগে বিশ্বভুবনতলে
পরাণ আমার বধূর বেশে চলে
　　চিরস্বয়ম্বরা॥

১৫ই পৌষ, ১৩২০

৫৩

জীবন-স্রোতে ঢেউয়ের পরে
　　কোন্ আলো ঐ বেড়ায় দুলে ?
ক্ষণে ক্ষণে দেখি যে তাই
　　বসে' বসে' বিজন কূলে।
ভাসে তবু যায় না ভেসে,
হাসে আমার কাছে এসে,
দুহাত বাড়াই ঝাঁপ দিতে চাই
　　মনে করি আনব তুলে॥

শান্ত হ'রে শান্ত হ' মন
　　ধরতে গেলে দেয় না ধরা—
নয় সে মণি নয় সে মাণিক
　　নয় সে কুসুম ঝরে-পড়া।
দূরে কাছে আগে পাছে
মিলিয়ে আছে ছেয়ে আছে,
জীবন হ'তে ছানিয়ে তা'রে
　　তুল্‌তে গেলে মরবি ভুলে॥

১৫ই পৌষ, ১৩২০
শান্তিনিকেতন

৫৪

কতদিন যে তুমি আমায়
ডেকেচ নাম ধরে'—
কত জাগরণের বেলায়
কত ঘুমের ঘোরে।
পুলকে প্রাণ ছেয়ে সেদিন
উঠেচি গান গেয়ে,
দুটি আঁখি বেয়ে আমার
পড়েচে জল ঝরে'।

দূর যে সেদিন আপন হ'তে
এসেচে মোর কাছে
খুঁজি যারে, সেদিন এসে
সেই আমারে যাচে।
পাশ দিয়ে যাই চলে, যারে
যাইনে কথা বলে'
সেদিন তা'রে হঠাৎ যেন
দেখেচি চোখ ভরে'॥

২৯ মাঘ, ১৩২০
শান্তিনিকেতন

৫৫

বসন্তে আজ ধরার চিত্ত
হ'ল উতলা।
বুকের পরে দোলেরে তা'র
পরাণ-পুতলা।

আনন্দেরি ছবি দোলে
দিগন্তেরি কোলে কোলে,
গান দুলিছে, নীলাকাশের
হৃদয়-উথলা॥

আমার দুটি মুগ্ধ নয়ন
নিদ্রা ভুলেচে।
আজি আমার হৃদয়-দোলায়
কেগো দুলিছে।
দুলিয়ে দিল সুখের রাশি
লুকিয়ে ছিল যতেক হাসি
দুলিয়ে দিল জনমভরা
ব্যথা-অতলা।

মাঘীপূর্ণিমা
২৮ মাঘ, ১৩২০
শান্তিনিকেতন

৫৬

সভায় তোমার থাকি সবার শাসনে ;
আমার কণ্ঠে সেথায় সুর কেঁপে যায় ত্রাসনে।
তাকায় সকল লোকে
তখন দেখ্‌তে না পাই চোখে
কোথায় অভয় হাসি হাস আপন আসনে॥

কবে আমার এ লজ্জাভয় খসাবে,
তোমার একলা ঘরের নিরালাতে বসাবে ;
যা শোনাবার আছে
গাব ঐ চরণের কাছে,
দ্বারের আড়াল হ'তে শোনে বা কেউ না শোনে॥

শিলাইদা
১২ ফাল্গুন, ১৩২০

৫৭

যদি জানতেম আমার কিসের ব্যথা
তোমায় জানাতাম।
কে যে আমায় কাঁদায়, আমি
কি জানি তা'র নাম।
কোথায় যে হাত বাড়াই মিছে
ফিরি আমি কাহার পিছে,
সব যেন মোর বিকিয়েচে
পাইনি তাহার দাম॥

এই বেদনার ধন সে কোথায়
ভাবি জনম ধরে'।
ভুবন ভরে' আছে যেন
পাইনে জীবন ভরে'।
সুখ যারে কয় সকল জনে
বাজাই তা'রে ক্ষণে ক্ষণে,
গভীর সুরে "চাইনে, চাইনে,"
বাজে অবিশ্রাম॥

শিলাইদা
১২ ফাল্গুন

৫৮

বেসুর বাজেরে
আর কোথা নয় কেবল তোরি
আপন মাঝেরে।

মেলে না সুর এই প্রভাতে
আনন্দিত আলোর সাথে
সবারে সে আড়াল করে
মরি লাজেরে।

থামারে ঝঙ্কার!
নীরব হ'য়ে দেখ্‌রে চেয়ে
দেখ্‌রে চারিধার।

তোরি হৃদয় ফুটে আছে
মধুর হ'য়ে ফুলের গাছে,
নদীর ধারা ছুটেচে ঐ
তোরি কাজেরে॥

শিলাইদা
১৪ই ফাল্গুন, ১৩২০

৫৯

তুমি জান ওগো অন্তর্যামী
পথে পথেই মন ফিরালেম আমি।
ভাবনা আমার বাঁধ্‌লনাকো বাসা,
কেবল তাদের স্রোতের পরেই ভাসা,
তবু আমার মনে আছে আশা
তোমার পায়ে ঠেক্‌বে তা'রা স্বামী

টেনেছিল কতই কান্না হাসি,
বারে বারেই ছিন্ন হ'ল ফাঁসি।
সুধায় সবাই হতভাগ্য বলে'
"মাথা কোথায় রাখ্‌বি সন্ধ্যা হ'লে ?"
জানি জানি নাম্‌বে তোমার কোলে
আপনি যেথায় পড়বে মাথা নামি ॥

শিলাইদা
১৪ই ফাল্গুন, ১৩২০

৬০

সকল দাবী ছাড়বি যখন
পাওয়া সহজ হবে।
এই কথাটা মনকে বোঝাই,
বুঝ্‌বে অবোধ কবে?
নালিশ নিয়ে বেড়াস মেতে
পাস্‌নি যা' তা'র হিসাব পেতে,
শুনিস্‌নে তাই ভাণ্ডারেতে
ডাক পড়ে তোর যবে॥

দুঃখ নিয়ে দিন কেটে যায়
অশ্রু মুছে মুছে,
চোখের জলে দেখ্‌তে না পাস
দুঃখ গেছে ঘুচে।
সব আছে তোর ভরসা যে নেই,
দেখ্‌ চেয়ে দেখ্‌ এই যে সে এই,
মাথা তুলে হাত বাড়ালেই
অমনি পাবি তবে॥

শিলাইদা
১৫ই ফাল্গুন

৬১

রাজপুরীতে বাজায় বাঁশি
বেলাশেষের তান।
পথে চলি শুধায় পথিক,
"কি নিলি তোর দান?"
দেখাব যে সবার কাছে
এমন আমার কিবা আছে?
সঙ্গে আমাব আছে শুধু
এই ক'খানি গান॥

ঘরে আমার রাখ্‌তে যে হয়
বহু লোকের মন।
অনেক বাঁশি অনেক কাঁসি
অনেক আয়োজন।
বঁধুর কাছে আসার বেলায়
গানটি শুধু নিলেম গলায়,
তারি গলার মাল্য করে'
করব মূল্যবান॥

শিলাইদা
১৫ ফাল্গুন

৬২

মিথ্যা আমি কি সন্ধানে
যাব কাহার দ্বার ?
পথ আমারে পথ দেখাবে
এই জেনেছি সার ॥

শুধাতে যাই যারি কাছে
কথার কি তা'র অন্ত আছে ?
যতই শুনি চক্ষে ততই
লাগায় অন্ধকার ॥

পথের ধারে ছায়াতরু
নাই ত তাদের কথা,
শুধু তাদের ফুল-ফোটানো
মধুর ব্যাকুলতা ।
দিনের আলো হ'লে সারা
অন্ধকারে সন্ধ্যাতারা
শুধু প্রদীপ তুলে ধরে
কয় না কিছু আর ॥

শিলাইদা
১৫ই ফাল্গুন

৬৩

আমার ভাঙা পথের রাঙা ধূলায়
পড়েচে কার পায়ের চিহ্ন ?
তারি গলার মালা হ'তে
পাপড়ি হোথা লুটায় ছিন্ন।
এল যখন সাড়াটি নাই,
গেল চলে', জানাল তাই,
এমন করে' আমারে হায়
কেবা কাঁদায় সে জন ভিন্ন॥

তখন তরুণ ছিল অরুণ আলো,
পথটি ছিল কুসুমকীর্ণ।
বসন্ত যে রঙান বেশে
ধরায় সেদিন অবতীর্ণ।
সেদিন খবর মিল্‌ল না যে,
রইনু বসে' ঘরের মাঝে,
আজকে পথে বাহির হব
বহি আমার জীবন জীর্ণ॥

১৫ ফাল্গুন
কুষ্টিয়ার মুখে
পাল্কীপথে।

৬৪

আমার ব্যথা যখন আনে আমায়
তোমার দ্বারে
তখন আপনি এসে দ্বার খুলে দাও
ডাক তা'রে।
বাহুপাশের কাঙাল সে যে
চলেছে তাই সকল ত্যেজে,
কাঁটার পথে ধায় সে তোমার
অভিসারে;
আপনি এসে দ্বার খুলে দাও
ডাক তা'রে॥

আমার ব্যথা যখন বাজায় আমায়
বাজি সুরে
সেই গানের টানে পার না আর
রইতে দূরে।
লুটিয়ে পড়ে সে গান মম
ঝড়ের রাতের পাখী সম,
বাহির হ'য়ে এস তুমি
অন্ধকারে ;
আপনি এসে দ্বার খুলে দাও
ডাক তা'রে ॥

কলিকাতা
১৬ই ফাল্গুন, ১৩২০

৬৫

কার হাতে এই মালা তোমার পাঠালে

আজ ফাগুন দিনের সকালে।

তা'র বর্ণে তোমার নামের রেখা,

গন্ধে তোমার ছন্দ লেখা,

সেই মালাটি বেঁধেচি মোর কপালে,

আজ ফাগুন দিনের সকালে॥

গানটি তোমার চলে' এল আকাশে

আজ ফাগুন দিনের বাতাসে।

ওগো আমার নামটি তোমার সুরে

কেমন করে' দিলে জুড়ে

লুকিয়ে তুমি ঐ গানেরি আড়ালে,

আজ ফাগুন দিনের সকালে।

১৮ই ফাল্গুন, ১৩২০

শান্তিনিকেতন

৬৬

এত আলো জ্বালিয়েচ এই গগনে
কি উৎসবের লগনে।
সব আলোটি কেমন করে'
ফেল আমার মুখের পরে,
আপনি থাক আলোর পিছনে॥

প্রেমটি যেদিন জ্বালি হৃদয়-গগনে
কি উৎসবের লগনে—
সব আলো তা'র কেমন করে'
পড়ে তোমার মুখের পরে,
আপনি পড়ি আলোর পিছনে॥

২০ ফাল্গুন, ১৩২০
শান্তিনিকেতন

৬৭

যে রাতে মোর দুয়ারগুলি
ভাঙ্‌ল ঝড়ে
জানি নাই ত তুমি এলে
আমার ঘরে।
সব যে হ'য়ে গেল কালো,
নিবে গেল দীপের আলো,
আকাশপানে হাত বাড়ালেম
কাহার তরে॥

অন্ধকারে রইনু পড়ে'
স্বপন মানি।
ঝড় যে তোমার জয়ধ্বজা
তাই কি জানি
সকাল বেলায় চেয়ে দেখি,
দাঁড়িয়ে আছ তুমি এ কি
ঘরভরা মোর শূন্যতারি
বুকের পরে॥

শান্তিনিকেতন
২৩ ফাল্গুন

৬৮

শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝরে' পড়ুক ঝরে'
তোমারি সুরটি আমার মুখের পরে বুকের পরে।
পূরবের আলোর সাথে পড়ুক প্রাতে দুই নয়ানে—
নিশীথের অন্ধকারে গভীর ধারে পড়ুক প্রাণে.
নিশিদিন এই জীবনের সুখের পরে দুখের পরে
শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝরে' পড়ুক ঝরে' ॥

যে শাখায় ফুল ফোটে না ফল ধরে না একেবারে
তোমার ঐ বাদল বায়ে দিক্ জাগায়ে সেই শাখারে।
যা-কিছু জীর্ণ আমার দীর্ণ আমার জীবনহারা
তাহারি স্তরে স্তরে পড়ুক ঝরে' সুরের ধারা।
নিশিদিন এই জীবনের তৃষার পরে ভুখের পরে
শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝরে' পড়ুক ঝরে' ॥

শান্তিনিকেতন
২৫ ফাল্গুন

৬৯

তোমার কাছে শান্তি চাব না।
থাক্ না আমার দুঃখ ভাবনা।
অশান্তির এই দোলার পরে
বস বস লীলার ভরে
দোলা দিব এ মোর কামনা।

নেবে নিবুক প্রদীপ বাতাসে—
ঝড়ের কেতন উড়ুক আকাশে
বুকের কাছে ক্ষণে ক্ষণে
তোমার চরণ-পরশনে
অন্ধকারে আমার সাধনা।

শান্তিনিকেতন
২৬ ফাল্গুন, ১৩২০

৭০

দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার
গানের ওপারে।
আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি
পাইনে তোমারে।
বাতাস বহে মরি মরি
আর বেঁধে রেখো না তরী,
এস এস পার হ'য়ে মোর
হৃদয় মাঝারে।

তোমার সাথে গানের খেলা
দূরের খেলা যে,
বেদনাতে বাঁশি বাজায়
সকল বেলা যে।
কবে নিয়ে আমার বাঁশি
বাজাবে গো আপনি আসি,
আনন্দময় নীরব রাতের
নিবিড় আঁধারে॥

শান্তিনিকেতন
২৮ ফাল্গুন, ১৩২০

৭১

আমায় ভুল্‌তে দিতে নাইক তোমার ভয়।
আমার ভোলার আছে অন্ত, তোমার
প্রেমের ত নাই ক্ষয়
দূরে গিয়ে বাড়াই যে ঘুর,
সে দূর শুধু আমারি দূর—
তোমার কাছে দূর কভু দূর নয়।

আমার প্রাণের কুঁড়ি পাপ্‌ড়ি নাহি খোলে,
তোমার বসন্তবায় নাই কিগো তাই বলে'?
এই খেলাতে আমার সনে
হার মান যে ক্ষণে ক্ষণে,
হারের মাঝে আছে তোমার জয়॥

শান্তিনিকেতন
২৯ ফাল্গুন, ১৩২০

৭২

জানি নাই গো সাধন তোমার
বলে কারে।
আমি ধূলায় বসে' খেলেচি এই
তোমার দ্বারে।
অবোধ আমি ছিলেম বলে'
যেমন খুসি এলেম চলে'
ভয় করিনি তোমায় আমি
অন্ধকারে॥

তোমার জ্ঞানী আমায় বলে কঠিন
তিরস্কারে
"পথ দিয়ে তুই আসিস নি যে
ফিরে যারে।"
ফেরার পন্থা বন্ধ করে'
আপনি বাঁধ বাহুর ডোরে,
ওরা আমায় মিথ্যা ডাকে
বারে বারে॥

শান্তিনিকেতন
১লা চৈত্র, ১৩২০

৭৩

ওদের কথায় ধাঁদা লাগে
তোমার কথা আমি বুঝি।
তোমার আকাশ তোমার বাতাস
এই ত সবি সোজাসুজি।
হৃদয়-কুসুম আপনি ফোটে,
জীবন আমার ভরে' ওঠে,
দুয়ার খুলে চেয়ে দেখি
হাতের কাছে সকল পুঁজি॥

সকাল সাঁজে সুর যে বাজে
ভুবনজোড়া তোমার নাটে,
আলোর জোয়ার বেয়ে তোমার
তরী আসে আমার ঘাটে।
শুন্‌ব কি আর বুঝ্‌ব কিবা,
এই ত দেখি রাত্রিদিবা
ঘরেই তোমার আনাগোনা,
পথে কি আর তোমায় খুঁজি?

শান্তিনিকেতন
২রা চৈত্র, ১৩২০

৭৪

এই আসা-যাওয়ার খেয়ার কূলে
আমার বাড়ি।
কেউবা আসে এ পারে, কেউ
পারের ঘাটে দেয় রে পাড়ি।
পথিকেরা বাঁশি ভরে'
যে সুর আনে সঙ্গে করে'
তাই যে আমার দিবানিশি
সকল পরাণ লয় রে কাড়ি'॥

কার কথা যে জানায় তা'রা
জানিনে তা।
হেথা হ'তে কি নিয়ে বা
যায়রে সেথা।
সুরের সাথে মিশিয়ে বাণী
দুই পারের এই কানাকানি
তাই শুনে যে উদাস হিয়া
চায়রে যেতে বাসা ছাড়ি'॥

শান্তিনিকেতন
৩রা চৈত্র, ১৩২০

৭৫

জীবন আমার চল্‌চে যেমন
তেমনি ভাবে
সহজ কঠিন দ্বন্দ্বে ছন্দে
চলে' যাবে।
চলার পথে দিনে রাতে
দেখা হবে সবার সাথে,
তাদের আমি চাব, তা'রা
আমায় চাবে।

জীবন আমার পলে পলে
এমনি ভাবে
দুঃখ সুখের রঙে রঙে
রঙিয়ে যাবে।
রঙের খেলার সেই সভাতে
খেলে যে জন সবার সাথে
তা'রে আমি চাব, সেও
আমায় চাবে॥

শান্তিনিকেতন
৫ই চৈত্র, ১৩২০

৭৬

হাওয়া লাগে গানের পালে,
মাঝি আমার বস হালে।
এবার ছাড়া পেলে বাঁচে
জীবনতরী ঢেউয়ে নাচে
এই বাতাসের তালে তালে॥
মাঝি, এবার বস হালে॥

দিন গিয়েচে এল রাতি,
নাই কেহ মোর ঘাটের সাথী।
কাটো বাঁধন দাওগো ছাড়ি',
তারার আলোয় দেব পাড়ি,
সুর জেগেচে যাবার কালে॥
মাঝি এবার বস হালে॥

শান্তিনিকেতন
৬ই চৈত্র, ১৩২০

৭৭

আমারে দিই তোমার হাতে
নূতন করে' নূতন প্রাতে।
দিনে দিনেই ফুল যে ফোটে,
তেম্‌নি করেই ফুটে ওঠে
জীবন তোমার আঙিনাতে
নূতন করে' নূতন প্রাতে॥

বিচ্ছেদেরি ছন্দে লয়ে
মিলন ওঠে নবীন হ'য়ে।
আলো-অন্ধকারের তীরে,
হারায়ে পাই ফিরে ফিরে,
দেখা আমার তোমার সাথে
নূতন করে' নূতন প্রাতে॥

শান্তিনিকেতন
৭ই চৈত্র, ১৩২০

৭৮

আরো চাই যে আরো চাই গো

আরো যে চাই।

ভাণ্ডারী যে সুধা আমায়

বিতরে নাই।

সকাল বেলার আলোয় ভরা

এই যে আকাশ বসুন্ধরা

এরে আমার জীবন মাঝে

কুড়ানো চাই—

সকল ধন যে বাইরে আমার

ভিতরে নাই।

ভাণ্ডারী যে সুধা আমায়

বিতরে নাই॥

প্রাণের বীণায় আরো আঘাত
আরো যে চাই।
গুণীর পরশ পেয়ে সে যে
শিহরে নাই।
দিন রজনীর বাঁশি পূরে
যে গান বাজে অসীম সুরে,
তা'রে আমার প্রাণের তারে
বাজানো চাই।
আপন গান যে দূরে তাহার
নিয়ড়ে নাই।
গুণীর পরশ পেয়ে সে যে
শিহরে নাই॥

শান্তিনিকেতন
৮ই চৈত্র, ১৩২০।

৭৯

আমার বাণী আমার প্রাণে লাগে।
যত তোমায় ডাকি, আমার
আপন হৃদয় জাগে।
শুধু তোমায় চাওয়া,
সেও আমার পাওয়া,
তাই ত পরাণ পরাণপণে
হাত বাড়িয়ে মাগে॥

হায় অশক্ত, ভয়ে থাকিস্ পিছে।
লাগ্‌লে সেবায় অশক্তি তোর
আপনি হবে মিছে।
পথ দেখাবার তরে
যাব কাহার ঘরে,
যেমনি আমি চলি, তোমার
প্রদীপ চলে আগে॥

৯ই চৈত্র

৮০

তুমি যে চেয়ে আছ আকাশ ভরে'
নিশিদিন অনিমেষে দেখ্‌চ মোরে।
আমি চোখ এই আলোকে মেল্‌ব যবে
তোমার ওই চেয়ে দেখা সফল হবে,
এ আকাশ দিন গুণিছে তারি তরে॥

ফাগুনের কুসুম ফোটা হবে ফাঁকি,
আমার এই একটি কুঁড়ি রইলে বাকি।
সেদিনে ধন্য হবে তারার মালা,
তোমার এই লোকে লোকে প্রদীপ জ্বালা;
আমার এই আঁধারটুকু ঘুচ্‌লে পরে॥

১৩ই চৈত্র

৮১

তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি।
বুঝ্‌তে নারি কখন তুমি দাও যে ফাঁকি
ফুলের মালা দীপের আলো ধূপের ধোঁয়ার
পিছন হ'তে পাইনে সুযোগ চরণ ছোঁয়ার,
স্তবের বাণীর আড়াল টানি তোমায় ঢাকি।
তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি॥

দেখব বলে' এই আয়োজন মিথ্যা রাখি,
আছে ত মোর তৃষা-কাতর আপন আঁখি।
কাজ কি আমার মন্দিরেতে আনাগোনায়,
পাত্‌ব আসন আপন মনের একটি কোণায়;
সরল প্রাণে নীরব হ'য়ে তোমায় ডাকি।
তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি॥

শান্তিনিকেতন
১৪ই চৈত্র, ১৩২০

৮২

হে অন্তরের ধন,
তুমি যে বিরহী, তোমার শূন্য এ ভবন।
আমার ঘরে তোমায় আমি
একা রেখে দিলাম স্বামী
কোথায় যে বাহিরে আমি
ঘুরি সকল ক্ষণ॥

হে অন্তরের ধন,
এই বিরহে কাঁদে আমার নিখিল ভুবন।
তোমার বাঁশি নানা সুরে
আমায় খুঁজে বেড়ায় দূরে,
পাগল হ'ল বসন্তের এই
দখিন সমীরণ॥

১৫ই চৈত্র

৮৩

তুমি যে এসেচ মোর ভবনে
রব উঠেচে ভুবনে।
নহিলে ফুলে কিসের রং লেগেচে,
গগনে কোন গান জেগেচে
কোন পরিমল পবনে?

দিয়ে দুঃখ সুখের বেদনা
আমায় তোমার সাধনা।
আমার ব্যথায় ব্যথায় পা ফেলিয়া
এলে তোমার সুর মেলিয়া
এলে আমার জীবনে॥

শান্তিনিকেতন
১৬ই চৈত্র, ১৩২০

৮৪

আপনাকে এই জানা আমার
ফুরাবে না।
এই জানারি সঙ্গে সঙ্গে
তোমায় চেনা।
কত জনম-মরণেতে
তোমারি ঐ চরণেতে,
আপনাকে যে দেব তবু
বাড়বে দেনা॥

আমারে যে নাম্‌তে হবে
ঘাটে ঘাটে,
বারে বারে এই ভুবনের
প্রাণের হাটে।
ব্যবসা মোর তোমার সাথে
চল্‌বে বেড়ে দিনে রাতে,
আপ্‌না নিয়ে করব যতই
বেচা কেনা॥

শান্তিনিকেতন
১৭ই চৈত্র, ১৩২০

৮৫

বল ত এই বারের মত
প্রভু তোমার আঙিনাতে
তুলি আমার ফসল যত।
কিছু বা ফল গেছে ঝরে'
কিছু বা ফল আছে ধরে'
বছর হ'য়ে এল গত।
রোদের দিনে ছায়ায় বসে'
বাজায় বাঁশি রাখাল যত॥

হুকুম তুমি কর যদি
চৈত্র হাওয়ায় পাল তুলে দিই,
ঐ যে মেতে ওঠে নদী।
পার করে' নিই ভরা তরী,
মাঠের যা কাজ সারা করি
ঘরের কাজে হই গো রত।
এবার আমার মাথার বোঝা
পায়ে তোমার করি নত॥

২২এ চৈত্র

৮৬

আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে
বসন্তের এই মাতাল সমীরণে।
যাব না গো যাব না যে,
থাক্‌ব পড়ে' ঘরের মাঝে
এই নিরালায় র'ব আপন কোণে।
যাব না এই মাতাল সমীরণে॥

আমার এ ঘর বহু যতন করে'
ধুতে হবে মুছ্‌তে হবে মোরে।
আমারে যে জাগ্‌তে হবে,
কি জানি সে আস্‌বে কবে
যদি আমায় পড়ে তাহার মনে।
যাব না এই মাতাল সমীরণে॥

২২এ চৈত্র

৮৭

ওদের সাথে মেলাও, যারা
চরায় তোমার ধেনু।
তোমার নামে বাজায় যারা বেণু।
পাষাণ দিয়ে বাঁধা ঘাটে
এই যে কোলাহলের হাটে
কেন আমি কিসের লোভে এনু।

কি ডাক ডাকে বনের পাতাগুলি,
কার ইসারা তৃণের অঙ্গুলি!
প্রাণেশ আমার লীলাভরে
খেলেন প্রাণের খেলাঘরে,
পাখীর মুখে এই যে খবর পেনু॥

২৩এ চৈত্র

৮৮

সকাল সাঁজে
ধায় যে ওরা নানা কাজে।
আমি কেবল বসে' আছি
আপন মনে কাঁটা বাছি
পথের মাঝে।
সকাল সাঁজে।

এ পথ চেয়ে
সে আসে তাই আছি চেয়ে।
কতই কাঁটা বাজে পায়ে,
কতই ধূলা লাগে গায়ে,
মরি লাজে ;
সকাল সাঁজে।

২৪ চৈত্র

৮৯

তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে
মোর প্রাণে
এ আগুন ছড়িয়ে গেল
সব খানে।
যত সব মরা গাছের ডালে ডালে
নাচে আগুন তালে তালে
আকাশে হাত তোলে সে
কার পানে॥

আঁধারের তারা যত অবাক্ হ'য়ে
রয় চেয়ে,
কোথাকার পাগল হাওয়া
বয় ধেয়ে।
নিশীথের বুকের মাঝে এই যে অমল
উঠ্‌ল ফুটে স্বর্ণ-কমল,
আগুনের কি গুণ আছে
কে জানে॥

২৪ চৈত্র

৯০

আমায় বাঁধ্‌বে যদি কাজের ডোরে,
কেন পাগল কর এমন করে’ ?
বাতাস আনে কেন জানি
কোন গগনের গোপন বাণী,
পরাণখানি দেয় যে ভরে’।
পাগল করে এমন করে’।

সোনার আলো কেমনে হে
রক্তে নাচে সকল দেহে।
কারে পাঠাও ক্ষণে ক্ষণে
আমার খোলা বাতায়নে,
সকল হৃদয় লয় যে হরে’
পাগল করে এমন করে’ !

২৪ চৈত্র

৯১

কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না
শুক্‌নো ধূলো যত ?
কে জানিত আস্‌বে তুমি গো
অনাহূতের মত ?
তুমি পার হ'য়ে এসেচ মরু,
নাই যে সেথায় ছায়াতরু,
পথের দুঃখ দিলেম তোমায়,
এমন ভাগ্যহত !

তখন আলসেতে বসেছিলাম আমি
আপন ঘরের ছায়ে,
জানি নাই যে তোমায় কত ব্যথা
বাজ্‌বে পায়ে পায়ে।
তবু ঐ বেদনা আমার বুকে
বেজেছিল গোপন দুখে,
দাগ দিয়েচে মর্ম্মে আমার
গভীর হৃদয়-ক্ষত।

২৪ চৈত্র
শান্তিনিকেতন

৯২

আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে
দেখ্‌তে আমি পাইনি।
বাহিরপানে চোখ মেলেচি
হৃদয়পানেই চাইনি।
আমার সকল ভালবাসায়
সকল আঘাত সকল আশায়
তুমি ছিলে আমার কাছে,
তোমার কাছে যাইনি॥

তুমি মোর আনন্দ হ'য়ে
ছিলে আমার খেলায়।
আনন্দে তাই ভুলেছিলেম,
কেটেচে দিন হেলায়।
গোপন রহি গভীর প্রাণে
আমার দুঃখ-সুখের গানে
সুর দিয়েচ তুমি, আমি
তোমার গান ত গাইনি॥

২৫ চৈত্র
কলিকাতার পথে
রেলগাড়িতে

৯৩

প্রাণে গান নাই, মিছে তাই ফিরিনু যে
বাঁশিতে সে গান খুঁজে।
প্রেমেরে বিদায় করে' দেশান্তরে
বেলা যায় কারে পূজে?
বনে তোর লাগাস্ আগুন
তবে ফাগুন কিসের তরে,
বৃথা তোর ভস্ম পরে মরিস্ যুঝে॥

ওরে তোর নিবিয়ে দিয়ে ঘরের বাতি
কি লাগি ফিরিস্ পথে দিবারাতি
যে আলো, শত ধারায় আঁখি-তারায় পড়ে ঝরে'
তাহারে কে পায় ওরে নয়ন বুজে॥

২৬ চৈত্র
কলিকাতা

৯৪

কেন তোমরা আমায় ডাক, আমার
মন না মানে।
পাইনে সময় গানে গানে ॥
পথ আমারে শুধায় লোকে
পথ কি আমার পড়ে চোখে ?
চলি যে কোন্ দিকের পানে,
গানে গানে ॥

দাও না ছুটি, ধর ত্রুটি, নিইনে কানে।
মন ভেসে যায় গানে গানে।
আজ যে কুসুম-ফোটার বেলা,
আকাশে আজ রঙের মেলা,
সকল দিকেই আমায় টানে
গানে গানে ॥

২৭ চৈত্র
কলিকাতা

৯৫

সেদিনে আপদ আমার যাবে কেটে
পুলকে হৃদয় যেদিন পড়বে ফেটে।
তখন তোমার গন্ধ তোমার মধু
আপনি বাহির হবে বঁধু হে,
তা'রে আমার বলে' ছলে বলে
কে বল' আর রাখ্‌বে এঁটে ॥

আমারে নিখিল ভুবন দেখ্‌চে চেয়ে
রাত্রি দিবা।
আমি কি জানিনে তা'র অর্থ কিবা ?
তা'রা যে জানে আমার চিত্তকোষে
অমৃতরূপ আছে বসে' গো,
তা'রেই প্রকাশ করি, আপনি মরি,
তবে আমার দুঃখ মেটে ॥

২৭এ চৈত্র
কলিকাতা

৯৬

মোর প্রভাতের এই প্রথমখনের
কুসুমখানি,
তুমি জাগাও তা'রে ঐ নয়নের
আলোক হানি।
সে যে দিনের বেলায় করবে খেলা হাওয়ায় দুলে,
রাতের অন্ধকারে নেবে তা'রে বক্ষে তুলে ;
ওগো তখনি তো গন্ধে তাহার
ফুট্‌বে বাণী ॥

আমার বীণাখানি পড়চে আজি
সবার চোখে।
হের তারগুলি তা'র দেখ্‌চে গুণে
সকল লোকে !
ওগো কখন সে যে সভা ত্যেজে আড়াল হবে,
শুধু সুরটুকু তা'র উঠ্‌বে বেজে করুণ রবে ;
যখন তুমি তারে বুকের পরে
লবে টানি।

১লা বৈশাখ, ১৩২১
শান্তিনিকেতন

৯৭

তোমার মাঝে আমারে পথ
ভুলিয়ে দাও গো ভুলিয়ে দাও।
বাঁধা পথের বাঁধন হ'তে
টলিয়ে দাও গো দুলিয়ে দাও॥
পথের শেষে মিল্‌বে বাসা
সে কভু নয় আমার আশা,
যা পাব তা পথেই পাব
দুয়ার আমার খুলিয়ে দাও॥

কেউ বা ওরা ঘরে বসে'
ডাকে মোরে পুঁথির পাতায়।
কেউ বা ওরা অন্ধকারে
মন্ত্র পড়ে' মনকে মাতায়।
ডাক শুনেচি সকলখানে
সে-কথা যে কেউ না মানে;
সাহস আমার বাড়িয়ে দিয়ে
পরশ তোমার বুলিয়ে দাও॥

২রা বৈশাখ, ১৩২১
শান্তিনিকেতন

৯৮

তোমার আনন্দ ঐ এল দ্বারে
এল এল এল গো। (ওগো পুরবাসী)
বুকের আঁচলখানি ধূলায় পেতে
আঙিনাতে মেলো গো।
পথে সেচন কোরো গন্ধবারি
মলিন না হয় চরণ তারি,
তোমার সুন্দর ঐ এল দ্বারে
এল এল এল গো।
আকুল হৃদয়খানি সম্মুখে তা'র
ছড়িয়ে ফেলো ফেলো গো॥

তোমার সকল ধন যে ধন্য হ'ল হ'ল গো।
বিশ্বজনের কল্যাণে আজ
ঘরের দুয়ার খোলো গো।
হের রাঙা হ'ল সকল গগন,
চিত্ত হ'ল পুলক-মগন,
তোমার নিত্য আলো এল দ্বারে
এল এল এল গো।
তোমার পরাণ-প্রদীপ তুলে ধোরো
ঐ আলোতে জ্বেলো গো॥

৩রা বৈশাখ, ১৩২১
শান্তিনিকেতন

৯৯

তা'র অন্ত নাই গো যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ।
তা'র অণু-পরমাণু পেল কত আলোর সঙ্গ।
ও তা'র অন্ত নাই গো নাই।
তা'রে মোহন মন্ত্র দিয়ে গেচে কত ফুলের গন্ধ।
তা'রে দোলা দিয়ে দুলিয়ে গেচে কত ঢেউয়ের ছন্দ।
ও তা'র অন্ত নাই গো নাই।
আছে কত সুরের সোহাগ যে তা'র স্তরে স্তরে লগ্ন।
সে যে কত রঙের রসধারায় কতই হ'ল মগ্ন।
ও তা'র অন্ত নাই গো নাই।
কত শুকতারা যে স্বপ্নে তাহার রেখে গেচে স্পর্শ,
কত বসন্ত যে ঢেলেচে তায় অকারণের হর্ষ।
ও তা'র অন্ত নাই গো নাই।
সে যে প্রাণ পেয়েচে পান করে যুগ-যুগান্তরের স্তন্য,
ভুবন কত তীর্থজলের ধারায় করেচে তায় ধন্য।
ও তা'র অন্ত নাই গো নাই।
সে যে সঙ্গিনী মোর আমারে যে দিয়েচে বরমাল্য।
আমি ধন্য সে মোর অঙ্গনে যে কত প্রদীপ জ্বাল্‌ল।
ও তা'র অন্ত নাই গো নাই॥

৫ই বৈশাখ, ১৩২১
শান্তিনিকেতন

১০০

তুমি আমার আঙিনাতে ফুটিয়ে রাখ ফুল।
আমার আনাগোনার পথখানি হয় সৌরভে আকুল।
ওগো ঐ তোমারি ফুল।
ওরা আমার হৃদয়পানে মুখ তুলে যে থাকে।
ওরা তোমার মুখের ডাক নিয়ে যে আমারি নাম ডাকে।
ওগো ঐ তোমারি ফুল।
তোমার কাছে কি যে আমি সেই কথাটি হেসে
ওরা আকাশেতে ফুটিয়ে তোলে ছড়ায় দেশে দেশে।
ওগো ঐ তোমারি ফুল।
দিন কেটে যায় অন্য মনে, ওদের মুখে তবু
প্রভু তোমার মুখের সোহাগবাণী ক্লান্ত না হয় কভু।
ওগো ঐ তোমারি ফুল
প্রাতের পরে প্রাতে ওরা রাতের পরে রাতে
তোমার অন্তবিহীন যতনখানি বহন করে মাথে।
ওগো ঐ তোমারি ফুল
হাসিমুখে আমার যতন নীরব হ'য়ে যাচে।
তোমার অনেক যুগের পথ-চাওয়া যে ওদের মুখে আছে।
ওগো ঐ তোমারি ফুল

৬ই বৈশাখ, ১৩২১
শান্তিনিকেতন

১০১

আমার যে সব দিতে হবে সে ত আমি জানি।
আমার যত বিত্ত প্রভু আমার যত বাণী।
আমার চোখের চেয়ে দেখা, আমার কানের শোনা,
আমার হাতের নিপুণ সেবা, আমার আনাগোনা।
সব দিতে হবে।

আমার প্রভাত আমার সন্ধ্যা হৃদয়পত্রপুটে
গোপন থেকে তোমার পানে উঠ্‌বে ফুটে ফুটে।
এখন সে যে আমার বীণা, হতেছে তা'র বাঁধা,
বাজ্‌বে যখন তোমার হবে তোমার সুরে সাধা।
সব দিতে হবে।

তোমারি আনন্দ আমার দুঃখে সুখে ভরে'
আমার করে' নিয়ে তবে নাও যে তোমার করে'।
আমার বলে' যা পেয়েচি শুভক্ষণে যবে
তোমার করে দেব তখন তা'রা আমার হবে।
সব দিতে হবে।

৭ই বৈশাখ, ১৩২১
শান্তিনিকেতন

১০২

এই লভিনু সঙ্গ তব,
সুন্দর, হে সুন্দর !
পুণ্য হ'ল অঙ্গ মম,
ধন্য হ'ল অন্তর,
সুন্দর, হে সুন্দর ॥

আলোকে মোর চক্ষু দুটি
মুগ্ধ হ'য়ে উঠ্‌ল ফুটি,
হৃদ্‌গগনে পবন হ'ল
সৌরভেতে মন্থর,
সুন্দর, হে সুন্দর ॥

এই তোমারি পরশরাগে
চিত্ত হ'ল রঞ্জিত,
এই তোমারি মিলন-সুধা
রৈল প্রাণে সঞ্চিত।
তোমার মাঝে এমনি করে'
নবীন করি লও যে মোরে,
এই জনমে ঘটালে মোর
জন্ম-জনমান্তর,
সুন্দর, হে সুন্দর !

৩১এ বৈশাখ
রামগড়
হিমালয়

১০৩

এই ত তোমার আলোক-ধেনু
সূর্য্যতারা দলে দলে ;
কোথায় বসে' বাজাও বেণু
চরাও মহা-গগনতলে ॥
তৃণের সারি তুল্‌চে মাথা,
তরুর শাখে শ্যামল পাতা,
আলোয়-চরা ধেনু এরা
ভিড় করেচে ফুলে ফলে ॥

সকালবেলা দূরে দূরে
উড়িয়ে ধূলি কোথায় ছোটে।
আঁধার হ'লে সাঁজের সুরে
ফিরিয়ে আন আপন গোঠে।
আশা তৃষা আমার যত
ঘুরে বেড়ায় কোথায় কত,
মোর জীবনের রাখাল ওগো
ডাক দেবে কি সন্ধ্যা হ'লে ?

১০ই জ্যৈষ্ঠ
রামগড়

১০৪

চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে
নিয়ো না নিয়ো না সরায়ে
জীবন মরণ সুখ দুখ দিয়ে
বক্ষে ধরিব জড়ায়ে।
স্খলিত শিথিল কামনার ভার
বহিয়া বহিয়া ফিরি কত আর,
নিজ হাতে তুমি গেঁথে নিয়ো হার,
ফেলো না আমারে ছড়ায়ে

চিরপিপাসিত বাসনা বেদনা,
বাঁচাও তাহারে মারিয়া।
শেষ জয়ে যেন হয় সে বিজয়ী
তোমারি কাছেতে হারিয়া।
বিকায়ে বিকায়ে দীন আপনারে
পারি না ফিরিতে দুয়ারে দুয়ারে,
তোমারি করিয়া নিয়ো গো আমারে
বরণের মালা পরায়ে॥

৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১
রামগড়

১০৫

গান গেয়ে কে জানায় আপন বেদনা ?
কোন্ সে তাপস আমার মাঝে
করে তোমার সাধনা ?
চিনি নাই ত আমি তা'রে,
আঘাত করি বারে বারে,
তা'র বাণীরে হাহাকারে
ডুবায় আমার কাঁদনা ॥

তারি পূজার মালঞ্চে ফুল ফুটে যে।
দিনে রাতে চুরি করে'
এনেচি তাই লুটে যে।
তারি সাথে মিল্‌ব আসি,
এক সুরেতে বাজ্‌বে বাঁশি,
তখন তোমার দেখ্‌ব হাসি,
ভরবে আমার চেতনা ॥

৪ঠা জৈষ্ঠ্য, ১৩২১
রামগড়

১০৬

এরে ভিখারী সাজায়ে কি রঙ্গ তুমি করিলে
হাসিতে আকাশ ভরিলে ॥
পথে পথে ফেরে, দ্বারে দ্বারে যায়,
ঝুলি ভরি রাখে যাহা কিছু পায়,
কতবার তুমি পথে এসে হায়
ভিক্ষার ধন হরিলে ॥

ভেবেছিল চির-কাঙাল সে এই ভুবনে ;
কাঙাল মরণে জীবনে।
ওগো মহারাজা বড় ভয়ে ভয়ে
দিনশেষে এল তোমার আলয়ে,
আধেক আসনে তা'রে ডেকে ল'য়ে
নিজ মালা দিয়ে বরিলে ॥

৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১
রামগড়

১০৭

সন্ধ্যা হ'ল গো—

ওমা, সন্ধ্যা হ'ল বুকে ধর !

অতল কালো স্নেহের মাঝে

ডুবিয়ে আমায় স্নিগ্ধ কর ॥

ফিরিয়ে নে, মা, ফিরিয়ে নে গো,

সব যে কোথায় হারিয়েচে গো,

ছড়ানো এই জীবন, তোমার

আঁধারমাঝে হোক্ না জড় ॥

আর আমারে বাইরে তোমার

কোথাও যেন না যায় দেখা।

তোমার রাতে মিলাক আমার

জীবন-সাঁজের রশ্মিরেখা।

আমায় ঘিরি' আমায় চুমি'

কেবল তুমি, কেবল তুমি !

আমার বলে' যা আছে, মা,

তোমার করে' সকল হর' ॥

৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১

রামগড়

১০৮

আকাশে দুই হাতে প্রেম বিলায় ও কে ;
সে সুধা গড়িয়ে গেল লোকে লোকে।
গাছেরা ভরে' নিল সবুজ পাতায়,
ধরণী ধরে' নিল আপন মাথায়।
ফুলেরা সকল গায়ে নিল মেখে।
পাখীরা পাখায় তা'রে নিল এঁকে।
ছেলেরা কুড়িয়ে নিল মায়ের বুকে,
মায়েরা দেখে নিল ছেলের মুখে।
সে যে ঐ দুঃখশিখায় উঠ্‌ল জ্বলে,'
সে যে ঐ অশ্রুধারায় পড়ল গলে'।
সে যে ঐ বিদীর্ণ বীর-হৃদয় হ'তে
বহিল মরণ-রূপী জীবনস্রোতে।
সে যে ঐ ভাঙাগড়ার তালে তালে
নেচে যায় দেশে দেশে কালে কালে॥

৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১
রামগড়

১০৮

আজ ফুল ফুটেচে মোর আসনের
ডাইনে বাঁয়ে ;
পূজার ছায়ে ॥
ওরা মিশায় ওদের নীরব-কান্তি
আমার গানে,
আমার প্রাণে।
ওরা নেয় তুলে মোর কণ্ঠ ওদের
সকল গায়ে
পূজার ছায়ে ॥

হেথায় সাড়া পেল বাহির হ'ল
প্রভাত রবি
অমল-ছবি।
সে যে আলোটি তা'র মিলিয়ে দিল
আমার মাথে
প্রণাম সাথে।
সে যে আমার চোখে দেখে নিল
আমার মায়ে
পূজার ছায়ে ॥

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১
রামগড়

১১০

আমার প্রাণের মাঝে যেমন করে'
নাচে তোমার প্রাণ
আমার প্রেমে তেম্নি তোমার প্রেমের
বহুক্ না তুফান ॥

রসের বরিষণে
তা'রে মিলাও সবার সনে,
অঞ্জলি মোর ছাপিয়ে দিয়ে
হোক্ সে তোমার দান ॥

আমার হৃদয় সদা আমার মাঝে
বন্দী হ'য়ে থাকে।
তোমার আপন পাশে নিয়ে তুমি
মুক্ত কর তা'কে।
যেমন তোমার তারা,
তোমার ফুলটি যেমন ধারা,
তেম্নি তা'রে তোমার কর
যেমন তোমার গান ॥

২৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১
রামগড়

১১১

মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দরবেশে এসেচ,
তোমায় করিগো নমস্কার।
মোর অন্ধকারের অন্তরে তুমি হেসেচ,
তোমায় করিগো নমস্কার।
এই নম্র নীরব সৌম্য গভীর আকাশে
তোমায় করিগো নমস্কার।
এই শান্ত সুধীর তন্দ্রানিবিড় বাতাসে
তোমায় করিগো নমস্কার।
এই ক্লান্ত ধরার শ্যামলাঞ্চল আসনে
তোমায় করিগো নমস্কার।
এই স্তব্ধ তারার মৌন মন্ত্র ভাষণে
তোমায় করিগো নমস্কার।
এই কর্ম্ম অন্তে নিভৃত পান্থশালাতে
তোমায় করিগো নমস্কার।
এই গন্ধ গহন সন্ধ্যা কুসুম মালাতে
তোমায় করিগো নমস্কার॥

৩রা আষাঢ়, ১৩২১
কলিকাতা

গীতালি

আশীর্ব্বাদ

এই আমি একমনে সঁপিলাম তাঁরে,—
তোমরা তাঁহারি ধন আলোকে আঁধারে।
যখনি আমারি বলে' ভাবি তোমাদের
মিথ্যা দিয়ে জাল বুনি ভাবনা-ফাঁদের।

সারথি চালান যিনি জীবনের রথ
তিনিই জানেন শুধু কা'র কোথা পথ।
আমি ভাবি আমি বুঝি পথের প্রহরী,
পথ দেখাইতে গিয়ে পথ রোধ করি।

আমার প্রদীপখানি অতি ক্ষীণকায়া,
যতটুকু আলো দেয় তা'র বেশি ছায়া।
এ প্রদীপ আজ আমি ভেঙে দিনু ফেলে,
তাঁর আলো তোমাদের নিক বাহু মেলে।

সুখী হও দুঃখী হও তাহে চিন্তা নাই;
তোমরা তাঁহারি হও, আশীর্ব্বাদ তাই।

১৬ আশ্বিন ১৩২১
রাত্রি
শান্তিনিকেতন

১

দুঃখের বরষায়
চক্ষের জল যেই
নাম্‌ল
বক্ষের দরজায়
বন্ধুর রথ সেই
থাম্‌ল।

মিলনের পাত্রটি
পূর্ণ যে বিচ্ছেদে
বেদনায় ;
অর্পিনু হাতে তাঁর,
খেদ নাই, আর মোর
খেদ নাই।

বহুদিন-বঞ্চিত
অন্তরে সঞ্চিত
কি আশা,
চক্ষের নিমেষেই
মিট্‌ল সে পরশের
তিয়াষা।

এতদিনে জান্‌লেম
যে কাঁদন কাঁদলেম
সে কাহার জন্য।
ধন্য এ জাগরণ,
ধন্য এ ক্রন্দন,
ধন্য রে ধন্য॥

শ্রাবণ ১৩২১
শান্তিনিকেতন

২

তুমি আড়াল পেলে কেমনে
এই মুক্ত আলোর গগনে ?

কেমন করে' শূন্য সেজে
ঢাকা দিলে আপনাকে যে,
সেই খেলাটি উঠ্‌ল বেজে
বেদনে,
আমার প্রাণের বেদনে

আমি এই বেদনার আলোকে
তোমায় দেখ্‌ব দ্যুলোক ভূলোকে।

সকল গগন বসুন্ধরা
বন্ধুতে মোর আছে ভরা,
সেই কথাটি দেবে ধরা
জীবনে,—
আমার গভীর জীবনে ॥

৪ ভাদ্র ১৩২১
শান্তিনিকেতন

৩

বাধা দিলে বাধ্‌বে লড়াই,

মরতে হবে।

পথ জুড়ে কি করবি বড়াই ?

সরতে হবে।

লুঠ-করা ধন করে' জড়
কে হ'তে চাস্ সবার বড়,
এক নিমেষে পথের ধূলায়
পড়তে হবে।
নাড়া দিতে গিয়ে তোমায়
নড়তে হবে।

নীচে বসে' আছিস্ কে রে
কাঁদিস্ কেন ?
লজ্জাডোরে আপনাকে রে
বাঁধিস্ কেন ?

ধনী যে তুই দুঃখধনে
সেই কথাটি রাখিস্ মনে,
ধূলার পরে স্বর্গ তোমায়
গড়তে হবে।
বিনা অস্ত্র বিনা সহায়
লড়তে হবে॥

৪ ভাদ্র ১৩২১
শান্তিনিকেতন

৪

আমি হৃদয়েতে পথ কেটেচি

সেথায় চরণ পড়ে

তোমার সেথায় চরণ পড়ে।

তাই ত আমার সকল পরাণ

কাঁপ্‌চে ব্যথার ভরে গো

কাঁপ্‌চে থরথরে।

ব্যথাপথের পথিক তুমি,
চরণ চলে ব্যথা চুমি',
কাঁদন দিয়ে সাধন আমার
চিরদিনের তরে গো
চিরজীবন ধরে'।

নয়নজলের বন্যা দেখে
ভয় করিনে আর,
আমি ভয় করিনে আর।
মরণ-টানে টেনে আমায়
করিয়ে দেবে পার,
আমি তরব পারাবার।

ঝড়ের হাওয়া আকুল গানে
বইচে আজি তোমার পানে,
ডুবিয়ে তরী ঝাঁপিয়ে পড়ি
ঠেক্‌ব চরণ-পরে,
আমি বাঁচব চরণ ধরে'॥

৬ ভাদ্র ১৩২১
কলিকাতা

৫

আলো যে
যায় রে দেখা—
হৃদয়ের পূব-গগনে
সোনার রেখা।

এবারে ঘুচ্‌ল কি ভয় ?
এবারে হবে কি জয় ?
আকাশে হ'ল কি ক্ষয়
কালীর লেখা ?

কারে ঐ
যায় গো দেখা,
হৃদয়ের সাগরতীরে
দাঁড়ায়ে একা ?

ওরে তুই সকল ভুলে
চেয়ে থাক্ নয়ন তুলে,—
নীরবে চরণ-মূলে
মাথা ঠেকা॥

৬ ভাদ্র ১৩২১
কলিকাতা

৬

ও নিঠুর, আরো কি বাণ
তোমার তূণে আছে ?
তুমি মর্ম্মে আমায়
মারবে হিয়ার কাছে ?

আমি পালিয়ে থাকি, মুদে আঁখি,
আঁচল দিয়ে মুখ যে ঢাকি,
কোথাও কিছু আঘাত লাগে পাছে।

মারকে তোমার
ভয় করেচি বলে'
তাই ত এমন
হৃদয় ওঠে জ্বলে'।

যেদিন সে ভয় ঘুচে যাবে
সেদিন তোমার বাণ ফুরাবে,
মরণকে প্রাণ বরণ করে' বাঁচে ॥

৭ ভাদ্র ১৩২১
শান্তিনিকেতন

৭

সুখে আমায় রাখ্‌বে কেন,
রাখ তোমার কোলে ;
যাক্‌ না গো সুখ জ্বলে'।

যাক্‌ না পায়ের তলার মাটি
তুমি তখন ধরবে আঁটি,
তুলে নিয়ে দুলাবে ঐ
বাহু-দোলার দোলে।

যেখানে ঘর বাঁধ্‌ব আমি
আসে আসুক্‌ বান—
তুমি যদি ভাসাও মোরে
চাইনে পরিত্রাণ।

হার মেনেচি, মিটেচে ভয়,
তোমার জয় ত আমারি জয়,
ধরা দেব, তোমায় আমি
ধরব যে তাই হ'লে॥

৭ ভাদ্র ১৩২১
শান্তিনিকেতন

৮

ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর,
তোমার প্রেম তোমারে এমন করে'
করেচে নিষ্ঠুর।

তুমি বসে' থাক্‌তে দেবে না যে,
দিবানিশি তাই ত বাজে
পরাণ-মাঝে এমন কঠিন সুর।

ওগো আমার প্রাণের ঠাকুর,
তোমার লাগি দুঃখ আমার
হয় যেন মধুর।

তোমার খোঁজা খোঁজায় মোরে,
তোমার বেদন কাঁদায় ওরে,
আরাম যত করে কোথায় দূর॥

৮ ভাদ্র বুধবার
সুরুল

৯

আঘাত করে' নিল জিনে,
কাড়িলে মন দিনে দিনে।

সুখের বাধা ভেঙে ফেলে
তবে আমার প্রাণে এলে,
বারে বারে মরার মুখে
অনেক দুখে নিলেম চিনে।

তুফান দেখে ঝড়ের রাতে
ছেড়েছি হাল তোমার হাতে।

বাটের মাঝে হাটের মাঝে
কোথাও আমায় ছাড়লে না যে,
যখন আমার সব বিকালো
তখন আমায় নিলে কিনে॥

৮ ভাদ্র
সুরুল

১০

ঘুম কেন নেই তোরি চোখে ?
কে রে এমন জাগায় তোকে ?

চেয়ে আছিস্ আপন মনে
ঐ যে দূরে গগন-কোণে,
রাত্রি মেলে রাঙা নয়ন
রুদ্রদেবের দীপ্তালোকে।

রক্ত-শতদলের সাজি
সাজিয়ে কেন রাখিস্ আজি ?

কোন্ সাহসে একেবারে
শিকল খুলে দিলি দ্বারে,
জোড়-হাতে তুই ডাকিস কারে ?
প্রলয় যে তোর ঘরে ঢোকে ॥

৯ ভাদ্র
সুরুল

১১

আমি যে আর সইতে পারিনে।
সুরে বাজে মনের মাঝে গো
কথা দিয়ে কইতে পারিনে!

হৃদয়-লতা নুয়ে পড়ে
ব্যথাভরা ফুলের ভরে গো
আমি সে আর বইতে পারিনে।

আজি আমার নিবিড় অন্তরে
কি হাওয়াতে কাঁপিয়ে দিল গো
পুলক-লাগা আকুল মর্ম্মরে।

কোন্ গুণী আজ উদাস প্রাতে
মীড় দিয়েচে কোন্ বীণাতে গো,
ঘরে যে আর রইতে পারিনে॥

৯ ভাদ্র
সুরুল

১২

পথ চেয়ে যে কেটে গেল
কত দিনে রাতে।
আজ ধূলার আসন ধন্য করে'
বস্‌বে কি মোর সাথে?

রচবে তোমার মুখের ছায়া
চোখের জলে মধুর মায়া,
নীরব হ'য়ে তোমার পানে
চাইব গো জোড় হাতে।

এরা সবাই কি বলে যে
লাগে না মন আর,
আমার হৃদয় ভেঙে দিল
কি মাধুরীর ভার।

বাহুর ঘেরে তুমি মোরে
রাখ্‌বে না কি আড়াল করে',
তোমার আঁখি চাইবে না কি
আমার বেদনাতে॥

৯ ভাদ্র
সুরুল

১৩

আবার শ্রাবণ হ'য়ে এলে ফিরে,
মেঘ-আঁচলে নিলে ঘিরে।

সূর্য্য হারায়, হারায় তারা,
আঁধারে পথ হয় যে হারা,
ঢেউ দিয়েচে নদীর নীরে।

সকল আকাশ, সকল ধরা,
বর্ষণেরি বাণী-ভরা।

ঝরঝর ধারায় মাতি
বাজে আমার আঁধার রাতি,
বাজে আমার শিরে শিরে॥

১০ ভাদ্র
সুরুল

১৪

আমার সকল রসের ধারা
তোমাতে আজ হোক্ না হারা।

জীবন জুড়ে লাগুক পরশ,
ভুবন ব্যেপে জাগুক হরষ,
তোমার রূপে মরুক ডুবে
আমার দুটি আঁখিতারা।

হারিয়ে-যাওয়া মনটি আমার
ফিরিয়ে তুমি আন্‌লে আবার।

ছড়িয়ে-পড়া আশাগুলি
কুড়িয়ে তুমি লও গো তুলি',
গলার হারে দোলাও তা'রে
গাঁথা তোমার করে' সারা॥

১০ ভাদ্র
সুরুল

১৫

এই শরৎ-আলোর কমল-বনে
বাহির হ'য়ে বিহার করে
যে ছিল মোর মনে মনে।

তারি সোনার কাঁকন বাজে
আজি প্রভাত-কিরণ-মাঝে,
হাওয়ায় কাঁপে আঁচলখানি
ছড়ায় ছায়া ক্ষণে ক্ষণে।

আকুল কেশের পরিমলে
শিউলি-বনের উদাস বায়ু
পড়ে' থাকে তরুর তলে।

হৃদয়-মাঝে হৃদয় দুলায়,
বাহিরে সে ভুবন ভুলায়,
আজি সে তা'র চোখের চাওয়া
ছড়িয়ে দিল নীল গগনে.

১১ ভাদ্র
সুরুল

১৬

তোমার মোহন রূপে
কে রয় ভুলে ?
জানি না কি মরণ নাচে
নাচে গো ঐ চরণ-মূলে ?

শরৎ-আলোর আঁচল টুটে
কিসের ঝলক নেচে উঠে,
ঝড় এনেচ এলোচুলে।
মোহন রূপে কে রয় ভুলে ?

কাঁপন ধরে বাতাসেতে,
পাকা ধানের তরাস লাগে
শিউরে ওঠে ভরা ক্ষেতে।

জানি গো আজ হাহারবে
তোমার পূজা সারা হবে
নিখিল-অশ্রুসাগর-কূলে।
মোহন রূপে কে রয় ভুলে ?

১১ ভাদ্র
সুরুল

১৭

যখন তুমি বাঁধছিলে তার
সে যে বিষম ব্যথা ;
আজ বাজাও বীণা, ভুলাও ভুলাও
সকল দুখের কথা।

এতদিন যা সঙ্গোপনে
ছিল তোমার মনে মনে
আজকে আমার তারে তারে
শুনাও সে বারতা।

আর বিলম্ব কোরো না গো
ঐ যে নেবে বাতি।
দুয়ারে মোর নিশীথিনী
রয়েচে কান পাতি'।

বাঁধলে যে সুর তারায় তারায়
অন্তবিহীন অগ্নিধারায়,
সেই সুরে মোর বাজাও প্রাণে
তোমার ব্যাকুলতা॥

১১ ভাদ্র
সুরুল

১৮

আগুনের
পরশমণি
ছোঁয়াও প্রাণে।
এ জীবন
পুণ্য কর
দহন-দানে।

আমার এই
দেহখানি
তুলে ধর,
তোমার ঐ
দেবালয়ের
প্রদীপ কর,
নিশিদিন
আলোক-শিখা
জ্বলুক গানে।
আগুনের
পরশমণি
ছোঁয়াও প্রাণে।

আঁধারের
গায়ে গায়ে
পরশ তব
সারা রাত
ফোটাক তারা
নব নব।

নয়নের
দৃষ্টি হ'তে
ঘুচ্‌বে কালো,
যেখানে
পড়বে সেথায়
দেখ্‌বে আলো,
ব্যথা মোর
উঠ্‌বে জ্বলে'
ঊর্দ্ধ-পানে।
আগুনের
পরশমণি
ছোঁয়াও প্রাণে॥

১১ ভাদ্র
সুরুল

১৯

হৃদয় আমার প্রকাশ হ'ল
অনন্ত আকাশে।
বেদন-বাঁশি উঠ্‌ল বেজে
বাতাসে বাতাসে।

এই যে আলোর আকুলতা
আমারি এ আপন কথা,
উদাস হ'য়ে প্রাণে আমার
আবার ফিরে আসে।

বাইরে তুমি নানা বেশে
ফের নানান্ ছলে ;
জানিনে ত আমার মালা
দিয়েচি কার গলে।

আজ কি দেখি পরাণ-মাঝে,
তোমার গলায় সব মালা যে,
সব নিয়ে শেষ ধরা দিলে
গভীর সর্ব্বনাশে।
সেই কথা আজ প্রকাশ হ'ল
অনন্ত আকাশে॥

১৩ ভাদ্র
সুরুল

২০

এক হাতে ওর কৃপাণ আছে
আর এক হাতে হার।
ও যে ভেঙেচে তোর দ্বার।

আসেনি ও ভিক্ষা নিতে,
লড়াই করে’ নেবে জিতে
পরাণটি তোমার।
ও যে ভেঙেচে তোর দ্বার।

মরণেরি পথ দিয়ে ঐ
আস্‌চে জীবন-মাঝে,
ও যে আস্‌চে বীরের সাজে।

আধেক নিয়ে ফিরবেনারে,
যা আছে সব একেবারে
করবে অধিকার।
ও যে ভেঙেচে তোর দ্বার॥

১৪ ভাদ্র
সুরুল

২১

পথ দিয়ে কে যায় গো চলে'
ডাক দিয়ে সে যায়।
আমার ঘরে থাকাই দায়।

পথের হাওয়ায় কি সুর বাজে,
বাজে আমার বুকের মাঝে,
বাজে বেদনায়।
আমার ঘরে থাকাই দায়।

পূর্ণিমাতে সাগর হ'তে
ছুটে এল বান,
আমার লাগ্‌ল প্রাণে টান।

আপন মনে মেলে' আঁখি
আর কেন বা পড়ে' থাকি
কিসের ভাবনায়?
আমার ঘরে থাকাই দায়॥

১৫ ভাদ্র
'সুরুল

২২

এই যে কালো মাটির বাসা
শ্যামল সুখের ধরা—
এইখানেতে আঁধার আলোয়
স্বপন-মাঝে চরা।

এরি গোপন হৃদয়-পরে
ব্যথার স্বর্গ বিরাজ করে
দুঃখে-আলো-করা।

বিরহী তোর সেইখানে যে
একলা বসে' থাকে—
হৃদয় তাহার ক্ষণে ক্ষণে
নামটি তোমার ডাকে।

দুঃখে যখন মিলন হবে
আনন্দলোক মিল্‌বে তবে
সুধায় সুধায় ভরা॥

১৬ ভাদ্র সন্ধ্যা
সুরুল

২৩

যে থাকে থাক্ না দ্বারে,
যে যাবি যা না পারে।

যদি ঐ ভোরের পাখী
তোরি নাম যায়রে ডাকি',
একা তুই চলে যা রে

কুঁড়ি চায়, আঁধার রাতে
শিশিরের রসে মাতে।

ফোটা ফুল চায় না নিশা,
প্রাণে তা'র আলোর তৃষা,
কাঁদে সে অন্ধকারে॥

১৭ ভাদ্র সকাল
সুরুল

২৪

তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে
টুকরো করে' কাছি
ডুব্‌তে রাজি আছি
আমি ডুব্‌তে রাজি আছি।

সকাল আমার গেল মিছে,
বিকেল যে যায় তারি পিছে ;
রেখো না আর, বেঁধো না আর
কূলের কাছাকাছি।

মাঝি লাগি আছি জাগি
সকল রাত্রিবেলা,
ঢেউগুলো যে আমায় নিয়ে
করে কেবল খেলা।

ঝড়কে আমি করব মিতে,
ডরব না তা'র ভ্রূকুটিতে ;
দাও ছেড়ে দাও ওগো, আমি
তুফান পেলে বাঁচি ॥

১৭ ভাদ্র বিকাল
শান্তিনিকেতন

২৫

শুধু তোমার বাণী নয়গো

হে বন্ধু হে প্রিয়,

মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার

পরশখানি দিয়ো।

সারা পথের ক্লান্তি আমার

সারা দিনের তৃষা

কেমন করে' মেটাব যে

খুঁজে না পাই দিশা।

এ আঁধার যে পূর্ণ তোমায়
সেই কথা বলিয়ো।
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার
পরশখানি দিয়ো।

হৃদয় আমার চায় যে দিতে,
কেবল নিতে নয়,
ব'য়ে ব'য়ে বেড়ায় সে তা'র
যা কিছু সঞ্চয়।

হাতখানি ঐ বাড়িয়ে আন,
দাও গো আমার হাতে,
ধরব তা'রে, ভরব তা'রে,
রাখ্‌ব তা'রে সাথে,—
একলা পথের চলা আমার
করব রমণীয়।
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার
পরশখানি দিয়ো॥

১৮ ভাদ্র
শান্তিনিকেতন

২৬

শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি
ছড়িয়ে গেল ছাপিয়ে মোহন অঙ্গুলি।

শরৎ তোমার শিশির-ধোওয়া কুন্তলে,
বনের-পথে-লুটিয়ে-পড়া অঞ্চলে
আজ প্রভাতের হৃদয় ওঠে চঞ্চলি'।

মাণিক-গাঁথা ঐ যে তোমার কঙ্কণে
ঝিলিক লাগায় তোমার শ্যামল অঙ্গনে।

কুঞ্জ-ছায়া গুঞ্জরণের সঙ্গীতে
ওড়না ওড়ায় এ কি নাচের ভঙ্গীতে,
শিউলি-বনের বুক যে ওঠে আন্দোলি'॥

১৯ ভাদ্র
সুরুল

২৭

ও আমার মন যখন জাগ্‌লি না রে
তোর মনের মানুষ এল দ্বারে।
তা'র চলে' যাবার শব্দ শুনে
ভাঙ্‌ল রে ঘুম—
ও তোর ভাঙ্‌ল রে ঘুম অন্ধকারে।

মাটির পরে আঁচল পাতি'
একলা কাটে নিশীথ রাতি,
তা'র বাঁশি বাজে আঁধার মাঝে
দেখি না যে চক্ষে তা'রে।

ওরে তুই যাহারে দিলি ফাঁকি
খুঁজে তা'রে পায় কি আঁখি ?
এখন পথে ফিরে পাবি কি রে
ঘরের বাহির করলি যারে ?

২১ ভাদ্র
সুরুল

২৮

মোর মরণে তোমার হবে জয়।
মোর জীবনে তোমার পরিচয়।

মোর দুঃখ যে রাঙা শতদল
আজ ঘিরিল তোমার পদতল,
মোর আনন্দ সে যে মণিহার
মুকুটে তোমার বাঁধা রয়।

মোর ত্যাগে যে তোমার হবে জয়।
মোর প্রেমে যে তোমার পরিচয়।

মোর ধৈর্য্য তোমার রাজপথ
সে যে লঙ্ঘিবে বন-পর্ব্বত,
মোর বীর্য্য তোমার জয়রথ
তোমারি পতাকা শিরে বয়॥

২২ ভাদ্র
সুরুল

২৯

এবার আমায় ডাক্‌লে দূরে
সাগর-পারের গোপন পুরে।

বোঝা আমার নামিয়েছি যে,
সঙ্গে আমায় নাও গো নিজে,
স্তব্ধ রাতের স্নিগ্ধ-সুধা
পান করাবে তৃষ্ণাতুরে।

আমার সন্ধ্যাফুলের মধু
এবার যে ভোগ করবে বঁধু।

তারার আলোর প্রদীপখানি
প্রাণে আমার জ্বাল্‌বে আনি,
আমার যত কথা ছিল
ভেসে যাবে তোমার সুরে

২৩ ভাদ্র
সুরুল

৩০

নাই কি রে তীর, নাই কি রে তোর তরী ?
কেবলি কি ঢেউ আছে তোর ?
হায়রে লাজে মরি !

ঝড়ের কালো মেঘের পানে
তাকিয়ে আছিস্ আকুল প্রাণে,
দেখিস্ নে কি কাণ্ডারী তোর
হাসে যে হাল ধরি' ।

নিশার স্বপ্ন তোর
সেই কি এতই সত্য হ'ল,
ঘুচ্‌ল না তা'র ঘোর ?

প্রভাত আসে তোমার পানে
আলোর রথে, আশার গানে ;
সে খবর কি দেয়নি কানে
আঁধার বিভাবরী ?

২৪ ভাদ্র
শান্তিনিকেতন

৩১

নাই বা ডাকো, রইব তোমার দ্বারে ;
মুখ ফিরালে ফির্‌ব না এইবারে।

বস্‌ব তোমার পথের ধূলায় পরে
এড়িয়ে আমায় চল্‌বে কেমন করে' ?
তোমার তরে যেজন গাঁথে মালা
গানের কুসুম যুগিয়ে দেব তা'রে।

রইব তোমার ফসল-ক্ষেতের কাছে
যেথায় তোমার পায়ের চিহ্ন আছে।

জেগে র'ব গভীর উপবাসে
অন্ন তোমার আপনি যেথায় আসে।
যেথায় তুমি লুকিয়ে প্রদীপ জ্বাল
বসে র'ব সেথায় অন্ধকারে ॥

২৬ ভাদ্র
সুরুল হইতে শান্তিনিকেতনের পথে

৩২

না বাঁচাবে আমায় যদি
মারবে কেন তবে ?
কিসের তরে এই আয়োজন
এমন কলরবে ?

অগ্নিবাণে তূণ যে ভরা,
চরণভরে কাঁপে ধরা,
জীবনদাতা মেতেচ যে
মরণ-মহোৎসবে।

বক্ষ আমার এমন করে'
বিদীর্ণ যে কর
উৎস যদি না বাহিরায়
হবে কেমনতর ?

এই যে আমার ব্যথার খনি
জোগাবে ঐ মুকুটমণি,—
মরণ-দুখে জাগাব মোর
জীবন-বল্লভে ॥

২৬ ভাদ্র
সুরুল হইতে শান্তিনিকেতনের পথে

৩৩

যেতে যেতে একলা পথে
নিবেচে মোর বাতি।
ঝড় এসেচে, ওরে, এবার
ঝড়কে পেলেম সাথী।

আকাশ-কোণে সর্ব্বনেশে
ক্ষণে ক্ষণে উঠ্‌চে হেসে,
প্রলয় আমার কেশে বেশে
করচে মাতামাতি।

যে পথ দিয়ে যেতেছিলেম
ভুলিয়ে দিল তা'রে,
আবার কোথা চল্‌তে হবে
গভীর অন্ধকারে।

বুঝি বা এই বজ্ররবে
নূতন পথের বার্ত্তা কবে,
কোন্ পুরীতে গিয়ে তবে
প্রভাত হবে রাতি॥

২৬ ভাদ্র অপরাহ্ণ
সুরুল

৩৪

মালা-হ'তে-খসে-পড়া ফুলের একটি দল
মাথায় আমার ধরতে দাও গো ধরতে দাও,
ঐ মাধুরী-সরোবরের নাই যে কোথাও তল
হোথায় আমায় ডুব্‌তে দাও গো মরতে দাও।

দাও গো মুছে আমার ভালে অপমানের লিখা,
নিভৃতে আজ বন্ধু তোমার আপন হাতের টীকা
ললাটে মোর পরতে দাও গো পরতে দাও।

বহুক তোমার ঝড়ের হাওয়া আমার ফুলবনে,
শুক্‌নো পাতা মলিন কুসুম ঝরতে দাও।
পথ জুড়ে যা পড়ে' আছে আমার এ জীবনে
দাও গো তাদের সরতে দাও গো সরতে দাও

তোমার মহাভাণ্ডারেতে আছে অনেক ধন,
কুড়িয়ে বেড়াই মুঠা ভরে', ভরে না তায় মন,
অন্তরেতে জীবন আমার ভরতে দাও॥

২৭ ভাদ্র
সুরুল

৩৫

কোন্ বারতা পাঠালে মোর পরাণে
আজি তোমার অরুণ আলোয় কে জানে ?

বাণী তোমার ধরে না মোর গগনে,
পাতায় পাতায় কাঁপে হৃদয়-কাননে,
বাণী তোমার ফোটে লতা-বিতানে।

তোমার বাণী বাতাসে সুর লাগালো,
নদীতে মোর ঢেউয়ের মাতন জাগালো।

তরী আমার আজ প্রভাতের আলোকে
এই বাতাসে পাল তুলে দিক পুলকে,
তোমার পানে যাক সে ভেসে উজানে॥

২৮ ভাদ্র
সুরুল

9—58

৩৬

যেতে যেতে চায় না যেতে
ফিরে ফিরে চায়,
সবাই মিলে পথে চলা
হ'ল আমার দায়।

দুয়ার ধরে' দাঁড়িয়ে থাকে,
দেয় না সাড়া হাজার ডাকে ;
বাঁধন এদের সাধন-ধন,
ছিঁড়তে যে ভয় পায়

আবেশ-ভরে ধূলায় পড়ে'
কতই করে ছল,
যখন বেলা যাবে চলে'
ফেল্‌বে আঁখিজল।
নাই ভরসা, নাই যে সাহস,
চিত্ত অবশ, চরণ অলস,
লতার মত জড়িয়ে ধরে
আপন বেদনায়॥

২৮ ভাদ্র
শান্তিনিকেতন

৩৭

সেই ত আমি চাই!
সাধনা যে শেষ হবে মোর
সে ভাব্‌না ত নাই।

ফলের তরে নয় ত খোঁজা,
কে বইবে সে বিষম বোঝা,
যেই ফলে ফল ধূলায় ফেলে'
আবার ফুল ফুটাই।

এম্‌নি করে' মোর জীবনে
অসীম ব্যাকুলতা,
নিত্য নূতন সাধনাতে
নিত্য নূতন ব্যথা।

পেলেই সে ত ফুরিয়ে ফেলি,
আবার আমি দু'হাত মেলি;
নিত্য দেওয়া ফুরায় না যে
নিত্য নেওয়া তাই॥

২৮ ভাদ্র
শান্তিনিকেতন

৩৮

শেষ নাহি যে,
শেষ কথা কে বল্‌বে ?
আঘাত হ'য়ে দেখা দিল,
আগুন হ'য়ে জ্বল্‌বে।

সাঙ্গ হ'লে মেঘের পালা
সুরু হবে বৃষ্টি ঢালা,
বরফ জমা সারা হ'লে
নদী হ'য়ে গল্‌বে।

ফুরায় যা, তা
ফুরায় শুধু চোখে,
অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার
যায় চলে' আলোকে।

পুরাতনের হৃদয় টুটে
আপনি নূতন উঠ্‌বে ফুটে,
জীবনে ফুল ফোটা হ'লে
মরণে ফল ফল্‌বে॥

২৮ ভাদ্র অপরাহ্ণ
সুরুল

গীতালি

৩৭

না রে তোদের ফিরতে দেব না রে—
মরণ যেথায় লুকিয়ে বেড়ায়
সেই আরামের দ্বারে।

চল্‌তে হবে সাম্‌নে সোজা,
ফেল্‌তে হবে মিথ্যা বোঝা,
টল্‌তে আমি দেব না যে
আপন ব্যথা-ভারে।
না রে তোদের রইতে দেব না রে—
দিবানিশি ধূলাখেলায়
খেলাঘরের দ্বারে।
চল্‌তে হবে আশার গানে
প্রভাত-আলোর উদয়-পানে;
নিমেষ-তরে পাবিনেকো
বস্‌তে পথের ধারে।
না রে তোদের থাম্‌তে দেব না রে—
কানাকানি করতে কেবল
কোণের ঘরের দ্বারে।
ঐ যে নীরব বজ্রবাণী
আগুন বুকে দিচ্ছে হানি',
সইতে হবে বইতে হবে
মান্‌তে হবে তা'রে॥

২৮ ভাদ্র অপরাহ্ণ
সুরুল

৪০

মনকে হোথায় বসিয়ে রাখিস্‌নে।

তোর ফাটল-ধরা ভাঙা ঘরে

ধূলার পরে পড়ে' থাকিস্‌নে।

ওরে অবশ, ওরে ক্ষেপা,

মাটির পরে ফেল্‌বি রে পা,

তা'রে নিয়ে গায়ে মাখিস্‌নে।

ঐ প্রদীপ আর জ্বালিয়ে রাখিস্‌নে-

রাত্রি যে তোর ভোর হয়েচে

স্বপন নিয়ে পড়ে' থাকিস্‌নে।

উঠ্‌ল এবার প্রভাত-রবি,

খোলা পথে বাহির হবি,

মিথ্যা ধূলায় আকাশ ঢাকিস্‌নে

২৯ ভাদ্র

সুরুল

৪১

এতটুকু আঁধার যদি
লুকিয়ে রাখিস বুকের পরে
আকাশভরা সূর্য্যতারা
মিথ্যা হবে তোদের তরে।

শিশির-ধোওয়া এই বাতাসে
হাত বুলাল ঘাসে ঘাসে,
ব্যর্থ হবে কেবল যে সে
তোদের ছোট কোণের ঘরে।

মুগ্ধ ওরে স্বপ্নঘোরে
যদি প্রাণের আসনকোণে
ধূলায়-গড়া দেবতারে
লুকিয়ে রাখিস আপন মনে—

চিরদিনের প্রভু তবে
তোদের প্রাণে বিফল হবে,
বাইরে সে যে দাঁড়িয়ে র'বে
কত না যুগ-যুগান্তরে॥

৩০ ভাদ্র
সুরুল

৪২

কাঁচা ধানের ক্ষেতে যেমন
শ্যামল সুধা ঢেলেচ গো
তেমনি করে' আমার প্রাণে
নিবিড় শোভা মেলেচ গো।

যেমন করে' কালো মেঘে
তোমার আভা গেচে লেগে,
তেমনি করে' হৃদয়ে মোর
চরণ তোমার ফেলেচ গো।

বসন্তে এই বনের বায়ে
যেমন তুমি ঢাল ব্যথা,
তেমনি করে' অন্তরে মোর
ছাপিয়ে ওঠে ব্যাকুলতা।

দিয়ে তোমার রুদ্র আলো
বজ্র আগুন যেমন জ্বালো,
তেমনি তোমার আপন তাপে
প্রাণে আগুন জ্বেলেচ গো॥

৩১ ভাদ্র
সুরুল

৪৩

দুঃখ যদি না পাবে ত
　　দুঃখ তোমার ঘুচ্‌বে কবে ?
বিষকে বিষের দাহ দিয়ে
　　দহন করে' মারতে হবে ।

জ্বল্‌তে দে তোর আগুনটারে,
ভয় কিছু না করিস তা'রে,
ছাই হ'য়ে সে নিভ্‌বে যখন
　　জ্বল্‌বে না আর কভু তবে ।

এড়িয়ে তাঁরে পালাস না রে
　　ধরা দিতে হোস না কাতর ।
দীর্ঘ পথে ছুটে কেবল
　　দীর্ঘ করিস দুঃখটা তোর ।

মরতে মরতে মরণটারে
শেষ করে' দে একেবারে,
তা'র পরে সেই জীবন এসে
　　আপন আসন আপনি লবে ॥

১ আশ্বিন
শান্তিনিকেতন

৪৪

না রে না রে হবে না তোর স্বর্গসাধন—
সেখানে যে মধুর বেশে
ফাঁদ পেতে রয় সুখের বাঁধন।

ভেবেছিলি দিনের শেষে
তপ্ত পথের প্রান্তে এসে
সোনার মেঘে মিলিয়ে যাবে
সারাদিনের সকল কাঁদন।

না রে না রে হবে না তোর হবে না তা—
সন্ধ্যাতারার হাসির নীচে
হবে না তোর শয়ন পাতা

পথিক বঁধু পাগল করে'
পথে বাহির করবে তোরে,
হৃদয় যে তোর ফেটে গিয়ে
ফুটবে তবে তাঁর আরাধন

১ আশ্বিন
শান্তিনিকেতন

৪৫

তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে আকাশ ঝরবে,
আমার প্রাণে নইলে সে কি কোথাও ধরবে ?

এই যে আলো সূর্য্যে গ্রহে তারায়
ঝরে' পড়ে শত লক্ষ ধারায়,
পূর্ণ হবে এ প্রাণ যখন ভরবে।

তোমার ফুলে যে রং ঘুমের মত লাগ্‌ল
আমার মনে লেগে তবে সে যে জাগ্‌ল।

যে প্রেম কাঁপায় বিশ্ববীণায় পুলকে
সঙ্গীতে সে উঠ্‌বে ভেসে পলকে
যেদিন আমার সকল হৃদয় হরবে

১ আশ্বিন সন্ধ্যা
সুরুল

৪৬

না গো এই যে ধূলা, আমার না এ।
তোমার ধূলার ধরার পরে
উড়িয়ে যাব সন্ধ্যাবায়ে।

দিয়ে মাটি আগুন জ্বালি'
রচলে দেহ পূজার থালি,
শেষ আরতি সারা করে'
ভেঙে যাব তোমার পায়ে।

ফুল যা ছিল পূজার তরে,
যেতে পথে ডালি হ'তে
অনেক যে তা'র গেচে পড়ে'।

কত প্রদীপ এই থালাতে
সাজিয়েছিলে আপন হাতে,
কত যে তা'র নিব্‌ল হাওয়ায়
পৌঁছল না চরণছায়ে॥

২ আশ্বিন প্রভাত
সুরুল

৪৭

এই কথাটা ধরে' রাখিস
　　মুক্তি তোরে পেতেই হবে।
যে পথ গেচে পারের পানে
　　সে পথে তোর যেতেই হবে।

অভয় মনে কণ্ঠ ছাড়ি'
　　গান গেয়ে তুই দিবি পাড়ি,
খুসি হ'য়ে ঝড়ের হাওয়ায়
　　ঢেউ যে তোরে খেতেই হবে

পাকের ঘোরে ঘোরায় যদি
　　ছুটি তোরে পেতেই হবে।
চলার পথে কাঁটা থাকে
　　দলে' তোমায় যেতেই হবে।

সুখের আশা আঁকড়ে ল'য়ে
মরিস্‌নে তুই ভয়ে ভয়ে,
জীবনকে তোর ভরে' নিতে
　　মরণ-আঘাত খেতেই হবে॥

২ আশ্বিন অপরাহ্ন
　সুরুল

৪৮

লক্ষ্মী যখন আস্‌বে তখন
কোথায় তা'রে দিবি রে ঠাঁই ?
দেখ্‌রে চেয়ে আপন পানে
পদ্মটি নাই পদ্মটি নাই।

ফিরচে কেঁদে প্রভাত-বাতাস,
আলোক যে তোর ম্লান হতাশ,
মুখে চেয়ে আকাশ তোরে
শুধায় আজি নীরবে তাই।

কত গোপন আশা নিয়ে
কোন্ সে গহন রাত্রি শেষে
অগাধ জলের তলা হ'তে
অমল কুঁড়ি উঠ্‌ল ভেসে।

হ'ল না তা'র ফুটে উঠা,
কখন ভেঙে পড়ল বোঁটা,
মর্ত্ত্য-কাছে স্বর্গ যা চায়
সেই মাধুরী কোথা রে পাই॥

২ আশ্বিন অপরাহ্ণ
সুরুল

৪৯

ঐ অমল হাতে রজনী প্রাতে
আপনি জ্বালো
এই ত আলো—
এই ত আলো।

এই ত প্রভাত, এই ত আকাশ,
এই ত পূজার পুষ্পবিকাশ,
এই ত বিমল, এই ত মধুর,
এই ত ভালো—
এই ত আলো—
এই ত আলো।

আঁধার মেঘের বক্ষে জেগে
আপনি জ্বালো
এই ত আলো—
এই ত আলো।

এই ত ঝঞ্ঝা তড়িৎ-জ্বালা,
এই ত দুখের অগ্নিমালা,
এই ত মুক্তি, এই দীপ্তি,
এই ত ভালো—
এই ত আলো—
এই ত আলো॥

৭ আশ্বিন
সুরুল হইতে শান্তিনিকেতনের পথে

৫০

মোর হৃদয়ের গোপন বিজন ঘরে
একেলা রয়েচ নীরব শয়ন-পরে—
প্রিয়তম হে জাগ জাগ জাগ।
রুদ্ধ দ্বারের বাহিরে দাঁড়ায়ে আমি
আর কতকাল এমনে কাটিবে স্বামী—
প্রিয়তম হে জাগ জাগ জাগ।

রজনীর তারা উঠেচে গগন ছেয়ে,
আছে সবে মোর বাতায়ন-পানে চেয়ে—
প্রিয়তম হে জাগ জাগ জাগ।
জীবনে আমার সঙ্গীত দাও আনি,
নীরব রেখো না তোমার বীণার বাণী—
প্রিয়তম হে জাগ জাগ জাগ।

মিলাব নয়ন তব নয়নের সাথে,
মিলাব এ হাত তব দক্ষিণ হাতে—
প্রিয়তম হে জাগ জাগ জাগ।
হৃদয়-পাত্র সুধায় পূর্ণ হবে,
তিমির কাঁপিবে গভীর আলোর রবে—
প্রিয়তম হে জাগ জাগ জাগ॥

৮ আশ্বিন প্রভাত
সুরুল

৫১

খুসি হ তুই আপন মনে।
রিক্ত হাতে চল্ না রাতে
নিরুদ্দেশের অন্বেষণে!

চাস্‌নে কিছু, কোস্‌নে কিছু,
করিস্‌নে তোর মাথা নীচু,
আছে রে তোর হৃদয় ভরা
শূন্য ঝুলির অলখ ধনে।

নাচুক না ঐ আঁধার আলো।—
তুলুক না ঢেউ দিবানিশি
চারদিকে তোর মন্দভালো।

তোর তরী তুই দে খুলে দে,
গান গেয়ে তুই পাল তুলে দে,
অকূল-পানে ভাস্‌বি রে তুই,
হাস্‌বি রে তুই অকারণে॥

৮ আশ্বিন সন্ধ্যা
সুরুল

৫২

সহজ হবি, সহজ হবি,
ওরে মন, সহজ হবি।
কাছের জিনিষ দূরে রাখে
তা'র থেকে তুই দূরে র'বি

কেন রে তার দু'হাত পাতা,
দান ত না চাই, চাই যে দাতা,
সহজে তুই দিবি যখন
সহজে তুই সকল লবি।

সহজ হবি সহজ হবি
ওরে মন, সহজ হবি—
আপন বচন-রচন হ'তে
বাহির হ'য়ে আয়রে কবি।

সকল কথার বাহিরেতে
ভুবন আছে হৃদয় পেতে,
নীরব ফুলের নয়ন-পানে
চেয়ে আছে প্রভাত-রবি॥

৯ আশ্বিন প্রভাত
সুরুল

৫৩

ওরে ভীরু, তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার।
হালের কাছে মাঝি আছে
করবে তরী পার।

তুফান যদি এসে থাকে
তোমার কিসের দায়—
চেয়ে দেখ ঢেউয়ের খেলা,
কাজ কি ভাবনায়?
আসুকনাকো গহন রাতি,
হোক না অন্ধকার—
হালের কাছে মাঝি আছে
করবে তরী পার।

পশ্চিমে তুই তাকিয়ে দেখিস্
মেঘে আকাশ ডোবা ;
আনন্দে তুই পূবের দিকে
দেখ্‌না তারার শোভা।

সাথী যারা আছে, তা'রা
তোমার আপন বলে'
ভাব কি তাই রক্ষা পাবে
তোমারি ঐ কোলে ?
উঠ্‌বেরে ঝড়, দুল্‌বেরে বুক,
জাগ্‌বে হাহাকার—
হালের কাছে মাঝি আছে
করবে তরী পার ॥

৯ আশ্বিন অপরাহ্ণ
শান্তিনিকেতন

৫৪

চোখে দেখিস্,   প্রাণে কানা !
হিয়ার মাঝে দেখ না ধরে’
ভুবনখানা ।

প্রাণের সাথে সে যে গাঁথা,
সেথায় তারি আসন পাতা,
বাইরে তা’রে রাখিস্ তবু
অন্তরে তা’র যেতে মানা ?

তারি কণ্ঠে তোমার বাণী।
তোরি রঙে রঙীন তারি
বসনখানি ।

যেজন তোমার বেদনাতে
লুকিয়ে খেলে দিনে রাতে,
সাম্‌নে যে ঐ রূপে রসে
সেই অজানা হ’ল জানা ॥

২১ আশ্বিন
শান্তিনিকেতন

৫৫

অগ্নিবীণা বাজাও তুমি
কেমন করে’ ?
আকাশ কাঁপে তারার আলোর
গানের ঘোরে।

তেমনি করে’ আপন হাতে
ছুঁলে আমার বেদনাতে,
নূতন সৃষ্টি জাগ্‌ল বুঝি
জীবন-পরে।

বাজে বলেই বাজাও তুমি ;
সেই গরবে
ওগো প্রভু আমার প্রাণে
সকল স’বে।

বিষম তোমার বহ্নিঘাতে
বারেবারে আমার রাতে
জ্বালিয়ে দিলে নূতন তারা
ব্যথায় ভরে’

১৩ আশ্বিন রাত্রি
শান্তিনিকেতন

৫৬

আলো যে আজ গান করে মোর প্রাণে গো
কে এল মোর অঙ্গনে, কে জানে গো।

হৃদয় আমার উদাস করে'
কেড়ে নিল আকাশ মোরে
বাতাস আমায় আনন্দবাণ হানে গো।

দিগন্তের ঐ নীল নয়নের ছায়াতে
কুসুম যেন বিকাশে মোর কায়াতে।

মোর হৃদয়ের সুগন্ধ যে
বাহির হ'ল কাহার খোঁজে,
সকল জীবন চাহে কাহার পানে গো॥

১৪ আশ্বিন
শান্তিনিকেতন

৫৭

তোমার দুয়ার খোলার ধ্বনি
ঐ গো বাজে
হৃদয়-মাঝে।

তোমার ঘরে নিশি ভোরে
আগল যদি গেল সরে'
আমার ঘরে রইব তবে
কিসের লাজে

অনেক বলা বলেচি, সে
মিথ্যা বলা।
অনেক চলা চলেচি, সে
মিথ্যা চলা।

আজ যেন সব পথের শেষে
তোমার দ্বারে দাঁড়াই এসে,
ভুলিয়ে যেন নেয় না মোরে
আপন কাজে ?

১৬ আশ্বিন
শান্তিনিকেতন

৫৮

প্রেমের প্রাণে সইবে কেমন করে'—
তোমার যেজন সে যদি গো
দ্বারে দ্বারে ঘোরে।

কাঁদিয়ে তা'রে ফিরিয়ে আনো,
কিছুতেই ত হার না মানো,
তা'র বেদনায় তোমার অশ্রু
রইল যে গো ভরে'।

সামান্য নয় তব প্রেমের দান।
বড় কঠিন ব্যথা এ যে
বড় কঠিন টান।

মরণ-স্নানে ডুবিয়ে শেষে
সাজাও তবে মিলন-বেশে.
সকল বাধা ঘুচিয়ে ফেলে
বাঁধ বাহুর ডোরে॥

১৬ আশ্বিন
শান্তিনিকেতন

৫৯

ক্লান্তি আমার ক্ষমা কর প্রভু
পথে যদি পিছিয়ে পড়ি কভু।

এই যে হিয়া থরথর
কাঁপে আজি এমনতর
এই বেদনা ক্ষমা কর
ক্ষমা কর প্রভু।

এই দীনতা ক্ষমা কর প্রভু
পিছন পানে তাকাই যদি কভু।

দিনের তাপে রৌদ্রজ্বালায়
শুকায় মালা পূজার থালায়,
সেই ম্লানতা ক্ষমা কর
ক্ষমা কর প্রভু॥

১৬ আশ্বিন
শান্তিনিকেতন

৬০

আমার আর হবে না দেরি—
আমি শুনেছি ঐ বাজে তোমার ভেরী।

তুমি কি নাথ দাঁড়িয়ে আছ আমার যাবার পথে ?
মনে হয় যে ক্ষণে ক্ষণে মোর বাতায়ন হ'তে
তোমায় যেন হেরি,
আমার আর হবে না দেরি।

আমার কাজ হয়েচে সারা,
এখন প্রাণে বাঁশি বাজায় সন্ধ্যাতারা।

দেবার মত যা ছিল মোর নাই কিছু আর হাতে,
তোমার আশীর্ব্বাদের মালা নেব কেবল মাথে
আমার ললাট ঘেরি ;—
এখন আর হবে না দেরি॥

১৬ আশ্বিন
শান্তিনিকেতন

৬১

ঐ যে সন্ধ্যা খুলিয়া ফেলিল তা'র
সোনার অলঙ্কার।
ঐ সে আকাশে লুটায়ে আকুল চুল
অঞ্জলি ভরি' ধরিল তারার ফুল,
পূজায় তাহার ভরিল অন্ধকার।

ক্লান্তি আপন রাখিয়া দিল সে ধীরে
স্তব্ধ পাখীর নীড়ে।
বনের গহনে জোনাকি-রতন-জ্বালা
লুকায়ে বক্ষে শান্তির জপমালা
জপিল সে বারবার।

ঐ যে তাহার লুকানো ফুলের বাস
গোপনে ফেলিল শ্বাস।
ঐ যে তাহার প্রাণের গভীর বাণী
শান্ত পবনে নীরবে রাখিল আনি
আপন বেদনাভার।

ঐ যে নয়ন অবগুণ্ঠনতলে
ভাসিল শিশির-জলে।
ঐ যে তাহার বিপুল রূপের ধন
অরূপ-আঁধারে করিল সমর্পণ
চরম নমস্কার॥

১৬ আশ্বিন সন্ধ্যা
শান্তিনিকেতন

৬২

দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো,—
গভীর শান্তি এ যে,
আমার সকল ছাড়িয়ে গিয়ে
উঠ্‌ল কোথায় বেজে।

ছাড়িয়ে গৃহ ছাড়িয়ে আরাম, ছাড়িয়ে আপনারে
সাথে করে' নিল আমায় জন্ম মরণ পারে—
এল পথিক সেজে।
দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো,—
গভীর শান্তি এ যে।

চরণে তা'র নিখিল ভুবন নীরব গগনেতে
আলো-আঁধার আঁচলখানি আসন দিল পেতে।

এত কালের ভয় ভাবনা কোথায় যে যায় সরে',
ভালো মন্দ ভাঙাচোরা আলোয় ওঠে ভরে',
কালিমা যায় মেজে।
দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো
গভীর শান্তি এ যে॥

১৬ আশ্বিন রাত্রি
শান্তিনিকেতন

৬৩

এদের পানে তাকাই আমি
বক্ষে কাঁপে ভয়।
সব পেরিয়ে তোমায় দেখি
আর ত কিছু নয়।

একটুখানি সাম্‌নে আমার আঁধার জেগে থাকে
সেইটুকুতে সূর্য্য তারা সবি আমার ঢাকে।
তা'র উপরে চেয়ে দেখি
আলোয় আলোময়।

ছোট আমার বড় হয় যে
যখন টানি কাছে—
বড় তখন কেমন করে'
লুকায় তারি পাছে।

কাছের পানে তাকিয়ে আমার দিন ত গেচে কেটে,
এবার যেন সন্ধ্যাবেলায় কাছের ক্ষুধা মেটে—
এতকাল যে রইলে দূরে
তোমারি হোক জয়॥

১৬ আশ্বিন রাত্রি
শান্তিনিকেতন

৬৪

হিসাব আমার মিলবে না তা জানি,
যা আছে তাই সামনে দিলাম আনি'।

করজোড়ে রইনু চেয়ে মুখে
বোঝাপড়া কখন যাবে চুকে,
তোমার ইচ্ছা মাথায় লব মানি'।

গর্ব্ব আমার নাই রহিল প্রভু,
চোখের জল ত কাড়বে না কেউ কভু

নাই বসালে তোমার কোলের কাছে,
পায়ের তলে সবারি ঠাঁই আছে,
ধূলার পরে পাতব আসনখানি ॥

১৬ আশ্বিন রাত্রি
শান্তিনিকেতন

৬৫

মেঘ বলেচে যাব যাব,
রাত বলেচে যাই ;
সাগর বলে, কূল মিলেচে
আমি ত আর নাই।

দুঃখ বলে, রইনু চুপে
তাঁহার পায়ের চিহ্নরূপে ;
আমি বলে, মিলাই আমি
আর কিছু না চাই।

ভুবন বলে, তোমার তরে
আছে বরণমালা।
গগন বলে, তোমার তরে
লক্ষ প্রদীপ জ্বালা।

প্রেম বলে যে, যুগে যুগে
তোমার লাগি আছি জেগে ;
মরণ বলে, আমি তোমার
জীবন-তরী বাই॥

১৭ আশ্বিন প্রভাত
শান্তিনিকেতন

৬৬

কাণ্ডারী গো, যদি এবার
পৌঁছে থাক কূলে,
হাল ছেড়ে দাও, এখন আমার
হাত ধরে' লও তুলে।

ক্ষণেক তোমার বনের ঘাসে
বসাও আমায় তোমার পাশে,
রাত্রি আমার কেটে গেচে
ঢেউয়ের দোলায় দুলে

কাণ্ডারী গো, ঘর যদি মোর
না থাকে আর দূরে,
ঐ যদি মোর ঘরের বাঁশি
বাজে ভোরের সুরে,
শেষ বাজিয়ে দাও গো চিতে
অশ্রুজলের রাগিণীতে
পথের বাঁশিখানি তোমার
পথতরুর মূলে॥

১৭ আশ্বিন প্রভাত
শান্তিনিকেতন

৬৭

ফুল ত আমার ফুরিয়ে গেচে,
শেষ হ'ল মোর গান;
এবার প্রভু, লও গো শেষের দান।

অশ্রুজলের পদ্মখানি
চরণতলে দিলাম আনি,
ঐ হাতে মোর হাত দুটি লও
লও গো আমার প্রাণ।
এবার প্রভু, লওগো শেষের দান।

ঘুচিয়ে লওগো সকল লজ্জা
চুকিয়ে লও গো ভয়।
বিরোধ আমার যত আছে
সব করে' লও জয়।

লও গো আমার নিশীথ রাতি,
লও গো আমার ঘরের বাতি,
লও গো আমার সকল শক্তি,
সকল অভিমান।
এবার প্রভু, লও গো শেষের দান॥

১৭ আশ্বিন প্রভাত
শান্তিনিকেতন

৬৮

তোমার ভুবন মর্ম্মে আমার লাগে।
তোমার আকাশ অসীম কমল
অন্তরে মোর জাগে।

এই সবুজ এই নীলের পরশ
সকল দেহ করে সরস,
রক্ত আমার রঙিয়ে আছে
তব অরুণ-রাগে।

আমার মনে এই শরতের
আকুল আলোখানি
এক পলকে আনে যেন
বহুযুগের বাণী।

নিশীথ রাতে নিমেষহারা
তোমার যত নীরব তারা
এমন করে' হৃদয়-দ্বারে
আমায় কেন মাগে॥

১৭ আশ্বিন প্রভাত
শান্তিনিকেতন

৬৯

তোমার কাছে এ বর মাগি
মরণ হ'তে যেন জাগি
গানের সুরে

যেম্‌নি নয়ন মেলি, যেন
মাতার স্তন্যসুধা-হেন
নবীন জীবন দেয় গো পূরে
গানের সুরে।

সেথায় তরু তৃণ যত
মাটির বাঁশি হ'তে ওঠে
গানের মত।

আলোক সেথা দেয় গো আনি
আকাশের আনন্দবাণী,
হৃদয় মাঝে বেড়ায় ঘুরে।
গানের সুরে॥

১৭ আশ্বিন
সন্ধ্যা
শান্তিনিকেতন

৭০

আপন হ'তে বাহির হ'য়ে
বাইরে দাঁড়া!
বুকের মাঝে বিশ্বলোকের
পাবি সাড়া।

এই যে বিপুল ঢেউ লেগেচে
তোর মাঝেতে উঠুক নেচে,
সকল পরাণ দিক্ না নাড়া—
বাইরে দাঁড়া, বাইরে দাঁড়া!

বোস্ না ভ্রমর এই নীলিমায়
আসন ল'য়ে
অরুণ আলোর স্বর্ণ-রেণু-
মাখা হ'য়ে।

যেখানেতে অগাধ ছুটি,
মেল্ সেথা তোর ডানা দুটি,
সবার মাঝে পাবি ছাড়া;
বাইরে দাঁড়া, বাইরে দাঁড়া!

১৭ আশ্বিন
সন্ধ্যা
শান্তিনিকেতন

৭১

এই আবরণ ক্ষয় হবে গো ক্ষয় হবে,
এ দেহমন ভূমানন্দময় হবে।

চোখে আমার মায়ার ছায়া টুট্‌বে গো,
বিশ্বকমল প্রাণে আমার ফুট্‌বে গো,
এ জীবনে তোমারি নাথ জয় হবে।

রক্ত আমার বিশ্বতালে নাচ্‌বে যে,
হৃদয় আমার বিপুল প্রাণে বাঁচ্‌বে যে।

কাঁপ্‌বে তোমার আলো-বীণার তারে সে,
দুল্‌বে তোমার তারা-মণির হারে সে,
বাসনা তা'র ছড়িয়ে গিয়ে লয় হবে

১৮ আশ্বিন প্রভাত
শান্তিনিকেতন

৭২

ওগো আমার হৃদয়বাসী,
আজ কেন নাই তোমার হাসি ?

সন্ধ্যা হ'ল কালো মেঘে,
চাঁদের চোখে আঁধার লেগে ;
বাজ্‌ল না আজ প্রাণের বাঁশি।

রেখেচি এই প্রদীপ মেজে,
জ্বালিয়ে দিলেই জ্বল্‌বে সে যে।
একটুকু মন দিলেই তবে
তোমার মালা গাঁথা হবে,
তোলা আছে ফুলের রাশি ॥

১৮ আশ্বিন সন্ধ্যা
শান্তিনিকেতন

৭৩

পুষ্প দিয়ে মারো যারে
চিন্‌ল না সে মরণকে।
বাণ খেয়ে যে পড়ে, সে যে
ধরে তোমার চরণকে।

সবার নীচে ধূলার পরে
ফেল যারে মৃত্যুশরে
সে যে তোমার কোলে পড়ে
ভয় কি বা তা'র পড়নকে ?

আরামে যার আঘাত ঢাকা,
কলঙ্ক যার সুগন্ধ
নয়ন মেলে' দেখ্‌ল না সে
রুদ্র মুখের আনন্দ।

মজ্‌ল না সে চোখের জলে,
পৌঁছল না চরণতলে,
তিলে তিলে পলে পলে
ম'ল যে জন পালঙ্কে।

১৯ আশ্বিন প্রভাত
শান্তিনিকেতন

৭৪

আমার সুরের সাধন রইল পড়ে'।
চেয়ে চেয়ে কাট্‌ল বেলা
কেমন করে'?

দেখি সকল অঙ্গ দিয়ে,
কি যে দেখি বল্‌ব কি এ?
গানের মত চোখে বাজে
রূপের ঘোরে।

সবুজ সুধা এই ধরণীর
অঞ্জলিতে
কেমন করে' ওঠে ভরে'
আমার চিতে?

আমার সকল ভাবনাগুলি
ফুলের মত নিল তুলি,
আশ্বিনের ঐ আঁচলখানি
গেল ভরে'॥

১৯ আশ্বিন
শান্তিনিকেতন

৭৫

কূল থেকে মোর গানের তরী
দিলেম খুলে,—
সাগরমাঝে ভাসিয়ে দিলেম
পালটি তুলে।
যেখানে ঐ কোকিল ডাকে ছায়াতলে—
সেখানে নয়।
যেখানে ঐ গ্রামের বধূ আসে জলে—
সেখানে নয়।
যেখানে নীল মরণ-লীলা উঠ্‌চে দুলে
সেখানে মোর গানের তরী দিলেম খুলে।

এবার, বীণা, তোমায় আমায়
আমরা একা।
অন্ধকারে নাইবা কারে
গেল দেখা।
কুঞ্জবনের শাখা হ'তে যে ফুল তোলে
সে ফুল এ নয়।
বাতায়নের পাতা হ'তে যে ফুল দোলে
সে ফুল এ নয়।
দিশাহারা আকাশ ভরা সুরের ফুলে
সেই দিকে মোর গানের তরী দিলেম খুলে॥

১৯ আশ্বিন
শান্তিনিকেতন

৭৬

ঘরের থেকে এনেছিলেম
প্রদীপ জ্বেলে,—
ডেকেছিলেম, "আয়রে তোরা
পথের ছেলে।"

বলেছিলেম, সন্ধ্যা হোলো,
তোমরা পূজার কুসুম তোলো,
আমার প্রদীপ দেবে পথে
কিরণ মেলে।"

পথের আঁধার পথে রেখে
এলেম ফিরে ;
প্রদীপ হাতে পথ দেখানো
ছেড়েচি রে।

এবার বলি, "ওগো আলো,
আমায় তুমি আপনি জ্বালো,
ভাঙা প্রদীপ পথের ধূলায়
দিলেম ফেলে।"

১৯ আশ্বিন
শান্তিনিকেতন

৭৭

সন্ধ্যা হ'ল, একলা আছি বলে'
এই যে চোখে অশ্রু পড়ে গলে'।
ওগো বন্ধু, বল দেখি
শুধু কেবল আমার এ কি ?
এর সাথে যে তোমার অশ্রু দোলে

থাক্ না তোমার লক্ষ গ্রহ তারা,
তাদের মাঝে আছ আমায়-হারা।
সইবে না সে, সইবে না সে,
টান্‌তে আমায় হবে পাশে,
একলা তুমি, আমি একলা হ'লে॥

১৯ আশ্বিন সন্ধ্যা
শান্তিনিকেতন

৭৮

বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেচ,
কেমনে দিই ফাঁকি ?
আধেক ধরা পড়েচি গো,
আধেক আছে বাকি।

কেন জানি আপ্‌না ভুলে
বারেক হৃদয় যায় যে খুলে,
বারেক তা'রে ঢাকি,—
আধেক ধরা পড়েচি যে
আধেক আছে বাকি।

বাহির আমার শুক্তি যেন
কঠিন আবরণ,—
অন্তরে মোর তোমার লাগি
একটি কান্না-ধন।
হৃদয় বলে তোমার দিকে
রইবে চেয়ে অনিমিখে,
চায় না কেন আঁখি ?
আধেক ধরা পড়েচি যে
আধেক আছে বাকি।

১৯ আশ্বিন রাত্রি
শান্তিনিকেতন

৭৯

তোমায় সৃষ্টি করব আমি
এই ছিল মোর পণ।
দিনে দিনে করেছিলেম
তারি আয়োজন।
তাই সাজালেম আমার ধূলো,
আমার ক্ষুধাতৃষ্ণাগুলো,
আমার যত রঙীন্ আবেশ,
আমার দুঃস্বপন।

"তুমি আমায় সৃষ্টি কর"
আজ তোমারে ডাকি।
"ভাঙো আমার আপন মনের
মায়া-ছায়ার ফাঁকি।
তোমার সত্য, তোমার শান্তি,
তোমার শুভ্র অরূপ কান্তি,
তোমার শক্তি, তোমার বহ্নি
ভরুক এ জীবন॥"

২০ আশ্বিন প্রভাত
শান্তিনিকেতন

৮০

সারা জীবন দিল আলো

সূর্য্য গ্রহ চাঁদ,

তোমার আশীর্ব্বাদ, হে প্রভু,

তোমার আশীর্ব্বাদ।

মেঘের কলস ভরে' ভরে'
প্রসাদ-বারি পড়ে ঝরে',
সকল দেহে প্রভাত বায়ু
ঘুচায় অবসাদ,—
তোমার আশীর্ব্বাদ, হে প্রভু,
তোমার আশীর্ব্বাদ।

তৃণ যে এই ধূলার পরে
পাতে আঁচলখানি,
এই যে আকাশ চির-নীরব
অমৃতময় বাণী,—
ফুল যে আসে দিনে দিনে
বিনা রেখার পথটি চিনে,
এই যে ভুবন দিকে দিকে
পূরায় কত সাধ,
তোমার আশীর্ব্বাদ, হে প্রভু
তোমার আশীর্ব্বাদ।

২০ আশ্বিন প্রভাত
শান্তিনিকেতন

৮১

সরিয়ে দিয়ে আমার ঘুমের
পৰ্দ্দাখানি
ডেকে গেল নিশীথ রাতে
কে না জানি ?

কোন্ গগনের দিশাহারা
তন্দ্রাবিহীন একটি তারা ?
কোন্ রজনীর দুঃস্বপনের
আর্ত্তবাণী ?
ডেকে গেল নিশীথ রাতে
কে না জানি ?
আঁধার রাতে ভয় এসেচে
কোন্ সে নীড়ে ?
বোঝাই তরী ডুব্‌ল কোথায়
পাষাণ তীরে ?
এই ধরণীর বক্ষ টুটে
এ কি রোদন এল ছুটে
আমার বক্ষে বিরামহারা
বেদন হানি ?
ডেকে গেল নিশীথ রাতে
কে না জানি ?

২১ আশ্বিন
শান্তিনিকেতন

৮২

ব্যথার বেশে এল আমার দ্বারে
কোন্ অতিথি, ফিরিয়ে দেবনারে।

জাগাব বসে' সকল রাতি ;
ঝড়ের হাওয়ায় ব্যাকুল বাতি
আগুন দিয়ে জ্বাল্ব বারেবারে।

আমার যদি শক্তি নাহি থাকে
ধরার কান্না আমায় কেন ডাকে ?
দুঃখ দিয়ে জানাও, রুদ্র,
ক্ষুদ্র আমি নই ত ক্ষুদ্র,
ভয় দিয়েচ ভয় করিনে তা'রে।

ব্যথা যখন এল আমার দ্বারে
তা'রে আমি ফিরিয়ে দেবনারে

২১ আশ্বিন
শান্তিনিকেতন

৮৩

আমি পথিক, পথ আমারি সাথী।
দিন সে কাটায় গণি গণি
বিশ্বলোকের চরণধ্বনি,
তারার আলোয় গায় সে সারারাতি।

কত যুগের রথের রেখা
বক্ষে তাহার আঁকে লেখা,
কত কালের ক্লান্ত আশা
ঘুমায় তাহার ধূলায় আঁচল পাতি।

বাহির হলেম কবে সে নাই মনে।
যাত্রা আমার চলার পাকে
এই পথেরই বাঁকে বাঁকে
নূতন হ'ল প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।

যত আশা পথের আশা,
পথে যেতেই ভালবাসা,
পথে চলার নিত্যরসে
দিনে দিনে জীবন ওঠে মাতি॥

২১ আশ্বিন
শান্তিনিকেতন

৮৪

বৃন্ত হ'তে ছিন্ন করি শুভ্র কমলগুলি
        কে এনেচে তুলি ?
তবু ওরা চায় যে মুখে নাই তাহে ভৎর্সনা,
শেষ-নিমেষের পেয়ালা-ভরা অম্লান সান্ত্বনা,
মরণের মন্দিরে এসে মাধুরী সঙ্গীত
        বাজায় ক্লান্তি ভুলি
        শুভ্র কমলগুলি।

এরা তোমার ক্ষণকালের নিবিড়-নন্দন
        নীরব চুম্বন,
মুগ্ধ নয়ন-পল্লবেতে মিলায় মরি মরি
তোমার সুগন্ধশ্বাসে সকল চিত্ত ভরি ;
হে কল্যাণলক্ষ্মী, এরা আমার মর্ম্মে তব
        করুণ অঙ্গুলি
        শুভ্র কমলগুলি ॥

২১ আশ্বিন
শান্তিনিকেতন

9—65

৮৫

বাজিয়েছিলে বীণা তোমার
দিই বা না দিই মন !
আজ প্রভাতে তারি ধ্বনি
শুনি সকল ক্ষণ ।

কত সুরের লীলা সে যে
দিনে রাত্রে উঠ্‌ল বেজে,
জীবন আমার গানের মালা
করেচ কল্পন ।

আজ শরতের নীলাকাশে,
আজ সবুজের খেলায়,
আজ বাতাসের দীর্ঘশ্বাসে,
আজ চামেলির মেলায়
কত কালের গাঁথা বাণী
আমার প্রাণের সে গানখানি
তোমার গলায় দোলে যেন
করিনু দর্শন ॥

২৩ আশ্বিন
বুদ্ধ গয়া

৮৬

আবার যদি ইচ্ছা কর
আবার আসি ফিরে
দুঃখসুখের ঢেউ-খেলানো
এই সাগরের তীরে।

আবার জলে ভাসাই ভেলা,
ধূলার পরে করি খেলা,
হাসির মায়ামৃগীর পিছে
ভাসি নয়ননীরে।

কাঁটার পথে আঁধার রাতে
আবার যাত্রা করি;
আঘাত খেয়ে বাঁচি, কিম্বা
আঘাত খেয়ে মরি।

আবার তুমি ছদ্মবেশে
আমার সাথে খেলাও হেসে,
নূতন প্রেমে ভালবাসি
আবার ধরণীরে॥

২৩ আশ্বিন
বুদ্ধ গয়া

৮৭

অচেনাকে ভয় কি আমার ওরে ?
অচেনাকেই চিনে চিনে
উঠ্‌বে জীবন ভরে'।

জানি জানি আমার চেনা
কোনো কালেই ফুরাবে না,
চিহ্নহারা পথে আমায়
টান্‌বে অচিন্‌-ডোরে।

ছিল আমার মা অচেনা
নিল আমায় কোলে।
সকল প্রেমই অচেনা গো
তাই ত হৃদয় দোলে।

অচেনা এই ভুবন-মাঝে
কত সুরেই হৃদয় বাজে,
অচেনা এই জীবন আমার,
বেড়াই তারি ঘোরে॥

২৩ আশ্বিন
বুদ্ধ গয়া

৮৮

যে দিল ঝাঁপ ভবসাগর-মাঝখানে
কূলের কথা ভাবে না সে,
চায় না কভু তরীর আশে,
আপন সুখে সাঁতার-কাটা সেই জানে
ভবসাগর-মাঝখানে।

রক্ত যে তা'র মেতে ওঠে
মহাসাগর-কল্লোলে,
ওঠা-পড়ার ছন্দে হৃদয়
ঢেউয়ের সাথে ঢেউ তোলে

অরুণ আলোর আশিষ ল'য়ে
অস্তরবির আদেশ ব'য়ে
আপন সুখে যায় সে চলে' কার পানে
ভবসাগর-মাঝখানে॥

২৩ আশ্বিন
বুদ্ধ গয়া

৮৯

সন্ধ্যাতারা যে ফুল দিল
তোমার চরণতলে
তা'রে আমি ধুয়ে দিলেম
আমার নয়নজলে।

বিদায়-পথে যাবার বেলা ম্লান রবির রেখা
সারা দিনের ভ্রমণবাণী লিখ্‌ল সোনার লেখা,
আমি তা'তেই সুর বসালেম
আপন গানের ছলে।

স্বর্ণ আলোর রথে চড়ে'
নেমে এল রাতি'
তারি আঁধার ভরে' আমার
হৃদয় দিনু পাতি'।

মৌন-পারাবারের তলে হারিয়ে-যাওয়া কথায়,
বিশ্ব-হৃদয়-পূর্ণ-করা বিপুল নীরবতায়
আমার বাণীর স্রোত মিলিছে
নীরব কোলাহলে॥

২৩ আশ্বিন সন্ধ্যা
বুদ্ধ গয়া

৯০

এ দিন আজি কোন্ ঘরে গো
খুলে দিল দ্বার ?
আজি প্রাতে সূর্য্য ওঠা
সফল হ'ল কা'র ?

কাহার অভিষেকের তরে
সোনার ঘটে আলোক ভরে,
ঊষা কাহার আশিষ বহি
হ'ল আঁধার পার ?

বনে বনে ফুল ফুটেচে,
দোলে নবীন পাতা,
কা'র হৃদয়ের মাঝে হ'ল
তাদের মালা গাঁথা ?

বহু যুগের উপহারে
বরণ করি নিল কা'রে ?
কা'র জীবনে প্রভাত আজি
ঘোচায় অন্ধকার ?

২৪ আশ্বিন প্রভাত
বুদ্ধ গয়া

৯১

তোমার কাছে চাইনে আমি
অবসর।
আমি গান শোনাব গানের পর।
বাইরে হোথায় দ্বারের কাছে
কাজের লোকে দাঁড়িয়ে আছে,
আশা ছেড়ে যাক্ না ফিরে
আপন ঘর।—
আমি গান শোনাব গানের পর।

জানি না এর কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা নয়।
জানি না কে কোন্‌টা রাখে কোন্‌টা লয়।

চল্‌বে হৃদয় তোমার পানে
শুধু আপন চলার গানে,
ঝরার সুখে ঝরবে সুরের
এ নির্ঝর।
আমি গান শোনাব গানের পর॥

২৪ আশ্বিন
বুদ্ধ গয়া

৯২

এখানে ত বাঁধা পথের
অন্ত না পাই,
চল্‌তে গেলে পথ ভুলি যে
কেবলি তাই।

তোমার জলে, তোমার স্থলে,
তোমার সুনীল আকাশতলে,
কোনোখানে কোনো পথের
চিহ্নটি নাই।

পথের খবর পাখীর শাখায়
লুকিয়ে থাকে।
তারার আগুন পথের দিশা
আপ্‌নি রাখে।
ছয় ঋতু ছয় রঙীন রথে
যায় আসে যে বিনা পথে
নিজেরে সেই অচিন-পথের
খবর শুধাই॥

২৪ আশ্বিন
বুদ্ধ গয়া

৯৩

যা দেবে তা দেবে তুমি আপন হাতে
এই ত তোমার কথা ছিল আমার সাথে।

তাই ত আমার অশ্রুজলে
তোমার হাসির মুক্তা ফলে,
তোমার বীণা বাজে আমার বেদনাতে।
যা কিছু দাও, দাও যে তুমি আপন হাতে।

পরের কথায় চল্‌তে পথে ভয় করি যে।
জানি আমার নিজের মাঝে আছ নিজে।

ভুল আমারে বারে বারে
ভুলিয়ে আনে তোমার দ্বারে,
আপন মনে চলি গো তাই দিনে রাতে।
যা কিছু দাও, দাও যে তুমি আপন হাতে।

২৪ আশ্বিন
বুদ্ধ গয়া

৯৪

পথে পথেই বাসা বাঁধি,
মনে ভাবি পথ ফুরালো,
কোন্ অনাদি কালের আশা
হেথায় বুঝি সব পূরালো!

কখন্ দেখি আঁধার ছুটে
স্বপ্ন আবার যায় যে টুটে,
পূর্ব্বদিকের তোরণ খুলে
নাম ডেকে যায় প্রভাত-আলো।

আবার কবে নবীন ফুলে
ভরে' নূতন দিনের সাজি।
পথের ধারে তরুমূলে
প্রভাতী সুর ওঠে বাজি।

কেমন করে' নূতন সাথী
জোটে আবার রাতারাতি,
দেখি রথের চূড়ার পরে
নূতন ধ্বজা কে উড়ালো॥

২৫ আশ্বিন
বুদ্ধ গয়া

৯৫

পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে,
পথে চলাই সেই ত তোমায় পাওয়া।
যাত্রাপথে আনন্দগান যে গাহে
তারি কণ্ঠে তোমারি গান গাওয়া।

চায় না সেজন পিছন পানে ফিরে
বায় না তরী কেবল তীরে তীরে,
তুফান তা'রে ডাকে আকুল নীরে
যার পরাণে লাগ্‌ল তোমার হাওয়া।
পথে চলাই সেই ত তোমায় পাওয়া।

পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে,
পথিক-চিত্তে তোমার তরী বাওয়া।
দুয়ার খুলে সমুখ পানে যে চাহে
তা'র চাওয়া যে তোমার পানে চাওয়া

বিপদ বাধা কিছুই ডরে না সে,
র'য় না পড়ে' কোনো লাভের আশে,
যাবার লাগি মন তারি উদাসে—
যাওয়া সে যে তোমার পানে যাওয়া,
পথে চলাই সেই ত তোমায় পাওয়া॥

২৫ আশ্বিন
বেলা ষ্টেশন

৯৬

জীবন আমার যে অমৃত
আপন মাঝে গোপন রাখে
প্রতিদিনের আড়াল ভেঙে
কবে আমি দেখ্‌ব তা'কে ?

তাহারি স্বাদ ক্ষণে ক্ষণে
পেয়েচি ত আপন মনে,
গন্ধ তারি মাঝে মাঝে
উদাস করে' আমায় ডাকে।

নানা রঙের ছায়ায় বোনা
এই আলোকের অন্তরালে
আনন্দরূপ লুকিয়ে আছে
দেখ্‌ব না কি যাবার কালে ?

যে নিরালায় তোমার দৃষ্টি
আপ্‌নি দেখে আপন সৃষ্টি
সেইখানে কি বারেক আমায়
দাঁড় করাবে সবার ফাঁকে ?

২৫ আশ্বিন
পাল্কীপথে
বেলা

৯৭

সুখের মাঝে তোমায় দেখেছি,
দুঃখে তোমায় পেয়েছি প্রাণ ভরে'।
হারিয়ে তোমায় গোপন রেখেছি,
পেয়ে আবার হারাই মিলন-ঘোরে।

চির জীবন আমার বীণা-তারে
তোমায় আঘাত লাগ্‌ল বারেবারে,
তাই ত আমার নানা সুরের তানে
তোমার পরশ প্রাণে নিলেম ধরে'।

আজ ত আমি ভয় করিনে আর
লীলা যদি ফুরায় হেথাকার।
নূতন আলোয় নূতন অন্ধকারে
লও যদি বা নূতন সিন্ধুপারে
তবু তুমি সেই ত আমার তুমি,
আবার তোমায় চিন্‌ব নূতন করে'॥

২৫ আশ্বিন
পাল্কীপথে
বেলা

৯৮

পথের সাথী, নমি বারম্বার।
পথিকজনের লহ নমস্কার।

ওগো বিদায়, ওগো ক্ষতি,
ওগো দিন-শেষের পতি,
ভাঙা-বাসার লহ নমস্কার

ওগো নবপ্রভাত-জ্যোতি,
ওগো চিরদিনের গতি
নূতন আশার লহ নমস্কার।

জীবনরথের হে সারথি,
আমি নিত্য পথের পথী
পথে চলার লহ নমস্কার।

২৫ আশ্বিন
রেলপথে
বেলা হইতে গয়ায়

৯৯

অন্ধকারের উৎস হ'তে উৎসারিত আলো,
সেই ত তোমার আলো।
সকল দ্বন্দ্ব-বিরোধমাঝে জাগ্রত যে ভালো,
সেই ত তোমার ভালো।

পথের ধূলায় বক্ষ পেতে রয়েচে যেই গেহ
সেই ত তোমার গেহ।
সমর-ঘাতে অমর করে রুদ্রনিঠুর স্নেহ
সেইত তোমার স্নেহ।

সব ফুরালে বাকি রহে অদৃশ্য যেই দান
সেই ত তোমার দান।
মৃত্যু আপন পাত্রে ভরি বহিছে যেই প্রাণ
সেই ত তোমার প্রাণ।

বিশ্বজনের পায়ের তলে ধূলিময় যে ভূমি
সেই ত স্বর্গভূমি।
সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি
সেই ত আমার তুমি॥

২৯ আশ্বিন
এলাহাবাদ

১০০

গতি আমার এসে
ঠেকে যেথায় শেষে
অশেষ সেথা খোলে আপন দ্বার।
যেথা আমার গান
হয় গো অবসান
সেথা গানের নীরব পারাবার।

যেথা আমার আঁখি
আঁধারে যায় ঢাকি
অলখ লোকের আলোক সেথা জ্বলে।
বাইরে কুসুম ফুটে
ধূলায় পড়ে টুটে,
অন্তরে ত অমৃত ফল ফলে।

কর্ম্ম বৃহৎ হ'য়ে
চলে যখন বয়ে',
তখন সে পায় বৃহৎ অবকাশ।
যখন আমার আমি
ফুরায়ে যায় থামি
তখন আমার তোমাতে প্রকাশ॥

২৯ আশ্বিন
এলাহাবাদ

১০১

ভেঙেচে দুয়ার, এসেচ জ্যোতির্ম্ময়,
তোমারি হউক্ জয়।
তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়,
তোমারি হউক্ জয়।

হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়গ তোমার হাতে,
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে,
বন্ধন হোক ক্ষয়।
তোমারি হউক্ জয়।

এস দুঃসহ, এস এস নির্দ্দয়,
তোমারি হউক জয়।
এস নির্ম্মল, এস এস নির্ভয়,
তোমারি হউক্ জয়।

প্রভাতসূর্য্য, এসেচ রুদ্রসাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য্য বাজে,
অরুণবহ্নি জ্বালাও চিত্তমাঝে
মৃত্যুর হোক্ লয়।
তোমারি হউক্ জয়।

৩০ আশ্বিন প্রভাত
এলাহাবাদ

১০২

তোমায় ছেড়ে দূরে চলার
নানা ছলে
তোমার মাঝে পড়ি এসে
দ্বিগুণ বলে।
নানান্ পথে আনাগোনা
মিলনেরই জাল সে বোনা,
যতই চলি ধরা পড়ি
পলে পলে।

শুধু যখন আপন কোণে
পড়ে' থাকি
তখনি সেই স্বপন-ঘোরে
কেবল ফাঁকি।
বিশ্ব তখন কয় না বাণী,
মুখেতে দেয় বসন টানি',
আপন ছায়া দেখি, আপন
নয়ন-জলে॥

১ কার্ত্তিক
এলাহাবাদ

১০৩

যখন তোমায় আঘাত করি
তখন চিনি।
শত্রু হ'য়ে দাঁড়াই যখন
লও যে জিনি।
এ প্রাণ যত নিজের তরে
তোমারি ধন হরণ করে
ততই শুধু তোমার কাছে
হয় সে ঋণী।

উজিয়ে যেতে চাই যতবার
গর্ব্বসুখে,
তোমার স্রোতের প্রবল পরশ
পাই যে বুকে।
আলো যখন আলসভরে
নিবিয়ে ফেলি আপন ঘরে
লক্ষ তারা জ্বালায় তোমার
নিশীথিনী॥

১ কার্ত্তিক সন্ধ্যা
এলাহাবাদ

১০৪

কেমন করে' তড়িৎ আলোয়
দেখ্‌তে পেলেম মনে
তোমার বিপুল সৃষ্টি চলে
আমার এই জীবনে।
সে সৃষ্টি যে কালের পটে
লোকে লোকান্তরে বটে,
একটু তারি আভাস কেবল
দেখি ক্ষণে ক্ষণে।

মনে ভাবি, কান্নাহাসি
আদর অবহেলা
সবই যেন আমায় নিয়ে
আমারি ঢেউ-খেলা।
সেই আমি ত বাহনমাত্র
যায় সে ভেঙে মাটির পাত্র,
যা রেখে যায় তোমার সে ধন
রয় তা তোমার সনে।

তোমার বিশ্বে জড়িয়ে থাকে
আমার চাওয়া পাওয়া।
ভরিয়ে তোলে নিত্যকালের
ফাল্গুনেরি হাওয়া।
জীবন আমার দুঃখে সুখে
দোলে ত্রিভুবনের বুকে,
আমার দিবানিশির মালা
জড়ায় শ্রীচরণে।
আপন মাঝে আপন জীবন
দেখে যে মন কাঁদে।
নিমেষগুলি শিকল হ'য়ে
আমায় তখন বাঁধে।
মিট্‌ল দুঃখ, টুট্‌ল বন্ধ,
আমার মাঝে, হে আনন্দ,
তোমার প্রকাশ দেখে', মোহ
ঘুচ্‌ল এ নয়নে॥

১ কার্ত্তিক সন্ধ্যা
এলাহাবাদ

১০৫

এই নিমেষে গণনাহীন
নিমেষ গেল টুটে,—
একের মাঝে এক হ'য়ে মোর
উঠ্‌ল হৃদয় ফুটে।
বক্ষে কুঁড়ির কারায় বন্ধ
অন্ধকারের কোন্ সুগন্ধ
আজ প্রভাতে পূজার বেলায়
পড়্‌ল আলোয় লুটে।

তোমায় আমায় একটুখানি
দূর যে কোথাও নাই
নয়ন মুদে নয়ন মেলে
এই ত দেখি তাই।
যেই খুলেচি আঁখির পাতা,
যেই তুলেচি নত মাথা,
তোমার মাঝে অম্‌নি আমার
জয়ধ্বনি উঠে॥

২ কার্ত্তিক প্রভাত
এলাহাবাদ

১০৬

যাস্‌নে কোথাও ধেয়ে,
দেখ্‌রে কেবল চেয়ে!
ঐ যে পূরব গগন-মূলে
সোনার বরণ পালটি তুলে
আস্‌চে তরী বেয়ে
দেখ্‌রে কেবল চেয়ে!

ঐ যে আঁধার তটে
আনন্দগান রটে।
অনেক দিনের অভিসারে
অগম গহন জীবন-পারে
পৌঁছিল তোর নেয়ে,
দেখ্‌রে কেবল চেয়ে।

ঐ যে রে তোর তরী
আলোয় গেল ভরি।
চরণে তা'র বরণডালা
কোন্ কাননের বহে মালা
গন্ধে গগন ছেয়ে?
দেখ্‌রে কেবল চেয়ে।

২ কার্ত্তিক প্রভাত
১৩২১
এলাহাবাদ

১০৭

মুদিত আলোর কমল-কলিকাটিরে
রেখেচে সন্ধ্যা আঁধার পর্ণপুটে।
উত্তরিবে যবে নব-প্রভাতের তীরে
তরুণ কমল আপনি উঠিবে ফুটে।
উদয়াচলের সে তীর্থপথে আমি
চলেচি একেলা সন্ধ্যার অনুগামী,
দিনান্ত মোর দিগন্তে পড়ে লুটে।

সেই প্রভাতের স্নিগ্ধ সুদূর গন্ধ
আঁধার বাহিয়া রহিয়া রহিয়া আসে।
আকাশে যে গান ঘুমাইছে নিঃস্পন্দ
তারাদীপগুলি কাঁপিছে তাহারি শ্বাসে
অন্ধকারের বিপুল গভীর আশা,
অন্ধকারের ধ্যান-নিমগ্ন ভাষা
বাণী খুঁজে ফিরে আমার চিত্তাকাশে।

জীবনের পথ দিনের প্রান্তে এসে
নিশীথের পানে গহনে হয়েচে হারা
অঙ্গুলি তুলি তারাগুলি অনিমেষে
মাভৈঃ বলিয়া নীরবে দিতেছে সাড়া,

ম্লান দিবসের শেষের কুসুম তুলে
এ কূল হইতে নব-জীবনের কূলে
চলেচি আমার যাত্রা করিতে সারা।

হে মোর সন্ধ্যা, যাহা কিছু ছিল সাথে
রাখিনু তোমার অঞ্চলতলে ঢাকি।
আঁধারের সাথী, তোমার করুণ হাতে
বাঁধিয়া দিলাম আমার হাতের রাখী।
কত যে প্রাতের আশা ও রাতের গীতি,
কত যে সুখের স্মৃতি ও দুখের প্রীতি,
বিদায় বেলায় আজিও রহিল বাকী।

যা কিছু পেয়েচি, যাহা কিছু গেল চুকে,
চলিতে চলিতে পিছে যা রহিল পড়ে',
যে মণি দুলিল যে ব্যথা বিঁধিল বুকে,
ছায়া হ'য়ে যাহা মিলায় দিগন্তরে,
জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা,
ধূলায় তাদের যত হোক্ অবহেলা,
পূর্ণের পদ-পরশ তাদের পরে।

২রা কার্ত্তিক সন্ধ্যা
এলাহাবাদ

১০৮

এই তীর্থ-দেবতার ধরণীর মন্দির-প্রাঙ্গণে
যে পূজার পুষ্পাঞ্জলি সাজাইনু সযত্ন চয়নে
সায়াহ্নের শেষ আয়োজন ; যে পূর্ণ প্রণামখানি
মোর সারাজীবনের অন্তরের অনির্ব্বাণ বাণী
জ্বালায়ে রাখিয়া গেনু আরতির সন্ধ্যা-দীপ মুখে
সে আমার নিবেদন তোমাদের সবার সম্মুখে
হে মোর অতিথি যত ! তোমরা এসেচ এ জীবনে
কেহ প্রাতে, কেহ রাতে, বসন্তে, শ্রাবণ-বরিষণে ;
কারো হাতে বীণা ছিল, কেহ বা কম্পিত দীপশিখা
এনেছিলে মোর ঘরে ; দ্বার খুলে দুরন্ত ঝটিকা
বারবার এনেচ প্রাঙ্গণে। যখন গিয়েচ চলে'
দেবতার পদচিহ্ন রেখে গেচ মোর গৃহতলে।
আমার দেবতা নিল তোমাদের সকলের নাম ;
রহিল পূজায় মোর তোমাদের সবারে প্রণাম ॥

৩ কার্ত্তিক প্রভাত
১৩২১
এলাহাবাদ

ফাল্গুনী

যাহারা ফাল্গুনীর ফল্গুনদীটিকে বৃদ্ধকবির চিত্তমরুর

তলদেশ হইতে উপরে টানিয়া আনিয়াছে তাহাদের

এবং সেই সঙ্গে

সেই বালকদলের সকল নাটের কাণ্ডারী

আমার সকল গানের ভাণ্ডারী

শ্রীমান্ দিনেন্দ্রনাথের হস্তে

এই নাট্যকাব্যটিকে কবি-বাউলের একতারার মত

সমর্পণ করিলাম।

১৫ই ফাল্গুন

১৩২২।

ফাল্গুনীর পাত্রগণ

রাজা

মন্ত্রী

শ্রুতিভূষণ

কবিশেখর

নববসন্তের দূতগণ

শীত

নবযৌবনের দল

চন্দ্রহাস ... ... উক্ত দলের প্রিয়সখা

দাদা ... ... উক্ত দলের প্রবীণ যুবক

জীবন সর্দ্দার ... ... উক্ত দলের নেতা

অন্ধ বাউল

মাঝি

কোটাল

অনাথ কলু—ইত্যাদি।

এই নাট্যকাব্যে নবযৌবনের দল যেখানে কথাবার্ত্তা কহিতেছে সেখানে চন্দ্রহাস, দাদা ও সর্দ্দার ছাড়া আর কাহারো নাম নির্দ্দিষ্ট নাই। দলের অন্য সকলে যে যেটা-খুসি বলিতে পারে এবং তাহাদের লোক-সংখ্যারও সীমা করিয়া দেওয়া হয় নাই।

সূচনা

দৃশ্য—রাজোদ্যান

চুপ, চুপ, চুপ কর্ তোরা।

কেন, কি হয়েচে ?

মহারাজের মন খারাপ হয়েচে।

সর্ব্বনাশ !

কেরে ? কে বাজায় বাঁশি ?

কেন ভাই, কি হয়েচে ?

মহারাজের মন খারাপ হয়েচে।

সর্ব্বনাশ !

ছেলেগুলো দাপাদাপি করচে কা'র ?

আমাদের মণ্ডলদের।

মণ্ডলকে সাবধান করে' দে ! ছেলেগুলোকে ঠেকাক্ !

মন্ত্রী কোথায় গেলেন ?

এই যে এখানেই আছি।

খবর পেয়েচেন কি ?

কি বল দেখি !

মহারাজের মন খারাপ হয়েচে।

কিন্তু প্রত্যন্তবিভাগ থেকে যুদ্ধের সংবাদ এসেচে যে !

যুদ্ধ চলুক কিন্তু তা'র সংবাদটা এখন চল্‌বে না।

চীন-সম্রাটের দূত অপেক্ষা করচেন।

অপেক্ষা করতে দোষ নেই কিন্তু সাক্ষাৎ পাবেন না।

ঐযে মহারাজ আস্‌চেন।

জয় হোক্ মহারাজের।

মহারাজ, সভায় যাবার সময় হ'ল।

যাবার সময় হ'ল বৈ কি, কিন্তু সভায় যাবার নয়!

সে কি কথা, মহারাজ?

সভা ভাঙবার ঘণ্টা বেজেচে শুন্‌তে পেয়েচি।

কই, আমরা ত কেউ—

তোমরা শুন্‌বে কি করে'? ঘণ্টা একেবারে আমারই কানের কাছে বাজিয়েচে।

এত বড় স্পর্দ্ধা কা'র হ'তে পারে?

মন্ত্রী, এখনো বাজাচ্চে।

মহারাজ, দাসের স্থূলবুদ্ধি মাপ করবেন, বুঝ্‌তে পারলুম না।

এই চেয়ে দেখ—

মহারাজের চুল—

ওখানে একজন ঘণ্টা-বাজিয়েকে দেখ্‌তে পাচ্চ না?

দাসের সঙ্গে পরিহাস?

পরিহাস আমার নয়, মন্ত্রী, যিনি পৃথিবীসুদ্ধ জীবের কানে ধরে' পরিহাস করেন এ তাঁরই। গত রজনীতে আমার

গলায় মল্লিকার মালা পরাবার সময় মহিষী চম্‌কে উঠে বল্লেন, এ কি মহারাজ, আপনার কানের কাছে দুটো পাকাচুল দেখ্‌চি যে !

মহারাজ, এজন্য খেদ করবেন না—রাজবৈদ্য আছেন, তিনি—

এ বংশের প্রথম রাজা ইক্ষ্বাকুরও রাজবৈদ্য ছিলেন, তিনি কি করতে পেরেছিলেন ?—মন্ত্রী, যমরাজ আমার কানের কাছে তাঁর নিমন্ত্রণপত্র ঝুলিয়ে রেখে দিয়েচেন। মহিষী এ দুটো চুল তুলে ফেল্‌তে চেয়েছিলেন, আমি বল্লুম, কি হবে রাণী ? যমের পত্রই যেন সরালুম কিন্তু যমের পত্রলিখককে ত সরানো যায় না। অতএব এ পত্র শিরোধার্য্য করাই গেল !—এখন তাহ'লে—

যে আজ্ঞা, এখন তাহ'লে রাজকার্য্যের আয়োজন—

কিসের রাজকার্য্য ! রাজকার্য্যের সময় নেই—শ্রুতিভূষণকে ডেকে আন।

সেনাপতি বিজয়বর্ম্মা—

না, বিজয়বর্ম্মা না, শ্রুতিভূষণ।

মহারাজ, এদিকে চীন-সম্রাটের দূত—

তাঁর চেয়ে বড় সম্রাটের দূত অপেক্ষা করচেন। ডাক শ্রুতিভূষণকে।

মহারাজ, প্রত্যন্তসীমার সংবাদ—

মন্ত্রী, প্রত্যন্ততম সীমার সংবাদ এসেচে, ডাক শ্রুতিভূষণকে।

মহারাজের শ্বশুর—

আমি যাঁর কথা বল্‌চি তিনি আমার শ্বশুর নন্। ডাক শ্রুতিভূষণকে।

আমাদের কবিশেখর তাঁর কল্পমঞ্জরী কাব্য নিয়ে—

নিয়ে তিনি তাঁর কল্পদ্রুমের শাখায় প্রশাখায় আনন্দে সঞ্চরণ করুন, ডাক শ্রুতিভূষণকে।

যে আদেশ, তাঁকে ডাক্‌তে পাঠাচ্চি।

বোলো, সঙ্গে যেন তাঁর বৈরাগ্যবারিধি পুঁথিটা আনেন।

প্রতিহারী, বাইরে ঐ কা'রা গোল করচে, বারণ কর, আমি একটু শান্তি চাই।

নাগপত্তনে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েচে, প্রজারা সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে।

আমার ত সময় নেই মন্ত্রী, আমি শান্তি চাই।

তা'রা বল্‌চে তাদের সময় আরো অনেক অল্প—তা'রা মৃত্যুর দ্বার প্রায় লঙ্ঘন করেচে—তা'রা ক্ষুধাশান্তি চায়।

ক্ষুধাশান্তি! এ সংসারে কি ক্ষুধার শান্তি আছে? ক্ষুধানলের শান্তি চিতানলে।

তাহ'লে মহারাজ, ঐ হতভাগ্যদের—

ঐ হতভাগ্যদের প্রতি এই হতভাগ্যের উপদেশ এই যে, কাল-ধীবরের জাল ছিন্ন করবার জন্যে ছট্‌ফট্‌ করা বৃথা, আজই হোক্‌ কালই হোক্‌ সে টেনে তুল্‌বেই।

অতএব—

অতএব শ্রুতিভূষণকে প্রয়োজন এবং তাঁর বৈরাগ্যবারিধি পুঁথি।

প্রজারা তাহ'লে দুর্ভিক্ষ—

দেখ মন্ত্রী, ভিক্ষা ত অন্নের নয়, ভিক্ষা আয়ুর। সেই ভিক্ষায় জগৎ জুড়ে দুর্ভিক্ষ—কি রাজার কি প্রজার—কে কা'কে রক্ষা করবে?

অতএব—

অতএব শ্মশানেশ্বর শিব যেখানে ডমরুধ্বনি করচেন সেইখানেই সকলের সব প্রার্থনা ছাইচাপা পড়বে—তবে কেন মিছে গলা ভাঙা! এই যে শ্রুতিভূষণ, প্রণাম!

শুভমস্তু!

শ্রুতিভূষণ মশায়, মহারাজকে একটু বুঝিয়ে বল্‌বেন যে অবসাদ-গ্রস্ত নিরুৎসাহকে লক্ষ্মী পরিহার করেন।

শ্রুতিভূষণ, মন্ত্রী আপনাকে কি বল্‌চেন?

উনি বল্‌চেন লক্ষ্মীর স্বভাব সম্বন্ধে মহারাজকে কিছু উপদেশ দিতে।

আপনার উপদেশ কি?

বৈরাগ্যবারিধিতে একটি চৌপদী আছে—

যে পদ্মে লক্ষ্মীর বাস, দিন অবসানে
সেই পদ্ম মুদে দল সকলেই জানে।
গৃহ যার ফুটে আর মুদে পুনঃপুনঃ
সে লক্ষ্মীরে ত্যাগ কর, শুন মূঢ় শুন!

অহো, আপনার উপদেশের এক ফুৎকারেই আশা-প্রদীপের জ্বলন্ত শিখা নির্ব্বাপিত হ'য়ে যায়। আমাদের আচার্য্য বলেচেন না—

দন্তং গলিতং পলিতং মুণ্ডং
তদপি ন মুঞ্চতি আশাভাণ্ডং!

মহারাজ, আশার কথা যদি তুল্লেন তবে বারিধি থেকে আর একটি চৌপদী শোনাই—

শৃঙ্খল বাঁধিয়া রাখে এই জানি সবে,
আশার শৃঙ্খল কিন্তু অদ্ভুত এ ভবে।
সে যাহারে বাঁধে সেই ঘুরে মরে পাকে,
সে বন্ধন ছাড়ে যারে স্থির হ'য়ে থাকে।

হায় হায় অমূল্য আপনার বাণী! শ্রুতিভূষণকে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা এখনি—ও কি মন্ত্রী, আবার কা'রা গোল করচে?

সেই দুর্ভিক্ষগ্রস্ত প্রজারা।

ওদের এখনি শান্ত হ'তে বল।

তাহ'লে, মহারাজ, শ্রুতিভূষণকে ওদের কাছে পাঠিয়ে দিন না—আমরা ততক্ষণ যুদ্ধের পরামর্শটা—

না, না, যুদ্ধ পরে হবে, শ্রুতিভূষণকে ছাড়তে পারচিনে।

মহারাজ, স্বর্ণমুদ্রা দেবার কথা বল্‌ছিলেন কিন্তু সে দান যে ক্ষয় হ'য়ে যাবে। বৈরাগ্যবারিধি লিখ্‌চেন—

স্বর্ণদান করে যেই করে দুঃখ দান
যত স্বর্ণ ক্ষয় হয় ব্যথা পায় প্রাণ।
শত দাও, লক্ষ দাও, হ'য়ে যায় শেষ,
শূন্য ভাণ্ড ভরি শুধু থাকে মনঃক্লেশ।

আহা শরীর রোমাঞ্চিত হ'ল। প্রভু কি তাহ'লে—

না আমি সহস্রমুদ্রা চাইনে!

দিন্ দিন্ একটু পদধূলি দিন্! সহস্র মুদ্রা চান্ না। এত বড় কথা!

মহারাজ, এই সহস্র মুদ্রা অক্ষয় হ'য়ে যাতে মহারাজের পুণ্যফলকে অসীম করে আমি এমন কিছু চাই! গোধন-সমেত আপনার ঐ কাঞ্চনপুর জনপদটি যদি ব্রহ্মত্রদান করেন কেবলমাত্র ঐটুকুতেই আমি সন্তুষ্ট থাক্‌ব; কারণ বৈরাগ্যবারিধি বল্‌চেন—

বুঝেচি শ্রুতিভূষণ, এর জন্যে আর বৈরাগ্যবারিধির প্রমাণ দরকার নেই। মন্ত্রী, কাঞ্চনপুর জনপদটি যাতে শ্রুতিভূষণের বংশে চিরন্তন—আবার কি, বারবার কেন চীৎকার করচে?

চীৎকারটা বারবার করচে বটে কিন্তু কারণটা একই র'য়ে গেচে! ওরা সেই মহারাজের দুর্ভিক্ষকাতর প্রজা।

মহারাজ, ব্রাহ্মণী মহারাজকে বল্‌তে বলেচেন তিনি তাঁর সর্ব্বাঙ্গে মহারাজের যশোঝঙ্কার ধ্বনিত করতে চান কিন্তু আভরণের অভাব-বশত শব্দ বড়ই ক্ষীণ হ'য়ে বাজ্‌চে।

মন্ত্রী!

মহারাজ!

ব্রাহ্মণীর আভরণের অভাবমোচন করতে যেন বিলম্ব না হয়।

আর মন্ত্রীমশায়কে বলে' দিন, আমরা সর্ব্বদাই পরমার্থ-চিন্তায় রত, বৎসরে বৎসরে গৃহসংস্কারের চিন্তায় মন দিতে হ'লে চিত্তবিক্ষেপ হয় অতএব রাজ-শিল্পী যদি আমার গৃহটি সুদৃঢ় করে' নির্ম্মাণ করে' দেয় তাহ'লে তা'র তলদেশে শান্তমনে বৈরাগ্য সাধন করতে পারি।

মন্ত্রী, রাজশিল্পীকে যথাবিধি আদেশ করে' দাও।

মহারাজ, এবৎসর রাজকোষে ধনাভাব।

সে ত প্রতিবৎসরেই শুনে আস্‌চি। মন্ত্রী, তোমাদের উপর ভার ধন বৃদ্ধি করবার, আর আমার উপর ভার অভাব বৃদ্ধি করবার! এই দুইয়ের মিলে সন্ধি করে' হয় ধনাভাব।

মহারাজ, মন্ত্রীকে দোষ দিতে পারিনে। উনি দেখ্‌চেন

আপনার অর্থ, আর আমরা দেখ্‌চি আপনার পরমার্থ
সুতরাং উনি যেখানে দেখ্‌তে পাচ্চেন অভাব, আমরা
সেইখানে দেখ্‌তে পাচ্চি ধন। বৈরাগ্যবারিধিতে
লিখ্‌চেন—

রাজকোষ পূর্ণ হ'য়ে তবু শূন্যমাত্র,
যোগ্য হাতে যাহা পড়ে লভে সৎপাত্র।
পাত্র নাই ধন আছে, থেকেও না থাকা,
পাত্র হাতে ধন, সেই রাজকোষ পাকা।

আহা হা! আপনাদের সঙ্গ অমূল্য।

কিন্তু মহারাজের সঙ্গ কত মূল্যবান, শ্রুতিভূষণমশায় তা
বেশ জানেন। তাহ'লে আসুন শ্রুতিভূষণ, .বৈরাগ্য-
সাধনের ফর্দ্দ যা দিলেন সেটা সংগ্রহ করা যাক্!

চলুন তবে চলুন, বিলম্বে কাজ নেই। মন্ত্রী এই সামান্য
বিষয় নিয়ে যখন এত অধীর হয়েচেন তখন ওঁকে শান্ত
করে' এখনি আবার ফিরে আস্‌চি!

আমার সর্ব্বদা ভয় হয় পাছে আপনি রাজাশ্রয় ছেড়ে
অরণ্যে চলে' যান!

মহারাজ, মনটা মুক্ত থাক্‌লে কিছুই ত্যাগ করতে হয় না
—এই রাজগৃহে যতক্ষণ আমার সন্তোষ আছে ততক্ষণ
এই আমার অরণ্য! এক্ষণে তবে আসি! মন্ত্রী, চল
চল।

ঐ যে কবিশেখর আস্‌চে—আমার তপস্যা ভাঙলে বুঝি!

ওকে ভয় করি! ওরে পাকাচুল, কান ঢেকে থাক্‌রে,
কবির বাণী যেন প্রবেশপথ না পায়!

মহারাজ, আপনার এই কবিকে নাকি বিদায় করতে চান?

কবিত্ব যে বিদায়-সংবাদ পাঠালে এখন কবিকে রেখে হবে কি!

সংবাদটা কোথায় পৌঁছল?

ঠিক আমার কানের উপর! চেয়ে দেখ!

পাকাচুল? ওটাকে আপনি ভাব্‌চেন কি?

যৌবনের শ্যামকে মুছে ফেলে শাদা করার চেষ্টা!

কারিকরের মতলব বোঝেন নি। ঐ শাদা ভূমিকার উপরে আবার নূতন রং লাগ্‌বে।

কই রঙের আভাস ত দেখিনে!

সেটা গোপনে আছে। শাদার প্রাণের মধ্যে সব রঙেরই বাসা।

চুপ, চুপ, চুপ কর, কবি, চুপ কর!

মহারাজ, এ যৌবন ম্লান যদি হ'ল ত হোক না! আরেক যৌবনলক্ষ্মী আস্‌চেন, মহারাজের কেশে তিনি তাঁর শুভ্র মল্লিকার মালা পাঠিয়ে দিয়েচেন—নেপথ্যে সেই মিলনের আয়োজন চল্‌চে।

আরে, আরে, তুমি দেখ্‌চি বিপদ বাধাবে, কবি! যাও যাও তুমি যাও—ওরে শ্রুতিভূষণকে দৌড়ে ডেকে নয়ে আয়!

তাঁকে কেন, মহারাজ ?

বৈরাগ্যসাধন করব।

সেই খবর শুনেই ত ছুটে এসেচি, এ সাধনায় আমিই ত আপনার সহচর !

তুমি ?

হাঁ মহারাজ, আমরাই ত পৃথিবীতে আছি মানুষের আসক্তি মোচন করবার জন্য।

বুঝ্‌তে পারলুম না।

এতদিন কাব্য শুনিয়ে এলুম তবু বুঝ্‌তে পারলে না ? আমাদের কথার মধ্যে বৈরাগ্য, সুরের মধ্যে বৈরাগ্য, ছন্দের মধ্যে বৈরাগ্য ! সেইজন্যেই ত লক্ষ্মী আমাদের ছাড়েন, আমরাও লক্ষ্মীকে ছাড়বার জন্যে যৌবনের কানে মন্ত্র দিয়ে বেড়াই !

তোমাদের মন্ত্রটা কি ?

আমাদের মন্ত্র এই যে, ওরে ভাই ঘরের কোণে তোদের থলি থালি আঁক্‌ড়ে বসে' থাকিস্‌নে— বেরিয়ে পড়্‌ প্রাণের সদর রাস্তায়, ওরে যৌবনের বৈরাগীর দল !

সংসারের পথটাই বুঝি তোমার বৈরাগ্যের পথ হ'ল ?

তা নয় ত কি মহারাজ ? সংসারে যে কেবলি সরা, কেবলি চলা ; তা'রই সঙ্গে সঙ্গে যে-লোক একতারা বাজিয়ে নৃত্য করতে করতে কেবলি সরে, কেবলি

চলে, সেই ত বৈরাগী, সেই ত পথিক, সেই ত কবি-বাউলের চেলা !

তাহ'লে শান্তি পাব কি করে' ?

শান্তির উপরে ত আমাদের একটুও আসক্তি নেই, আমরা যে বৈরাগী।

কিন্তু ধ্রুব সম্পদটি ত পাওয়া চাই !

ধ্রুব সম্পদে আমাদের একটুও লোভ নেই, আমরা যে বৈরাগী।

সে কি কথা ?—বিপদ বাধাবে দেখ্‌চি ! ওরে শ্রুতি-ভূষণকে ডাক্ !

আমরা অধ্রুব মন্ত্রের বৈরাগী। আমরা কেবলি ছাড়তে ছাড়তে পাই, তাই ধ্রুবটাকে মানিনে।

এ তোমার কি রকম কথা ?

পাহাড়ের গুহা ছেড়ে যে নদী বেরিয়ে পড়েচে তা'র বৈরাগ্য কি দেখেন নি মহারাজ ? সে অনায়াসে আপনাকে ঢেলে দিতে-দিতেই আপনাকে পায়। নদীর পক্ষে ধ্রুব হচ্চে বালির মরুভূমি—তা'র মধ্যে সেঁধলেই বেচারা গেল। তা'র দেওয়া যেম্‌নি ঘোচে অম্‌নি তা'র পাওয়াও ঘোচে।

ঐ শোন কবিশেখর, কান্না শোন। ঐ ত তোমার সংসার !

ওরা মহারাজের দুর্ভিক্ষকাতর প্রজা।

আমার প্রজা ? বল কি কবি ? সংসারের প্রজা ওরা
এ দুঃখ কি আমি সৃষ্টি করেচি ? তোমার কবিত্ব-
মন্ত্রের বৈরাগীরা এ দুঃখের কি প্রতিকার করতে পারে
বল ত ?

মহারাজ, এ দুঃখকে ত আমরাই বহন করতে পারি !
আমরা যে নিজেকে ঢেলে দিয়ে ব'য়ে চলেচি। নদী
কেমন করে' ভার বহন করে দেখেচেন ত ? মাটির
পাকা রাস্তাই হ'ল যাকে বলেন ধ্রুব, তাই ত ভারকে
কেবলি সে ভারী করে' তোলে ; বোঝা তা'র উপর
দিয়ে আর্ত্তনাদ করতে করতে চলে, আর তা'রও বুক
ক্ষত বিক্ষত হ'য়ে যায়। নদী আনন্দে ব'য়ে চলে, তাই
ত সে আপনার ভার লাঘব করেচে বলেই বিশ্বের ভার
লাঘব করে। আমরা ডাক দিয়েচি সকলের সব সুখ
দুঃখকে চলার লীলায় ব'য়ে নিয়ে যাবার জন্যে।
আমাদের বৈরাগীর ডাক। আমাদের বৈরাগীর সর্দ্দার
যিনি, তিনি এই সংসারের পথ দিয়ে নেচে চলেচেন
—তাই ত বসে' থাক্‌তে পারিনে,—

পথ দিয়ে কে যায় গো চলে'
ডাক দিয়ে সে যায়।
আমার ঘরে থাকাই দায়।

যাক্‌গে শ্রুতিভূষণ ! ওহে কবিশেখর, আমার কি মুস্কিল
হয়েচে জান ? তোমার কথা আমি এক বিন্দুবিসর্গও

বুঝ্‌তে পারিনে অথচ তোমার সুরটা আমার বুকে গিয়ে বাজে। আর শ্রুতিভূষণের ঠিক তা'র উল্টো; তা'র কথাগুলো খুবই স্পষ্ট বোঝা যায় হে,—ব্যাকরণের সঙ্গেও মেলে—কিন্তু সুরটা—সে কি আর বল্‌ব!

মহারাজ, আমাদের কথা ত বোঝ্‌বার জন্যে হয় নি, বাজ্‌বার জন্যে হয়েচে!

এখন তোমার কাজটা কি বল ত কবি?

মহারাজ, ঐ যে তোমার দরজার বাইরে কান্না উঠেচে ঐ কান্নার মাঝখানদিয়ে এখন ছুট্‌তে হবে।

ওহে, কবি, বল কি তুমি! এ সমস্ত কেজো লোকের কাজ, দুর্ভিক্ষের মধ্যে তোমরা কি করবে?

কেজো লোকেরা কাজ বেসুরো করে' ফেলে, তাই, সুর বাঁধ্‌বার জন্যে আমাদের ছুটে আস্‌তে হয়!

ওহে কবি, আর একটু স্পষ্ট ভাষায় কথা কও!

মহারাজ, ওরা কর্ত্তব্যকে ভালবাসে বলে' কাজ করে আমরা প্রাণকে ভালবাসি বলে' কাজ করি—এইজন্যে ওরা আমাদের গাল দেয়, বলে নিষ্কর্ম্মা, আমরা ওদের গাল দিই, বলি নির্জ্জীব!

কিন্তু জিৎটা হ'ল কা'র?

আমাদের, মহারাজ, আমাদের!

তা'র প্রমাণ?

পৃথিবীতে যা কিছু সকলের বড় তা'র প্রমাণ নেই।

পৃথিবীতে যত কবি যত কবিত্ব সমস্ত যদি ধুয়ে মুছে ফেল্‌তে পার তাহ'লেই প্রমাণ হবে এতদিন কেজো লোকেরা তাদের কাজের জোরটা কোথা থেকে পাচ্ছিল, তাদের ফসলক্ষেতের মূলের রস জুগিয়ে এসেচে কা'রা! মহারাজ, আপনার দরজার বাইরে ঐ যে কান্না উঠেচে সে কান্না থামায় কা'রা? যারা বৈরাগ্যবারিধির তলায় ডুব মেরেচে তা'রা নয়, যারা বিষয়কে আঁকড়ে ধরে' রয়েচে তা'রা নয়, যারা কাজের কৌশলে হাত পাকিয়েচে তা'রাও নয়, যারা কর্ত্তব্যের শুষ্ক রুদ্রাক্ষের মালা জপ্‌চে তা'রাও নয়, যারা অপর্য্যাপ্ত প্রাণকে বুকের মধ্যে পেয়েচে বলেই জগতের কিছুতে যাদের উপেক্ষা নেই, জয় করে তা'রা, ত্যাগ করেও তা'রাই, বাঁচ্‌তে জানে তা'রা, মরতেও জানে তা'রা, তা'রা জোরের সঙ্গে দুঃখ পায়, তা'রা জোরের সঙ্গে দুঃখ দূর করে,— সৃষ্টি করে তা'রাই, কেন না তাদের মন্ত্র আনন্দের মন্ত্র, সব চেয়ে বড় বৈরাগ্যের মন্ত্র!

ওহে কবি, তা'হলে তুমি আমাকে কি করতে বল?

উঠ্‌তে বলি, মহারাজ, চল্‌তে বলি! ঐ যে কান্না, ওযে প্রাণের কাছে প্রাণের আহ্বান! কিছু করতে পারব কি না সে পরের কথা—কিন্তু ডাক শুনে যদি ভিতরে সাড়া না দেয়, প্রাণ যদি না দুলে ওঠে তবে অকর্ত্তব্য হ'ল বলে' ভাবনা নয়, তবে ভাবনা মরেচি বলে'!

কিন্তু মরবই যে, কবিশেখর, আজ হোক্ আর কাল হোক্।

কে বল্লে মহারাজ, মিথ্যা কথা! যখন দেখ্‌চি বেঁচে আছি, তখন জান্‌চি যে বাঁচ্‌বই;—যে আপনার সেই বাঁচাটাকে সব দিক থেকে যাচাই করে' দেখ্‌লে না সেই বলে মরব—সেই বলে "নলিনীদলগত জলমতি তরলং তদ্বৎজীবনমতিশয় চপলং।"

কি বল হে, কবি, জীবন চপল নয়?

চপল বই কি, কিন্তু অনিত্য নয়। চপল জীবনটা চিরদিন চপলতা করতে-করতেই চল্‌বে। মহারাজ, আজ তুমি তা'র চপলতা বন্ধ করে' মরবার পালা অভিনয় আরম্ভ করতে বসেচ?

ঠিক বল্‌চ কবি? আমরা বাঁচ্‌বই?

বাঁচ্‌বই!

যদি বাঁচ্‌বই তবে বাঁচার মত করেই বাঁচ্‌তে হবে—কি বল!

হাঁ মহারাজ!

প্রতিহারী!

কি মহারাজ!

ডাক, ডাক, মন্ত্রীকে এখনি ডাক।

কি মহারাজ।

মন্ত্রী, আমাকে এতক্ষণ বসিয়ে রেখেচ কেন?

ব্যস্ত ছিলুম।

কিসে ?

বিজয়বর্ম্মাকে বিদায় করে' দিতে।

কি মুস্কিল! বিদায় করবে কেন? যুদ্ধের পরামর্শ আছে যে!

চীনের সম্রাটের দূতের জন্যে বাহনের ব্যবস্থা—

কেন, বাহন কিসের ?

মহারাজের ত দর্শন হবে না তাই তাঁকে ফিরিয়ে দেবার—

মন্ত্রী, আশ্চর্য্য করলে দেখ্‌চি—রাজকার্য্য কি এমনি করেই চল্‌বে ? হঠাৎ তোমার হ'ল কি ?

তা'র পরে আমাদের কবিশেখরের বাসা ভাঙবার জন্যে লোকের সন্ধান করছিলুম—আর ত কেউ রাজী হয় না, কেবল দিঙ্‌নাগের বংশে যাঁরা অলঙ্কারের আর ব্যাকরণ শাস্ত্রের টোল খুলেচেন তাঁরা দলে-দলে সাবল হাতে ছুটে আস্‌চেন।

সর্ব্বনাশ! মন্ত্রী, পাগল হ'লে না কি ? কবিশেখরের বাসা ভেঙে দেবে ?

ভয় নেই মহারাজ, বাসাটা একেবারে ভাঙতে হবে না। শ্রুতিভূষণ খবর পেয়েই স্থির করেচেন কবিশেখরের ঐ বাসাটা আজ থেকে তিনিই দখল করবেন!

কি বিপদ! সরস্বতী যে তা হ'লে তাঁর বীণাখানা আমার মাথার উপর আছড়ে ভেঙে ফেল্‌বেন! না, না, সে হবে না!

আর একটা কাজ ছিল—শ্রুতিভূষণকে কাঞ্চনপুরের সেই বৃহৎ জনপদটা—

ও হো, সেই জনপদটার দানপত্র তৈরি হয়েচে বুঝি? সেটা কিন্তু আমাদের এই কবিশেখরকে—

সে কি কথা মহারাজ! আমার পুরস্কার ত জনপদ নয়—আমরা জন-পদের সেবা ত কখনো করিনি—তাই ঐ পদপ্রাপ্তিটা আশাও করিনে।

আচ্ছা, তবে ওটা শ্রুতিভূষণের জন্যেই থাক্!

আর, মহারাজ, দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাদের বিদায় করবার জন্যে সৈন্যদলকে আহ্বান করেচি।

মন্ত্রী, আজ দেখ্‌চি পদে পদে তোমার বুদ্ধির বিভ্রাট ঘট্‌চে। দুর্ভিক্ষকাতর প্রজাদের বিদায় করবার ভালো উপায় অন্ন দিয়ে, সৈন্য দিয়ে নয়।

মহারাজ!

কি প্রতিহারী!

বৈরাগ্যবারিধি নিয়ে শ্রুতিভূষণ এসেচেন!

সর্ব্বনাশ করলে! ফেরাও তা'কে ফেরাও! মন্ত্রী, দেখো হঠাৎ যেন শ্রুতিভূষণ না এসে পড়ে! আমার দুর্ব্বল মন, হয়ত সামলাতে পারব না, হয়ত অন্যমনস্ক হ'য়ে বৈরাগ্যবারিধির ডুব-জলে গিয়ে পড়ব। ওহে কবি-শেখর, আমাকে কিছু মাত্র সময় দিয়ো না—প্রাণটাকে জাগিয়ে রাখ—একটা যা-হয়-কিছু কর—যেমন এই

ফাল্গুনের হাওয়াটা যা-খুসি-তাই করচে তেম্‌নিতর!
হাতে কিছু তৈরি আছে হে? একটা নাটক, কিম্বা
প্রকরণ, কিম্বা রূপক, কিম্বা ভাণ, কিম্বা—

তৈরি আছে—কিন্তু সেটা নাটক, কি প্রকরণ, কি রূপক,
কি ভাণ তা ঠিক বল্‌তে পারব না!

যা রচনা করেচ তা'র অর্থ কি কিছু গ্রহণ করতে পারব?

না মহারাজ! রচনা ত অর্থ গ্রহণ করবার জন্যে নয়।

তবে?

সেই রচনাকেই গ্রহণ করবার জন্যে। আমি ত বলেচি
আমার এ সব জিনিষ বাঁশির মত, বোঝ্‌বার জন্যে
নয়, বাজ্‌বার জন্যে।

বল কি হে কবি, এর মধ্যে তত্ত্বকথা কিছুই নেই?

কিচ্ছু না!

তবে তোমার ও রচনাটা বল্‌চে কি?

ও বল্‌চে, আমি আছি! শিশু জন্মাবামাত্র চেঁচিয়ে ওঠে,
সেই কান্নার মানে জানেন মহারাজ? শিশু হঠাৎ
শুন্‌তে পায় জলস্থল আকাশ তা'কে চারদিক থেকে
বলে' উঠেচে—"আমি আছি!"—তা'রই উত্তরে ঐ
প্রাণটুকু সাড়া পেয়ে বলে' ওঠে—"আমি আছি!"
আমার রচনা সেই সদ্যোজাত শিশুর কান্না, বিশ্ব-
ব্রহ্মাণ্ডের ডাকের উত্তরে প্রাণের সাড়া!

তা'র বেশি আর কিচ্ছু না?

কিচ্ছু না! আমার রচনার মধ্যে প্রাণ বলে' উঠেচে, সুখে দুঃখে, কাজে বিশ্রামে, জন্মে মৃত্যুতে, জয়ে পরাজয়ে, লোকে লোকান্তরে জয় এই আমি-আছির জয়, জয় এই আনন্দময় আমি-আছির জয়!

ওহে কবি, তত্ত্ব না থাক্‌লে আজকের দিনে তোমার এ জিনিষ চল্‌বে না।

সে কথা সত্য মহারাজ! আজকের দিনের আধুনিকেরা উপার্জ্জন করতে চায় উপলব্ধি করতে চায় না! ওরা বুদ্ধিমান!

তা হ'লে শ্রোতা কাদের ডাকা যায়? আমার রাজবিদ্যালয়ের নবীন ছাত্রদের ডাক্‌ব কি?

না মহারাজ, তা'রা কাব্য শুনেও তর্ক করে! নতুন শিং-ওঠা হরিণশিশুর মত ফুলের গাছকেও গুঁতো মেরে মেরে বেড়ায়!

তবে?

ডাক দেবেন যাদের চুলে পাক ধরেচে।

সে কি কথা কবি?

হাঁ মহারাজ, সেই প্রৌঢ়দেরই যৌবনটি নিরাসক্ত যৌবন। তা'রা ভোগবতী পার হ'য়ে আনন্দলোকের ডাঙা দেখ্‌তে পেয়েচে। তা'রা আর ফল চায় না, ফল্‌তে চায়!

ওহে কবি, তবে ত এতদিন পরে ঠিক আমার কাব্য

শোন্‌বার বয়েস হয়েচে। বিজয়বর্ম্মাকেও ডাকা যাক্!

ডাকুন্।

চীন-সম্রাটের দূতকে?

ডাকুন!

আমার শ্বশুর এসেচেন শুন্‌চি—

তাঁকে ডাক্‌তে পারেন—কিন্তু শ্বশুরের ছেলেগুলির সম্বন্ধে সন্দেহ আছে।

তাই বলে' শ্বশুরের মেয়ের কথাটা ভুলো না কবি।

আমি ভুল্‌লেও তাঁর সম্বন্ধে ভুল হবার আশঙ্কা নেই।

আর শ্রুতিভূষণকে?

না মহারাজ, তাঁর প্রতি ত আমার কিছুমাত্র বিদ্বেষ নেই, তাঁকে কেন দুঃখ দিতে যাব?

কবি তাহ'লে প্রস্তুত হওগে!

না মহারাজ, আমি অপ্রস্তুত হ'য়েই কাজ করতে চাই। বেশি বানাতে গেলেই সত্য ছাই-চাপা পড়ে।

চিত্রপট—

চিত্রপটে প্রয়োজন নেই—আমার দরকার চিত্তপট—সেইখানে শুধু সুরের তুলি বুলিয়ে ছবি জাগাব।

এ নাটকে গান আছে না কি?

হাঁ মহারাজ, গানের চাবি দিয়েই এর এক-একটি অঙ্কের দরজা খোলা হবে।

গানের বিষয়টা কি ?

শীতের বস্ত্রহরণ।

এ ত কোনো পুরাণে পড়া যায় নি।

বিশ্বপুরাণে এই গীতের পালা আছে। ঋতুর নাট্যে বৎসরে বৎসরে শীত-বুড়োটার ছদ্মবেশ খসিয়ে তা'র বসন্ত-রূপ প্রকাশ করা হয়, দেখি পুরাতনটাই নূতন।

এ ত গেল গানের কথা, বাকিটা ?

বাকিটা প্রাণের কথা।

সে কি-রকম ?

যৌবনের দল একটা বুড়োর পিছনে ছুটে চলেচে। তা'কে ধরবে বলে' পণ। গুহার মধ্যে ঢুকে যখন ধরলে তখন—

তখন কি দেখ্‌লে ?

কি দেখ্‌লে সেটা যথাসময়ে প্রকাশ হবে।

কিন্তু একটা কথা বুঝ্‌তে পারলুম না। তোমার গানের বিষয় আর তোমার নাট্যের বিষয়টা আলাদা না কি ?

না মহারাজ—বিশ্বের মধ্যে বসন্তের যে লীলা চল্‌চে আমাদের প্রাণের মধ্যে যৌবনের সেই একই লীলা। বিশ্বকবির সেই গীতিকাব্য থেকেই ত ভাব চুরি করেচি।

তোমার নাটকের প্রধান পাত্র কে কে ?

এক হচ্চে সর্দ্দার।

সে কে ?

যে আমাদের কেবলই চালিয়ে নিয়ে যাচ্চে। আর একজন হচ্চে চন্দ্রহাস।

সে কে ?

যাকে আমরা ভালবাসি—আমাদের প্রাণকে সেই প্রিয় করেচে।

আর কে আছে ?

দাদা—প্রাণের আনন্দটাকে যে অনাবশ্যক বোধ করে, কাজটাকেই যে সার মনে করেচে।

আর কেউ আছে ?

আর আছে এক অন্ধ বাউল।

অন্ধ ?

হাঁ মহারাজ, চোখ দিয়ে দেখে না বলেই সে তা'র দেহ মন প্রাণ সমস্ত দিয়ে দেখে।

তোমার নাটকের প্রধান পাত্রদের মধ্যে আর কে আছে ?

আপনি আছেন।

আমি ?

হাঁ মহারাজ, আপনি যদি এর ভিতরে না থেকে বাইরেই থাকেন তাহ'লে কবিকে গাল দিয়ে বিদায় করে' ফের শ্রুতিভূষণকে নিয়ে বৈরাগ্যবারিধির চৌপদী ব্যাখ্যায় মন দেবেন। তাহ'লে মহারাজের

আর মুক্তির আশা নেই। স্বয়ং বিশ্বকবি হার মান্‌বেন—ফাল্গুনের দক্ষিণ হাওয়া দক্ষিণা না পেয়েই বিদায় হবে।

ফাল্গুনী

প্রথম দৃশ্যের গীতি-ভূমিকা

নবীনের আবির্ভাব

১

বেণুবনের গান

ওগো দখিন হাওয়া, পথিক হাওয়া,
দোদুল দোলায় দাও দুলিয়ে!
নূতন পাতার পুলক-ছাওয়া
পরশখানি দাও বুলিয়ে।
আমি পথের ধারের ব্যাকুল-বেণু,
হঠাৎ তোমার সাড়া পেনু,
আহা, এস আমার শাখায় শাখায়
প্রাণের গানের ঢেউ তুলিয়ে।

ওগো দখিন হাওয়া, পথিক হাওয়া,
পথের ধারে আমার বাসা।
জানি তোমার আসা-যাওয়া,
শুনি তোমার পায়ের ভাষা।

আমায়　　তোমার ছোঁওয়া লাগ্‌লে পরে
একটুকুতেই কাঁপন ধরে,
আহা,　　কানে কানে একটি কথায়
সকল কথা নেয় ভুলিয়ে।

২

পাখীর নীড়ের গান

আকাশ আমায় ভর্‌ল আলোয়,
আকাশ আমি ভরব গানে।
সুরের আবীর হান্‌ব হাওয়ায়,
নাচের আবীর হাওয়ায় হানে।
ওরে পলাশ, ওরে পলাশ,
রাঙা রঙের শিখায় শিখায়
দিকে দিকে আগুন জ্বলাস্‌,
আমার মনের রাগরাগিণী
রাঙা হ'ল রঙীন তানে।

দখিন হাওয়ায় কুসুমবনের
বুকের কাঁপন থামে না যে।
নীল আকাশে সোনার আলোয়
কচি পাতার নূপুর বাজে।

ওরে শিরীষ, ওরে শিরীষ,
মৃদু হাসির অন্তরালে
গন্ধজালে শূন্য ঘিরিস্!
তোমার গন্ধ আমার কণ্ঠে
আমার হৃদয় টেনে আনে।

৩

ফুলন্ত গাছের গান

ওগো নদী, আপন বেগে
পাগল পারা,
আমি স্তব্ধ চাঁপার তরু
গন্ধভরে তন্দ্রাহারা।
আমি সদা অচল থাকি,
গভীর চলা গোপন রাখি,
আমার চলা নবীন পাতায়,
আমার চলা ফুলের ধারা।

ওগো নদী, চলার বেগে
পাগল পারা,
পথে পথে বাহির হ'য়ে
আপন-হারা!

আমার চলা যায় না বলা,
আলোর পানে প্রাণের চলা,
আকাশ বোঝে আনন্দ তা'র,
বোঝে নিশার নীরব তারা!

সূত্রপাত

প্রথম দৃশ্য

পথ

যুবকদলের প্রবেশ

গান

ওরে ভাই, ফাগুন লেগেছে বনে বনে,—
ডালে ডালে ফুলে ফলে পাতায় পাতায় রে,
আড়ালে আড়ালে কোণে কোণে।
রঙে রঙে রঙিল আকাশ,
গানে গানে নিখিল উদাস,
যেন চল-চঞ্চল নব পল্লবদল
মর্ম্মরে মোর মনে মনে।
ফাগুন লেগেছে বনে বনে।

হের হের অবনীর রঙ্গ,
গগনের করে তপোভঙ্গ।
হাসির আঘাতে তা'র মৌন রহে না আর
কেঁপে কেঁপে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে।

বাতাস ছুটিছে বনময় রে,
ফুলের না জানে পরিচয় রে।
তাই বুঝি বারে বারে কুঞ্জের দ্বারে দ্বারে
শুধায়ে ফিরিছে জনে জনে।
ফাগুন লেগেচে বনে বনে॥

ফাগুনের গুণ আছেরে, ভাই, গুণ আছে!

বুঝ্‌লি কি করে'?

নইলে আমাদের এই দাদাকে বাইরে টেনে আনে কিসের জোরে?

তাই ত—দাদা আমাদের চৌপদীছন্দের বোঝাই নৌকো —ফাগুনের গুণে বাঁধা পড়ে' কাগজ কলমের উল্টো মুখে উজিয়ে চলেচে।

চন্দ্রহাস। ওরে ফাগুনের গুণ নয়রে! আমি চন্দ্রহাস, দাদার তুলট কাগজের হল্‌দে পাতাগুলো পিয়াল বনের সবুজ পাতার মধ্যে লুকিয়ে রেখেচি; দাদা খুঁজ্‌তে বের হয়েচে।

তুলট কাগজগুলো গেচে আপদ গেচে কিন্তু দাদার শাদা চাদরটা ত কেড়ে নিতে হচ্চে।

চন্দ্রহাস। তাই ত, আজ পৃথিবীর ধূলোমাটি পর্য্যন্ত শিউরে উঠেচে আর এ পর্য্যন্ত দাদার গায়ে বসন্তর আমেজ লাগ্‌ল না!

দাদা। আহা কি মুস্কিল! বয়েস হয়েচে যে!

পৃথিবীর বয়েস অন্তত তোমার চেয়ে কম নয়, কিন্তু নবীন হ'তে ওর লজ্জা নেই।

চন্দ্রহাস। দাদা, তুমি বসে' বসে' চৌপদী লিখ্‌চ, আর এই চেয়ে দেখ সমস্ত জলস্থল কেবল নবীন হবার তপস্যা করচে।

দাদা, তুমি কোটরে বসে' কবিতা লেখ কি করে'?

দাদা। আমার কবিতা ত তোদের কবিশেখরের কল্পমঞ্জরীর মত সৌখীন কাব্যের ফুলের চাষ নয় যে, কেবল বাইরের হাওয়ায় দোল খাবে। এতে সার আছেরে, ভার আছে।

যেমন কচু। মাটির দখল ছাড়ে না।

দাদা। শোন্ তবে বলি,—

ঐরে দাদা এবার চৌপদী বের করবে!

এলরে এল চৌপদী এল! আর ঠেকানো গেল না।

ভো ভো পথিকবৃন্দ, সাবধান, দাদার মত্ত চৌপদী চঞ্চল হ'য়ে উঠেচে।

চন্দ্রহাস। না দাদা, তুমি ওদের কথায় কান দিয়ো না। শোনাও তোমার চৌপদী! কেউ না টিঁক্‌তে পারে, আমি শেষ পর্য্যন্ত টিঁকে থাক্‌ব। আমি ওদের মত কাপুরুষ নই।

আচ্ছা বেশ, আমরাও শুন্‌ব।

যেমন করে' পারি শুন্‌বই।

খাড়া দাঁড়িয়ে শুন্‌ব। পালাব না।

চৌপদীর চোট যদি লাগে ত বুকে লাগ্‌বে, পিঠে লাগ্‌বে না।

কিন্তু দোহাই দাদা, একটা! তা'র বেশি নয়।

দাদা। আচ্ছা, তবে তোরা শোন্‌!

বংশে শুধু বংশী যদি বাজে
বংশ তবে ধ্বংস হবে লাজে।
বংশ নিঃস্ব নহে বিশ্বমাঝে
যে হেতু সে লাগে বিশ্বকাজে।

আর একটু ধৈর্য্য ধর ভাই, এর মানেটা—

আবার মানে!

একে চৌপদী—তা'র উপর আবার মানে!

দাদা। একটু বুঝিয়ে দিই—অর্থাৎ বাঁশে যদি কেবলমাত্র বাঁশিই বাজ্‌ত তাহ'লে—

না, আমরা বুঝ্‌ব না!

কোনোমতেই বুঝ্‌ব না!

কা'র সাধ্য আমাদের বোঝায়!

আমরা কিচ্ছু বুঝ্‌ব না বলেই আজ বেরিয়ে পড়েচি।

আজ কেউ যদি আমাদের জোর করে' বোঝাতে চায় তাহ'লে আমরা জোর করে' ভুল বুঝ্‌ব।

দাদা। ও শ্লোকটার অর্থ হচ্চে এই যে, বিশ্বের হিত যদি না করি তবে—

তবে ? তবে বিশ্ব হাঁফ ছেড়ে বাঁচে !

দাদা। ঐ কথাটাকেই আর একটু স্পষ্ট করে' বলেচি—

অসংখ্য নক্ষত্র জ্বলে সশঙ্ক নিশীথে।
অম্বরে লম্বিত তারা লাগে কা'র হিতে ?
শূন্যে কোন্ পুণ্য আছে আলোক বাঁটিতে ?
মর্ত্ত্যে এলে কর্ম্মে লাগে মাটিতে হাঁটিতে।

ওহে তবে আমাদের কথাটাকেও আর একটু পষ্ট করে' বল্‌তে হ'ল দেখ্‌চি ! ধর দাদাকে ধর—ওকে আড়কোলা করে' নিয়ে চল ওর কোটরে !

দাদা। তোরা অত ব্যস্ত হচ্চিস্ কেন বল্‌ত ? বিশেষ কাজ আছে ?

বিশেষ কাজ।

অত্যন্ত জরুরি।

দাদা। কাজটা কি শুনি ?

বসন্তের ছুটিতে আমাদের খেলাটা কি হবে তাই খুঁজে বের করতে বেরিয়েচি।

দাদা। খেলা ? দিন রাতই খেলা ?

সকলের গান

মোদের যেমন খেলা তেম্‌নি যে কাজ
জানিস্‌নে কি ভাই ?
তাই কাজকে কভু আমরা না ডরাই।

খেলা মোদের লড়াই করা,
খেলা মোদের বাঁচা মরা,
খেলা ছাড়া কিছুই কোথাও নাই।

ঐ যে আমাদের সর্দ্দার আস্‌চে, ভাই !

আমাদের সর্দ্দার !

সর্দ্দার। কিরে ভারি গোল বাধিয়েচিস্‌ যে !

চন্দ্রহাস। তাই বুঝি থাক্‌তে পারলে না ?

সর্দ্দার। বেরিয়ে আস্‌তে হ'ল।

ঐ জন্যেই গোল করি।

সর্দ্দার। ঘরে বুঝি টি'ক্‌তে দিবি নে ?

তুমি ঘরে টি'ক্‌লে আমরা বাইরে টি'কি কি করে' ?

চন্দ্রহাস। এত বড় বাইরেটা পত্তন করতে ত চন্দ্রসূর্য্যতারা কম খরচ হয় নি, এটাকে আমরা যদি কাজে লাগাই তবে বিধাতার মুখরক্ষা হবে।

সর্দ্দার। তোদের কথাটা কি হচ্চে বল্‌ ত ?

কথাটা হচ্চে এই :—

মোদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ
জানিস্‌ নে কি ভাই ?

সর্দ্দার

গান

খেল্‌তে খেল্‌তে ফুটেচে ফুল,
খেল্‌তে খেল্‌তে ফল যে ফলে,
খেলারই ঢেউ জলে স্থলে।

ভয়ের ভীষণ রক্তরাগে
খেলার আগুন যখন্ লাগে
ভাঙাচোরা জ্বলে' যে হয় ছাই।

সকলে

মোদের যেমন খেলা তেমনি যে কাজ
জানিস্ নে কি ভাই ?

আমাদের এই খেলাটাতেই দাদার আপত্তি।

দাদা। কেন আপত্তি করি বল্‌ব ? শুন্‌বি ?

বল্‌তে পার দাদা, কিন্তু শুন্‌ব কিনা তা বল্‌তে পারিনে।

দাদা।

সময় কাজেরই বিত্ত, খেলা তাহে চুরি।
সিঁধ কেটে দণ্ডপল লহ ভূরি ভূরি।
কিন্তু চোরাধন নিয়ে নাহি হয় কাজ।
তাই ত খেলারে বিজ্ঞ দেয় এত লাজ।

চন্দ্রহাস। বল কি তুমি দাদা ? সময় জিনিষটাই যে খেলা, কেবল চলে' যাওয়াই তা'র লক্ষ্য।

দাদা। তাহ'লে কাজটা ?

চন্দ্রহাস। চলার বেগে যে ধূলো ওড়ে কাজটা তাই, ওটা উপলক্ষ্য।

দাদা। আচ্ছা সর্দ্দার, তুমি এর নিষ্পত্তি করে' দাও।

সর্দ্দার। আমি কিছুরই নিষ্পত্তি করিনে। সঙ্কট থেকে সঙ্কটে নিয়ে চলি—ঐ আমার সর্দ্দারি।

দাদা। সব জিনিষের সীমা আছে কিন্তু তোদের যে কেবলি ছেলেমান্‌ষি!

তা'র কারণ, আমরা যে কেবলি ছেলেমানুষ! সব জিনিষের সীমা আছে কেবল ছেলেমান্‌ষির সীমা নেই।

(দাদাকে ঘেরিয়া নৃত্য)

দাদা। তোদের কি কোনোকালেই বয়েস হবে না?

না, হবে না বয়েস, হবে না।

বুড়ো হ'য়ে মরব তবু বয়েস হবে না।

বয়েস হ'লেই সেটাকে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে নদী পার করে' দেব।

মাথা মুড়োবার খরচ লাগ্‌বে না ভাই—তা'র মাথাভরা টাক।

গান

আমাদের পাক্‌বে না চুল গো,—মোদের
পাক্‌বে না চুল।
আমাদের ঝরবে না ফুল গো,—মোদের
ঝরবে না ফুল।
আমরা ঠেক্‌ব না ত কোনো শেষে,
ফুরয় না পথ কোনো দেশে রে!
আমাদের ঘুচ্‌বে না ভুল গো,—মোদের
ঘুচ্‌বে না ভুল।

সর্দ্দার

আমরা নয়ন মুদে করব না ধ্যান
করব না ধ্যান।
নিজের মনের কোণে খুঁজ্‌ব না জ্ঞান
খুঁজ্‌ব না জ্ঞান।
আমরা ভেসে চলি স্রোতে স্রোতে
সাগর পানে শিখর হ'তে রে,
আমাদের মিল্‌বে না কূল গো,—মোদের
মিল্‌বে না কূল!

এই উঠ্‌তি বয়সেই দাদার যে রকম মতি গতি, তা'তে কোন্ দিন উনি সেই বুড়োর কাছে মন্তর নিতে যাবেন —আর দেরি নেই!

সর্দ্দার। কোন্ বুড়ো রে?

চন্দ্রহাস। সেই যে মান্ধাতার আমলের বুড়ো। কোন্ গুহার মধ্যে তলিয়ে থাকে, মরবার নাম করে না!

সর্দ্দার। তা'র খবর তোরা পেলি কোথা থেকে?

যার সঙ্গে দেখা হয় সবাই তা'র কথা বলে।

পুঁথিতে তা'র কথা লেখা আছে।

সর্দ্দার। তা'র চেহারাটা কি রকম?

কেউ বলে, সে শাদা, মড়ার মাথার খুলির মত, কেউ বলে, সে কালো, মড়ার চোখের কোটরের মত।

কেন, তুমি কি তা'র খবর রাখ না সর্দ্দার?

সর্দ্দার। আমি তা'কে বিশ্বাস করিনে।

বাঃ, তুমি যে উল্টো কথা বল্লে। সেই বুড়োই ত সব চেয়ে বেশি করে' আছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পাঁজরের ভিতরে তা'র বাসা।

পণ্ডিতজি বলে, বিশ্বাস যদি কাউকে না করতে হয় সে কেবল আমাদের। আমরা আছি কি নেই তা'র কোনো ঠিকানাই নেই।

চন্দ্রহাস। আমরা যে ভারি কাঁচা, আমরা যে একেবারে নতুন, ভবের রাজ্যে আমাদের পাকা দলিল কোথায়?

সর্দ্দার। সর্ব্বনাশ করলে দেখ্‌চি? তোরা পণ্ডিতের কাছে আনাগোনা সুরু করচিস্ নাকি?

তা'তে ক্ষতি কি সর্দ্দার?

সর্দ্দার। পুঁথির বুলির দেশে ঢুক্‌লে যে একেবারে ফ্যাকাসে হ'য়ে যাবি। কার্ত্তিকমাসের শাদা কুয়াশার মত। তোদের মনের মধ্যে একটুও রক্তের রং থাক্‌বে না। আচ্ছা এক কাজ কর্! তোরা খেলার কথা ভাব্‌ছিলি?

হাঁ সর্দ্দার, ভাবনায় আমাদের চোখে ঘুম ছিল না।

আমাদের ভাবনার চোটে পাড়ার লোক রাজদরবারে নালিশ করতে ছুটেছিল।

সর্দ্দার। একটা নতুন খেলা বল্‌তে পারি।

বল, বল, বল!

সর্দ্দার। তোরা সবাই মিলে বুড়োটাকে ধরে' নিয়ে আয়!

নতুন বটে, কিন্তু এটা ঠিক খেলা কিনা জানি নে।

সর্দ্দার। আমি বল্‌চি এ তোরা পারবি নে।

পারব না? বল কি! পারবই!

সর্দ্দার। কখনো পারবি নে।

আচ্ছা যদি পারি!

সর্দ্দার। তাহ'লে গুরু বলে' আমি তোদের মান্‌ব।

গুরু! সর্ব্বনাশ! আমাদের সুদ্ধ বুড়ো বানিয়ে দেবে?

সর্দ্দার। তবে কি চাস্‌ বল্‌?

তোমার সর্দ্দারি আমরা কেড়ে নেব।

সর্দ্দার। তাহ'লে ত বাঁচিরে! তোদের সর্দ্দারি কি সোজা কাজ? এমনি অস্থির করে' রেখেচিস্‌ যে হাড়গুলো-সুদ্ধ উল্টোপাল্টা হ'য়ে গেচে।—তাহ'লে রইল কথা?

চন্দ্রহাস। হাঁ রইল কথা! দোলপূর্ণিমার দিনে তা'কে ঝোলার উপর দোলাতে দোলাতে তোমার কাছে হাজির করে' দেব।

কিন্তু তা'কে নিয়ে কি করবে সর্দ্দার?

সর্দ্দার। বসন্ত উৎসব করব।

বল কি? তাহ'লে যে আমের বোলগুলো ধরতে ধরতেই আঁটি হ'য়ে যাবে!

আর কোকিলগুলো প্যাঁচা হ'য়ে সব লক্ষ্মীর খোঁজে বেরবে।

চন্দ্রহাস। আর ভ্রমরগুলো অনুস্বার বিসর্গের চোটে বাতাসটাকে ঘুলিয়ে দিয়ে মন্তর জপ্‌তে থাক্‌বে।

সর্দ্দার। আর তোদের খুলিটা সুবুদ্ধিতে এমনি বোঝাই হবে যে এক পা নড়তে পারবি নে।

সর্ব্বনাশ!

সর্দ্দার। আর ঐ ঝুমকো-লতায় যেমন গাঁঠে গাঁঠে ফুল ধরেচে তেমনি তোদের গাঁঠে গাঁঠে বাতে ধরবে।

সর্ব্বনাশ!

সর্দ্দার। আর তোরা সবাই নিজের দাদা হ'য়ে নিজের কান মল্‌তে থাক্‌বি।

সর্ব্বনাশ!

সর্দ্দার। আর—

আর কাজ কি সর্দ্দার! থাক্ বুড়োধরা খেলা! ওটা বরঞ্চ শীতের দিনেই হবে। এবার তোমাকে নিয়েই—

সর্দ্দার। তোদের দেখ্‌চি আগে থাক্‌তেই বুড়োর ছোঁয়াচ লেগেচে।

কেন? কি লক্ষণটা দেখ্‌লে?

সর্দ্দার। উৎসাহ নেই? গোড়াতেই পেছিয়ে গেলি? দেখ্‌ই না কি হয়!

আচ্ছা, বেশ! রাজি!

চল্‌রে সব চল!

বুড়োর খোঁজে চল্!

যেখানে পাই তা'কে পাকা চুলটার মত পট্ করে' উপ্‌ড়ে আন্‌ব।

শুনেচি উপ্‌ড়ে আনার কাজে তা'রই হাত পাকা। নিড়ুনি তা'র প্রধান অস্ত্র।

ভয়ের কথা রাখ্। খেল্‌তেই যখন বেরলুম তখন ভয়, চৌপদী, পণ্ডিত, পুঁথি এ-সব ফেলে যেতে হবে।

গান

আমাদের ভয় কাহারে ?
বুড়ো বুড়ো চোর ডাকাতে
কি আমাদের করতে পারে ?
আমাদের রাস্তা সোজা, নাইক গলি,
নাইক ঝুলি, নাইক থলি,
ওরা আর যা কাড়ে কাড়ুক, মোদের
পাগ্‌লামি কেউ কাড়বে না রে।
আমরা চাইনে আরাম, চাইনে বিরাম,
চাইনে যে ফল, চাইনে রে নাম,
মোরা ওঠায় পড়ায় সমান নাচি,
সমান খেলি জিতে হারে,—
আমাদের ভয় কাহারে ?

দ্বিতীয় দৃশ্যের গীতি-ভূমিকা

প্রবীণের দ্বিধা

১

দুরন্ত প্রাণের গান

আমরা খুঁজি খেলার সাথী।
ভোর না হ'তে জাগাই তাদের
ঘুমায় যারা সারারাতি।
আমরা ডাকি পাখীর গলায়,
আমরা নাচি বকুল তলায়,
মন ভোলাবার মন্ত্র জানি,
হাওয়াতে ফাঁদ আমরা পাতি।

মরণকে ত মানিনে রে
কালের ফাঁসি ফাঁসিয়ে দিয়ে
লুঠ করা ধন নিই যে কেড়ে।
আমরা তোমার মনোচোরা,
ছাড়ব না গো তোমায় মোরা,
চলেচ কোন্ আঁধার পানে
সেথাও জলে মোদের বাতি।

২

শীতের বিদায় গান

ছাড়্ গো তোরা ছাড়্ গো,
আমি চল্‌ব সাগর পার গো!
বিদায় বেলায় এ কি হাসি,
ধরলি আগমনীর বাঁশি!
যাবার সুরে আসার সুরে
করলি একাকার গো!

সবাই আপন পানে
আমায় আবার কেন টানে?
পুরানো শীত পাতা-ঝরা,
তা'রে এমন নূতন-করা?
মাঘ মরিল ফাগুন হয়ে
খেয়ে ফুলের মার গো!

৩

নব যৌবনের গান

আমরা নূতন প্রাণের চর।
আমরা থাকি পথে ঘাটে
নাই আমাদের ঘর

নিয়ে পক্ক পাতার পুঁজি
পালাবে শীত ভাব্‌চ বুঝি?
ও সব কেড়ে নেব, উড়িয়ে দেব
দখিন হাওয়ার পর।

তোমায় বাঁধ্‌ব নূতন ফুলের মালায়
বসন্তের এই বন্দীশালায়।
জীর্ণ জরার ছদ্মরূপে
এড়িয়ে যাবে চুপে চুপে?
তোমার সকল ভূষণ ঢাকা আছে
নাই যে অগোচর গো।

৪

উদ্‌ভ্রান্ত শীতের গান

ছাড় গো আমায় ছাড় গো—
আমি চল্‌ব সাগর পার গো!
রঙের খেলার, ভাই রে,
আমার সময় হাতে নাই রে।
তোমাদের ঐ সবুজ ফাগে
চক্ষে আমার ধাঁদা লাগে,
আমায় তোদের প্রাণের দাগে
দাগিস্‌নে ভাই আর গো!

দ্বিতীয় দৃশ্য

—▸▸•◂◂—

ঘাট

ওগো ঘাটের মাঝি, ঘাটের মাঝি, দরজা খোলো

কেন গো, তোমরা কা'কে চাও ?

আমরা বুড়োকে খুঁজ্‌তে বেরিয়েচি।

কোন্ বুড়োকে ?

চন্দ্রহাস। কোন্-বুড়োকে না। বুড়োকে।

তিনি কে ?

চন্দ্রহাস। আহা, আদ্যিকালের বুড়ো।

ওঃ বুঝেচি। তা'কে নিয়ে করবে কি ?

বসন্ত-উৎসব করব।

বুড়োকে নিয়ে বসন্ত-উৎসব ? পাগল হয়েচ ?

পাগল হঠাৎ হইনি। গোড়া থেকেই এই দশা

আর অন্তিম পর্য্যন্তই এই ভাব।

গান

আমাদের ক্ষেপিয়ে বেড়ায় যে
কোথায় লুকিয়ে থাকে রে ?
ছুট্‌ল বেগে ফাগুন হওয়া
কোন্ ক্ষ্যাপামির নেশায় পাওয়া ?
ঘূর্ণা হাওয়ায় ঘুরিয়ে দিল সূর্য্যতারাকে ॥

মাঝি। ওহে তোমাদের হাওয়ার জোর আছে—দরজায় ধাক্কা লাগিয়েচে।

এখন সেই বুড়োটার খবর দাও।

মাঝি। সেই যে বুড়িটা রাস্তার মোড়ে বসে' চরকা কাটে তা'কে জিজ্ঞাসা করলে হয় না!

জিজ্ঞাসা করেছিলুম—সে বলে, সাম্‌নে দিয়ে কত ছায়া যায়, কত ছায়া আসে, কা'কেই বা চিনি ?

ও যে একই জায়গায় বসে' থাকে ও কারো ঠিকানা জানে না।

মাঝি, তুমি ঘাটে ঘাটে অনেক ঘুরেচ, তুমি নিশ্চয় বল্‌তে পার কোথায় সেই—

মাঝি। ভাই, আমার ব্যবসা হচ্চে পথ ঠিক করা—কাদের পথ, কিসের পথ সে আমার জান্‌বার দরকার হয় না। আমার দৌড় ঘাট পর্য্যন্ত,—ঘর পর্য্যন্ত না।

আচ্ছা চল ত, পথগুলো পরখ করে' দেখা যাক্।

গান

কোন্ ক্ষ্যাপামির তালে নাচে
পাগল সাগরনীর ?
সেই তালে যে পা ফেলে' যাই,
রইতে নারি স্থির।
চল্‌রে সোজা, ফেল্‌রে বোঝা,
রেখে দে তোর রাস্তা খোঁজা,
চলার বেগে পায়ের তলায়
রাস্তা জেগেচে ॥

মাঝি। ঐ যে কোটাল আস্‌চে, ওকে জিজ্ঞাসা করলে হয় —আমি পথের খবর জানি, ও পথিকদের খবর জানে।

ওহে কোটাল হে, কোটাল হে !

কোটাল। কে গো, তোমরা কে ?

আমাদের যা দেখ্‌চ তাই, পরিচয় দেবার কিছুই নেই।

কোটাল। কি চাই ?

চন্দ্রহাস। বুড়োকে খুঁজ্‌তে বেরিয়েচি।

কোটাল। কোন্ বুড়োকে ?

সেই চিরকালের বুড়োকে।

কোটাল। এ তোমাদের কেমন খেয়াল ? তোমরা খোঁজো তা'কে ? সেই ত তোমাদের খোঁজ করচে ?

চন্দ্রহাস। কেন বল ত ?

কোটাল। সে নিজের হিমরক্তটা গরম করে' নিতে চায়, তপ্ত যৌবনের পরে তা'র বড় লোভ।

চন্দ্রহাস। আমরা তা'কে কষে' গরম করে' দেব, সে ভাবনা নেই। এখন দেখা পেলে হয়। তুমি তা'কে দেখেচ?

কোটাল। আমার রাতের বেলার পাহারা—দেখি ঢের লোক, চেহারা বুঝিনে। কিন্তু বাপু, তা'কেই সকলে বলে ছেলে-ধরা, উল্টে তোমরা তা'কে ধরতে চাও—এটা যে পূরো পাগ্‌লামি।

দেখেচ? ধরা পড়েচি। পাগ্‌লামিই ত! চিন্‌তে দেরি হয় না।

কোটাল। আমি কোটাল, পথ-চল্‌তি যাদের দেখি সবাই এক ছাঁচের। তাই অদ্ভুত কিছু দেখ্‌লেই চোখে ঠেকে।

ঐ শোন! পাড়ার ভদ্রলোকমাত্রই ঐ কথা বলে—আমরা অদ্ভুত।

আমরা অদ্ভুত বই কি, কোনো ভুল নেই।

কোটাল। কিন্তু তোমরা ছেলেমান্‌ষি করচ।

ঐরে, আবার ধরা পড়েচি। দাদাও ঠিক ঐ কথাই বলে।

অতি প্রাচীন কাল থেকে আমরা ছেলেমান্‌ষিই করচি। ওতে আমরা একেবারে পাকা হ'য়ে গেচি।

চন্দ্রহাস। আমাদের এক সর্দ্দার আছে সে ছেলেমান্‌ষিতে প্রবীণ। সে নিজের খেয়ালে এমনি হূহু করে' চলেচে

যে তা'র বয়েসটা কোন্ পিছনে খসে' পড়ে' গেচে, হুঁস নেই।

কোটাল। আর তোমরা ?

আমরা সব বয়েসের গুটি-কাটা প্রজাপতি।

কোটাল। (জনান্তিকে মাঝির প্রতি) পাগল রে, একেবারে উন্মাদ পাগল!

মাঝি। বাপু, এখন তোমরা কি করবে ?

চন্দ্রহাস। আমরা যাব।

কোটাল। কোথায় ?

চন্দ্রহাস। সেটা আমরা ঠিক করিনি।

কোটাল। যাওয়াটাই ঠিক করেচ কিন্তু কোথায় যাবে সেটা ঠিক করনি ?

চন্দ্রহাস। সেটা চল্‌তে চল্‌তে আপনি ঠিক হ'য়ে যাবে।

কোটাল। তা'র মানে কি হ'ল ?

তা'র মানে হচ্চে—

গান

চলি গো, চলি গো, যাই গো চলে'।
পথের প্রদীপ জ্বলে গো
গগন-তলে।
বাজিয়ে চলি পথের বাঁশি,
ছড়িয়ে চলি চলার হাসি,
রঙীন বসন উড়িয়ে চলি
জলে স্থলে।

কোটাল। তোমরা বুঝি কথার জবাব দিতে হ'লে গান গাও?

হাঁ। নইলে ঠিক জবাবটা বেরয় না। শাদা কথায় বল্‌তে গেলে ভারি অস্পষ্ট হয়, বোঝা যায় না।

কোটাল। তোমাদের বিশ্বাস, তোমাদের গানগুলো খুব পষ্ট।

চন্দ্রহাস। হাঁ, ওতে সুর আছে কি না।

গান

পথিক ভুবন ভালবাসে
পথিক জনে রে।
এমন সুরে তাই সে ডাকে
ক্ষণে ক্ষণে রে।
চলার পথের আগে আগে
ঋতুর ঋতুর সোহাগ জাগে,
চরণঘায়ে মরণ মরে
পলে পলে।

কোটাল। কোনো সহজ মানুষকে ত কথা বল্‌তে বল্‌তে গান গাইতে শুনি নি।

আবার ধরা পড়ে' গেচিরে, আমরা সহজ মানুষ না।

কোটাল। তোমাদের কোনো কাজকর্ম্ম নেই বুঝি?

না। আমাদের ছুটি।

কোটাল। কেন বল ত?

চন্দ্রহাস। পাছে সময় নষ্ট হয়।

কোটাল। এটা ত বোঝা গেল না।

ঐ দেখ—তা হ'লে আবার গান ধরতে হ'ল।

কোটাল। না তা'র দরকার নেই। আর বেশি বোঝবার আশা রাখিনে।

সবাই আমাদের বোঝ্‌বার আশা ছেড়ে দিয়েচে।

কোটাল। এমন হ'লে তোমাদের চল্‌বে কি করে'?

চন্দ্রহাস। আর ত কিছুই চলবার দরকার নেই—শুধু আমরাই চলি।

কোটাল। (মাঝির প্রতি) পাগল রে! উন্মাদ পাগল!

চন্দ্রহাস। এই যে এতক্ষণ পরে দাদা আস্‌চে।

কি দাদা, পিছিয়ে পড়েছিলে কেন?

চন্দ্রহাস। ওরে আমরা চলি ঊনপঞ্চাশ বায়ুর মত, আমাদের ভিতরে পদার্থ কিছুই নেই; আর দাদা চলে শ্রাবণের মেঘ—মাঝে মাঝে থম্‌কে দাঁড়িয়ে ভারমোচন করতে হয়। পথের মধ্যে ওকে শ্লোকরচনায় পেয়েছিল।

দাদা। চন্দ্রহাস, দৈবাৎ তোমার মুখে এই উপমাটি উপাদেয় হয়েচে। ওর মধ্যে একটু সার কথা আছে। আমি ওটি চৌপদীতে গেঁথে নিচ্চি।

চন্দ্রহাস। না, না, এখন থাক্ দাদা! আমরা কাজে বেরিয়েচি। তোমার চৌপদীর চার পা, কিন্তু চল্‌বার বেলা এত বড় খোঁড়া জন্তু জগতে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না।

দাদা। আপনি কে?

আমি ঘাটের মাঝি।

দাদা। আর আপনি?

আমি পাড়ার কোটাল।

দাদা। তা উত্তম হ'ল—আপনাদের কিছু শোনাতে ইচ্ছা করি। বাজে জিনিষ না—কাজের কথা।

মাঝি। বেশ, বেশ। আহা, বলেন, বলেন!

কোটাল। আমাদের গুরু বলেছিলেন, ভালো কথা বলবার লোক অনেক মেলে কিন্তু ভালো কথা যে মরদ খাড়া দাঁড়িয়ে শুন্‌তে পারে তা'কেই সাবাস্‌! ওটা ভাগ্যের কথা কি না। তা বল ঠাকুর বল!

দাদা। আজ পথে যেতে যেতে দেখ্‌লুম রাজপুরুষ একজন বন্দীকে নিয়ে চলেচে। শুন্‌লুম, সে কোনো শ্রেষ্ঠী, তা'র টাকার লোভেই রাজা মিথ্যা ছুতো করে' তা'কে ধরেচে। শুনে আমি নিকটেই মুদির দোকানে বসে' এই শ্লোকটি রচনা করেচি। দেখ বাপু, আমি বানিয়ে একটি কথাও লিখিনে। আমি যা লিখ্‌ব রাস্তায় ঘাটে তা মিলিয়ে নিতে পারবে।

ঠাকুর, কি লিখেচ শুনি।

দাদা।

আত্মরস লক্ষ্য ছিল বলে'
ইক্ষু মরেঃ ভিক্ষুর কবলে।

ওরে মূর্খ, ইহা দেখি শিক্ষ—
ফল দিয়ে রক্ষা পায় বৃক্ষ।

বুঝেচ ? রস জমায় বলেই ইক্ষু বেটা মরে, যে গাছ ফল দেয় তা'কে ত কেউ মারে না !

কোটাল। ওহে মাঝি, খাসা লিখেচে হে !

মাঝি। ভাই কোটাল, কথাটির মধ্যে সার আছে।

কোটাল। শুন্‌লে মানুষের চৈতন্য হয়। আমাদের কায়েতের পো এখানে থাকলে ওটা লিখে নিতুম রে। পাড়ায় খবর পাঠিয়ে দে !

সর্ব্বনাশ করলে রে !

চন্দ্রহাস। ও ভাই মাঝি, তুমি যে বল্লে আমাদের সঙ্গে বেরবে, দাদার চৌপদী জম্‌লে ত আর—

মাঝি। আরে রসুন মশায়, পাগ্‌লামি রেখে দিন! ঠাকুরকে পেয়েচি দুটো ভালো কথা শুনে নিই—বয়েস হ'য়ে এল, কোন্ দিন মরব।

ভাই, সেই জন্যেই ত বল্‌চি, আমাদের সঙ্গ পেয়েচ, ছেড়ো না।

চন্দ্রহাস। দাদাকে চিরদিনই পাবে কিন্তু আমরা একবার ম'লে বিধাতা দ্বিতীয়বার আর এমন ভুল করবেন না।

(বাহির হইতে) ওগো, কোটাল, কোটাল, কোটাল !

কেরে ! অনাথ কলু দেখ্‌চি। কি হয়েচে ?

সেই যে ছেলেটাকে পুষেছিলুম তা'কে বুঝি কাল রাত্রে ভুলিয়ে নিয়ে গেচে সেই ছেলেধরা।

কোন্ ছেলেধরা ?

সেই বুড়ো।

চন্দ্রহাস। বুড়ো ? বলিস্ কিরে ?

আপনারা অত খুসি হন কেন ?

ওটা আমাদের একটা বিশ্রী স্বভাব। আমরা খামকা খুসি হ'য়ে উঠি!

কোটাল। পাগল! একেবারে উন্মাদ পাগল!

চন্দ্রহাস। তা'কে তুমি দেখেচ হে ?

কলু। বোধ হয় কাল রাত্রে তা'কেই দূর থেকে দেখেছিলুম।

কি রকম চেহারাটা ?

কলু। কালো, আমাদের এই কোটাল দাদার চেয়েও। একেবারে রাত্রের সঙ্গে মিশিয়ে গেচে। আর বুকে দুটো চক্ষু জোনাক পোকার মত জ্বল্‌চে।

ওহে বসন্ত উৎসবে ত মানাবে না।

চন্দ্রহাস। ভাবনা কি ? তেমন যদি দেখি তবে এবার না হয় পূর্ণিমায় উৎসব না করে' অমাবস্যায় করা যাবে। অমাবস্যার বুকে ত চোখের অভাব নেই।

কোটাল। ওহে বাপু, তোমরা ভালো কাজ করচ না।

না, আমরা ভালো কাজ করচিনে।

আবার ধরা পড়েচিরে, আমরা ভালো কাজ করচিনে।

কি করব অভ্যাস নেই।

যেহেতু আমরা ভালমানুষ নই।

কোটাল। একি ঠাট্টা পেয়েচ? এতে বিপদ আছে।

বিপদ? সেইটেই ত ঠাট্টা।

গান

ভালমানুষ নইরে মোরা
ভালমানুষ নই।
গুণের মধ্যে ঐ আমাদের
গুণের মধ্যে ঐ।
দেশে দেশে নিন্দে রটে,
পদে পদে বিপদ ঘটে,
পুঁথির কথা কইনে মোরা
উল্টো কথা কই॥

কোটাল। ওহে বাপু, তোমরা যে কোন্ সর্দ্দারের কথা বল্‌ছিলে সে গেল কোথায়? সে সঙ্গে থাক্‌লে যে তোমাদের সাম্‌লাতে পারত।

সে সঙ্গে থাকে না পাছে সামলাতে হয়।

সে আমাদের পথে বের করে' দিয়ে নিজে সরে' দাঁড়ায়।

কোটাল। এ তা'র কেমনতর সর্দ্দারি?

চন্দ্রহাস। সর্দ্দারি করে না বলেই তা'কে সর্দ্দার করেচি।

কোটাল। দিব্যি সহজ কাজটি ত সে পেয়েচে।

চন্দ্রহাস। না ভাই, সর্দ্দারি করা সহজ, সর্দ্দার হওয়া সহজ নয়।

গান

জন্ম মোদের ত্র্যহস্পর্শে,
সকল অনাসৃষ্টি।
ছুটি নিলেন বৃহস্পতি,
রইল শনির দৃষ্টি।
অযাত্রাতে নৌকো ভাসা,
রাখিনে ভাই ফলের আশা,
আমাদের আর নাই যে গতি
ভেসেই চলা বই॥

দাদা, চল তবে, বেরিয়ে পড়ি।

কোটাল। না, না ঠাকুর, ওদের সঙ্গে কোথায় মরতে যাবে?

মাঝি। তুমি আমাদের শোলোক শোনাও, পাড়ার মানুষ সব এল বলে'! এ-সব কথা শোনা ভালো!

দাদা। না ভাই, এখান থেকে আমি নড়চিনে।

তাহ'লে আমরা নড়ি। পাড়ার মানুষ আমাদের সইতে পারে না।

পাড়াকে আমরা নাড়া দিই, পাড়া আমাদের তাড়া দেয়।

ঐ যে চৌপদীর গন্ধ পেয়েচে মৌমাছির গুঞ্জন শোনা যাচ্চে।

পাড়ার লোক। ওরে মাঝির এখানে পাঠ হবে।

কে গো? তোমরাই পাঠ করবে নাকি?

আমরা অন্য অনেক অসহ্য উৎপাত করি কিন্তু পাঠ করিনে।

ঐ পুণ্যের জোরেই আমরা রক্ষা পাব।

এরা বলে কিরে? হেঁয়ালি না কি?

চন্দ্রহাস। আমরা যা নিজে বুঝি তাই বলি; হঠাৎ হেঁয়ালি বলে' ভ্রম হয়। আর তোমরা যা খুবই বোঝ দাদা তাই তোমাদের বুঝিয়ে বল্‌বে, হঠাৎ গভীর জ্ঞানের কথা বলে' মনে হবে।

(একজন বালকের প্রবেশ)

আমি পারলুম না। কিছুতে তা'কে ধরতে পারলুম না।

কা'কে ভাই?

ঐ তোমরা যে বুড়োর খোঁজ করেছিলে তা'কে।

তা'কে দেখেচ না কি?

সে বোধ হয় রথে চড়ে' গেল।

কোন্ দিকে?

কিছুই ঠাউরাতে পারলুম না। কিন্তু তা'র চাকার ঘূর্ণি-হাওয়ায় এখনো ধূলো উড়চে।

চল্ তবে চল্।

শুক্‌নো পাতায় আকাশ ছেয়ে দিয়ে গেচে। (প্রস্থান)

কোটাল। পাগল! উন্মাদ পাগল!

তৃতীয় দৃশ্যের গীতি-ভূমিকা

প্রবীণের পরাভব

১

বসন্তের হাসির গান

ওর ভাব দেখে যে পায় হাসি। হায় হায় রে!
মরণ আয়োজনের মাঝে
বসে' আছেন কিসের কাজে
প্রবীণ প্রাচীন প্রবাসী! হায় হায় রে!

এবার দেশে যাবার দিনে
আপনাকে ও নিক্ না চিনে,
সবাই মিলে সাজাও ওকে
নবীন রূপের সন্ন্যাসী! হায় হায় রে।

এবার ওকে মজিয়ে দেরে
হিসাব ভুলের বিষম ফেরে!
কেড়েনে ওর থলি থালি,
আয় রে নিয়ে ফুলের ডালি,
গোপন প্রাণের পাগ্‌লাকে ওর
বাইরে দে আজ প্রকাশি। হায় হায় রে!

২

আসন্ন মিলনের গান

আর নাই যে দেরি, নাই যে দেরি।
সাম্‌নে সবার পড়ল ধরা
তুমি যে ভাই আমাদেরি।
হিমের বাহু-বাঁধন টুটি
পাগ্‌লা ঝোরা পাবে ছুটি,
উত্তরে এই হাওয়া তোমার
বইবে উজান কুঞ্জ ঘেরি!

আর নাই যে দেরি, নাই যে দেরি।
শুন্‌চ না কি জলে স্থলে
যাদুকরের বাজ্‌ল ভেরী।
দেখ্‌চ না কি এই আলোকে
খেল্‌চে হাসি রবির চোখে,
শাদা তোমার শ্যামল হবে
ফিরব মোরা তাই যে হেরি॥

তৃতীয় দৃশ্য

মাঠ

সবাই বলে ঐ, ঐ, ঐ,—তা'র পরে চেয়ে দেখ্‌লেই দেখা যায় শুধু ধূলো আর শুক্‌নো পাতা।

তা'র রথের ধ্বজাটা মেঘের মধ্যে যেন একবার দেখা দিয়েছিল।

কিন্তু দিক্ ভুল হ'য়ে যায়। এই ভাবি পূবে, এই ভাবি পশ্চিমে।

এমনি করে' সমস্ত দিন ধূলো আর ছায়ার পিছনে ঘুরে ঘুরেই হয়রান হ'য়ে গেলুম।

বেলা যে গেল রে ভাই, বেলা যে গেল।

সত্যি কথা বলি, যতই বেলা যাচ্চে ততই মনে ভয় ঢুক্‌চে।

মনে হচ্চে ভুল করেচি।

সকাল বেলাকার আলো কানে কানে বল্লে, সাবাস, এগিয়ে চল,—বিকেল বেলাকার আলো তাই নিয়ে ভারি ঠাট্টা করচে।

ঠক্‌লুম বুঝি রে!

দাদার চৌপদীগুলোর উপরে ক্রমে শ্রদ্ধা বাড়চে।

ভয় হচ্চে আমরাও চৌপদী লিখ্‌তে বসে' যাব—বড় দেরি নেই।

আর পাড়ার লোক আমাদের ঘিরে বস্‌বে।

আর এমনি তাদের ভয়ানক উপকার হ'তে থাক্‌বে যে, তা'রা এক পা নড়বে না।

আমরা রাত্রি বেলাকার পাথরের মত ঠাণ্ডা হ'য়ে বসে' থাক্‌ব।

আর তা'রা আমাদের চারদিকে কুয়াশার মত ঘন হ'য়ে জম্‌বে।

ও ভাই, আমাদের সর্দ্দার এ-সব কথা শুন্‌লে বল্‌বে কি?

ওরে আমার ক্রমে বিশ্বাস হচ্চে সর্দ্দারই আমাদের ঠকিয়েচে। সে আমাদের মিথ্যে ফাঁকি দিয়ে খাটিয়ে নেয়, নিজে সে কুঁড়ের সর্দ্দার।

ফিরে চল্ রে। এবার সর্দ্দারের সঙ্গে লড়ব।

বল্‌ব, আমরা চল্‌ব না—তুই পা কাঁধের উপর মুড়ে বস্‌ব। পা দুটো লক্ষ্মীছাড়া, পথে পথেই ঘুরে মরল।

হাত দুটোকে পিছনের দিকে বেঁধে রাখ্‌ব।

পিছনের কোনো বালাই নেইরে, যত মুস্কিল এই সামনে-টাকে নিয়ে।

শরীরে যতগুলো অঙ্গ আছে তা'র মধ্যে পিঠটাই সত্যি

কথা বলে। সে বলে চিৎ হ'য়ে পড়্, চিৎ হ'য়ে পড়্!

কাঁচা বয়সে বুকটা বুক ফুলিয়ে চলে কিন্তু পরিণামে সেই পিঠের উপরেই ভর—পড়তেই হয় চিৎ হ'য়ে।

গোড়াতেই যদি চিৎপাত দিয়ে স্থরু করা যেত তাহ'লে মাঝখানে উৎপাত থাকৃত না রে।

আমাদের গ্রামেব ছায়ার নীচে দিয়ে সেই যে ইরা নদী ব'য়ে চলেচে তা'র কথা মনে পড়চে ভাই।

সেদিন মনে হয়েছিল, সে বল্‌চে, চল্ ,চল্, চল্,—আজ মনে হচ্চে ভুল শুনেছিলুম, সে বল্‌চে, ছল, ছল, ছল। সংসারটা সবই ছল রে!

সে কথা আমাদের পণ্ডিত গোড়াতেই বলেছিল।

এবারে ফিরে গিয়েই একেবারে সোজা সেই পণ্ডিতের চণ্ডীমণ্ডপে।

পুঁথি ছাড়া আর এক পা চলা নয়?

কি ভুলটাই করেছিলুম! ভেবেছিলুম চলাটাই বাহাদুরি! কিন্তু না চলাই যে গ্রহ-নক্ষত্র জল-হাওয়া সমস্তর উল্টো। সেটাই ত তেজের কথা হ'ল।

ওরে বীর, কোমর বাঁধ্ রে—আমরা চল্‌ব না।

ওরে পালোয়ান, তাল ঠুকে বসে' পড়্, আমরা চল্‌ব না।

চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং—আমাদের চিত্তেও কাজ নেই, বিত্তেও কাজ নেই; আমরা চল্‌ব না।

চলজ্জীবন যৌবনং—আমাদের জীবনও থাক্ যৌবনও থাক, আমরা চল্‌ব না।

যেখান থেকে যাত্রা স্থুরু করেচি ফিরে চল্।

না রে সেখানে ফিরতে হ'লেও চল্‌তে হবে।

তবে ?

তবে আর কি ? যেখানে এসে পড়েচি এইখানেই বসে' পড়ি !

মনে করি এইখানেই বরাবর বসে' আছি।

জন্মাবার ঢের আগে থেকে।

মরার ঢের পরে পর্য্যন্ত।

ঠিক বলেচিস্, তাহ'লে মনটা স্থির থাকবে। আর-কোথাও থেকে এসেচি জান্‌লেই আর-কোথাও যাবার জন্যে মন ছট্‌ফট্ করে।

আর-কোথাওটা বড় সর্ব্বনেশে দেশ রে !

সেখানে দেশটা স্থদ্ধ চলে। তা'র পথগুলো চলে।

কিন্তু আমরা—

গান

মোরা চল্‌ব না।
মুকুল ঝরে ঝরুক, মোরা ফল্‌ব না!
সূর্য্য তারা আগুন ভুগে
জ্বলে' মরুক্ যুগে যুগে,
আমরা যতই পাই না জ্বালা
জ্বল্‌ব না!

বনের শাখা কথা বলে,
কথা জাগে সাগরজলে,
এই ভুবনে আমরা কিছুই
বল্‌ব না!
কোথা হ'তে লাগে রে টান,
জীবনজলে ডাকে রে বান,
আমরা ত এই প্রাণের টলায়
টল্‌ব না॥

ওরে হাসিরে হাসি!
ঐ হাসি শোনা যাচ্চে।
বাঁচা গেল এতক্ষণে একটা হাসি শোনা গেল!
যেন গুমটের ঘোমটা খুলে গেল।
এ যেন বৈশাখের এক পস্‌লা বৃষ্টি!
কার হাসি ভাই?
শুনেই বুঝ্‌তে পারচিস্‌নে, আমাদের চন্দ্রহাসের হাসি।
কি আশ্চর্য্য হাসি ওর?
যেন ঝরনার মত, কালো পাথরটাকে ঠেলে নিয়ে চলে।
যেন সূর্য্যের আলো, কুয়াশার তাড়কা রাক্ষসীকে তলোয়ার দিয়ে টুকরো টুকরো করে' কাটে।
যাক্‌ আমাদের চৌপদীর ফাঁড়া কাট্‌ল! এবার উঠে পড়।
এবার কাজ ছাড়া কথা নেই—চরাচরমিদং সর্ব্বং কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।

ও আবার কি রকম কথা হ'ল? ঈশানকে এখনো দ্রৌপদীর ভূত ছাড়েনি।

কীর্ত্তি? নদী কি নিজের ফেনাকে গ্রাহ্য করে? কীর্ত্তি ত আমাদের ফেনা—ছড়াতে ছড়াতে চলে' যাব। ফিরে তাকাব না।

এস ভাই চন্দ্রহাস, এস, তোমার হাসিমুখ যে!

চন্দ্রহাস। বুড়োর রাস্তার সন্ধান পেয়েচি।

কা'র কাছ থেকে?

চন্দ্রহাস। এই বাউলের কাছ থেকে।

ওকি? ও যে অন্ধ।

চন্দ্রহাস। সেইজন্যে ওকে রাস্তা খুঁজ্‌তে হয় না, ও ভিতর থেকে দেখ্‌তে পায়।

কি হে ভাই, ঠিক নিয়ে যেতে পারবে ত?

বাউল। ঠিক নিয়ে যাব।

কেমন করে'?

বাউল। আমি যে পায়ের শব্দ শুন্‌তে পাই।

কান ত আমাদেরও আছে, কিন্তু—

বাউল। আমি যে সব-দিয়ে শুনি—শুধু কান-দিয়ে না!

চন্দ্রহাস। রাস্তায় যাকে জিজ্ঞাসা করি বুড়োর কথা শুন্‌লেই আঁৎকে ওঠে, কেবল দেখি এরই ভয় নেই।

ও বোধ হয় চোখে দেখ্‌তে পায় না বলেই ভয় করে না।

বাউল। না গো, আমি কেন ভয় করিনে বলি। একদিন আমার দৃষ্টি ছিল। যখন অন্ধ হলুম ভয় হ'ল দৃষ্টি বুঝি হারালুম। কিন্তু চোখওয়ালার দৃষ্টি অস্ত যেতেই অন্ধের দৃষ্টির উদয় হ'ল। সূর্য্য যখন গেল তখন দেখি অন্ধকারের বুকের মধ্যে আলো। সেই অবধি অন্ধকারকে আমার আর ভয় নেই।

তাহ'লে এখন চল। ঐ ত সন্ধ্যাতারা উঠেচে।

বাউল। আমি গান গাইতে গাইতে যাই, তোমরা আমার পিছনে পিছনে এস! গান না গাইলে আমি রাস্তা পাইনে!

সে কি কথা হে?

বাউল। আমার গান আমাকে ছাড়িয়ে যায়—সে এগিয়ে চলে, আমি পিছনে চলি।

গান

ধীরে বন্ধু ধীরে ধীরে
চল তোমার বিজন মন্দিরে।
জানিনে পথ, নাই যে আলো,
ভিতর বাহির কালোয় কালো,
তোমার চরণশব্দ বরণ করেচি
আজ এই অরণ্য গভীরে।

ধীরে বন্ধু ধীরে ধীরে।
চল অন্ধকারের তীরে তীরে।
চল্‌ব আমি নিশীথরাতে
তোমার হাওয়ার ইসারাতে,
তোমার বসনগন্ধ বরণ করেচি
আজ এই বসন্ত সমীরে।

———

চতুর্থ দৃশ্যের গীতি-ভূমিকা

নবীনের জয়

১

প্রত্যাগত যৌবনের গান

বিদায় নিয়ে গিয়েছিলেম
বারে বারে।
ভেবেছিলেম ফিরব না রে।
এই ত আবার নবীন বেশে
এলেম তোমার হৃদয়-দ্বারে।
কেগো তুমি?—আমি বকুল;
কেগো তুমি?—আমি পারুল;
তোমরা কে বা?—আমরা আমের মুকুল গো
এলেম আবার আলোর পারে।

এবার যখন ঝরব মোরা
ধরার বুকে
ঝরব তখন হাসিমুখে!
অফুরানের আঁচল ভরে'
মরব মোরা প্রাণের সুখে।

তুমি কে গো ?—আমি শিমুল।
তুমি কে গো ?—কামিনী ফুল ;
তোমরা কে বা ?—আমরা নবীন পাতা গো
শালের বনে ভারে ভারে ॥

২

নূতন আশার গান

এই কথাটাই ছিলেম ভুলে—
মিল্‌ব আবার সবার সাথে
ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে।
অশোক বনে আমার হিয়া
নূতন পাতায় উঠ্‌বে জিয়া,
বুকের মাতন টুট্‌বে বাঁধন
যৌবনেরি কূলে কূলে
ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে।

বাঁশিতে গান উঠ্‌বে পূরে
নবীন রবির বাণী-ভরা
আকাশবীণার সোনার সুরে।

আমার মনের সকল কোণে
ভরবে গগন আলোক-ধনে,
কান্নাহাসির বন্যারি নীর
উঠ্‌বে আবার দুলে দুলে
ফাল্গুনের এই ফুলে ফুলে ॥

৩

বোঝাপড়ার গান

এবার ত যৌবনের কাছে
মেনেচ, হার মেনেচ?
মেনেচি।
আপন মাঝে নূতনকে আজ জেনেচ?
জেনেচি।
আবরণকে বরণ করে'
ছিলে কাহার জীর্ণ ঘরে!
আপনাকে আজ বাহির করে' এনেচ?
এনেচি।

এবার আপন প্রাণের কাছে
মেনেচ, হার মেনেচ?
মেনেচি।
মরণ মাঝে অমৃতকে জেনেচ?
জেনেচি।

লুকিয়ে তোমার অমরপুরী
ধূলা-অসুর করে চুরি,
তাহারে আজ মরণ আঘাত হেনেচ?
হেনেচি ॥

৪

নবীন রূপের গান

এতদিন যে বসেছিলেম
পথ চেয়ে আর কাল গুণে',
দেখা পেলেম ফাল্গুনে।
বালক বীরের বেশে তুমি করলে বিশ্বজয়-
এ কি গো বিস্ময়!
অবাক্ আমি তরুণ গলার
গান শুনে।

গন্ধে উদাস হাওয়ার মত
উড়ে তোমার উত্তরী,
কর্ণে তোমার কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী।
তরুণ হাসির আড়ালে কোন্
আগুন ঢাকা রয়—
এ কি গো বিস্ময়!
অস্ত্র তোমার গোপন রাখ
কোন্ তূণে!

চতুর্থ দৃশ্য

গুহাদ্বার

দেখ দেখি ভাই, আবার আমাদের ফেলে রেখে চন্দ্রহাস কোথায় গেল !

ওকে কি ধরে' রাখ্‌বার জো আছে ?

বসে' বিশ্রাম করি আমরা, ও চলে' বিশ্রাম করে।

অন্ধ বাউলকে নিয়ে সে নদীর ওপারে চলে' গেচে।

আর কিছু নয়, ঐ অন্ধের অন্ধতার মধ্যে সেঁধিয়ে গিয়ে তবে ও ছাড়বে।

তাই আমাদের সর্দ্দার ওকে ডুবুরি বলে।

চন্দ্রহাস একটু সরে' গেলেই আর আমাদের খেলার রস থাকে না।

ও কাছে থাক্‌লে মনে হয় কিছু হোক্ বা না হোক্ তবু মজা আছে। এমন কি বিপদের আশঙ্কা থাকলে মনে হয় সে আরো বেশি মজা।

আজ এই রাত্রে ওর জন্যে মনটা কেমন করচে।

দেখ্‌চিস এখানকার হাওয়াটা কেমনতর ?

এখানে আকাশটা যেন যাবার বেলাকার বন্ধুর মত মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

যারা সেখানে বল্‌ছিল চল্‌ চল্‌, তা'রা এখানে বল্‌চে যাই যাই।

কথাটা একই, সুরটা আলাদা।

মনটার ভিতরে কেমন ব্যথা দিচ্চে, তবু লাগ্‌চে ভালো।

ঝাউগাছের বীথিকার ভিতর দিয়ে কোথা থেকে এই একটা নদীর স্রোত চলে' আস্‌চে এ যেন কোন্‌ দুপুররাতের চোখের জল।

পৃথিবীর দিকে এমন করে' কখনো আমরা দেখিনি।

উর্দ্ধশ্বাসে যখন সাম্‌নে ছুটি তখন সাম্‌নের দিকেই চোখ থাকে, চারপাশের দিকে নয়।

বিদায়ের বাঁশিতে যখন কোমল ধৈবত লাগে তখনি সকলের দিকে চোখ মেলি।

আর দেখি বড় মধুর। যদি সবাই চলে' চলে' না যেত তাহ'লে কি কোনো মাধুরী চোখে পড়্‌ত?

চলার মধ্যে যদি কেবলি তেজ থাক্‌ত তাহ'লে যৌবন শুকিয়ে যেত। তা'র মধ্যে কান্না আছে তাই যৌবনকে সবুজ দেখি।

এই জায়গাটাতে এসে শুন্‌তে পাচ্চি জগৎটা কেবল "পাব" "পাব" বল্‌চে না—সঙ্গে সঙ্গেই বল্‌চে, ছাড়ব, ছাড়ব।

সৃষ্টির গোধূলিলগ্নে "পাব"র সঙ্গে "ছাড়ব"র বিয়ে হ'য়ে
গেচে রে—তাদের মিল ভাঙলেই সব ভেঙে যাবে।
অন্ধ বাউল আমাদের এ কোন্ দেশে আন্‌লে ভাই?
ঐ তারাগুলোর দিকে তাকাচ্চি আর মনে হচ্চে যুগে যুগে
যাদের ফেলে এসেচি তাদের অনিমেষ দৃষ্টিতে সমস্ত
রাত একেবারে ছেয়ে রয়েচে।
ফুলগুলোর মধ্যে কা'রা বল্‌চে মনে রেখো, মনে রেখো,
তাদের নাম ত মনে নেই কিন্তু মন যে উদাস হ'য়ে ওঠে।
একটা গান না গাইলে বুক ফেটে যাবে।

গান

তুই ফেলে এসেচিস্ কারে? (মন, মন রে আমার)
তাই জনম গেল, শান্তি পেলিনারে! (মন, মন রে আমার)
যে পথ দিয়ে চলে' এলি
সে পথ এখন ভুলে গেলি,
কেমন করে' ফিরবি তাহার দ্বারে? (মন, মন রে আমার)
নদীর জলে থাকি রে কান পেতে,
কাঁপে যে প্রাণ পাতার মর্ম্মরেতে।
মনে হয় রে পাব খুঁজি
ফুলের ভাষা যদি বুঝি,
যে পথ গেচে সন্ধ্যাতারার পারে॥ (মন, মন রে আমার)

এবার আমাদের বসন্ত উৎসবে এ কি রকম সুর লাগ্‌চে?
এ যেন ঝরা পাতার সুর।

এতদিন বসন্ত তা'র চোখের জলটা আমাদের কাছে
লুকিয়ে ছিল।
ভেবেছিল আমরা বুঝ্‌তে পারব না, আমরা যে যৌবনে
দুরন্ত।
আমাদের কেবল হাসি দিয়ে ভুলোতে চেয়েছিল!
কিন্তু আজ আমরা আমাদের মনকে মজিয়ে নেব এই
সমুদ্রপারের দীর্ঘনিশ্বাসে!
প্রিয়া এই পৃথিবী আমাদের প্রিয়া। এই সুন্দরী
পৃথিবী। সে চাচ্চে আমাদের যা আছে সমস্তই—
আমাদের হাতের স্পর্শ, আমাদের হৃদয়ের গান—
চাচ্চে যা আমাদের আপনার মধ্যে আপনার কাছ
থেকেও লুকিয়ে আছে।
ওযে কিছু পায় কিছু পায় না, এই জন্যেই ওর কান্না।
পেতে পেতেই সব হারিয়ে যায়।
ওগো পৃথিবী, তোমাকে আমরা ফাঁকি দেব না!

গান

আমি যাব না গো অম্‌নি চলে'।
মালা তোমার দেব গলে।
অনেক সুখে অনেক দুখে
তোমার বাণী নিলেম বুকে,
ফাগুন শেষে যাবার বেলা
আমার বাণী যাব বলে'।

কিছু হ'ল, অনেক বাকি ;
ক্ষমা আমায় করবে না কি ?
গান এসেচে সুর আসে নাই
হ'ল না যে শোনানো তাই,
সে সুর আমার রইল ঢাকা
নয়নজলে নয়নজলে ॥

ও ভাই, কে যেন গেল বোধ হচ্চে।

আরে, গেল, গেল, গেল, এ ছাড়া আর ত কিছুই বোধ হচ্চে না।

আমার গায়ের উপর কোন্ পথিকের কাপড় ঠেকে গেল !

নিয়ে চল পথিক, নিয়ে চল তোমার সঙ্গে, হাওয়া যেমন ফুলের গন্ধ নিয়ে যায়।

কা'কে ধরে' আন্‌বার জন্যে বেরিয়েছিলুম কিন্তু ধরা দেবার জন্যেই মন আকুল হ'ল।

(বাউলের প্রবেশ)

এই যে আমাদের বাউল। আমাদের এ কোথায় এনেচ, এখানে সমস্ত পথিকজগতের নিশ্বাস আমাদের গায়ে লাগ্‌চে—সমস্ত তারাগুলোর !

আমরা খেলাচ্ছলে বেরিয়েছিলুম কিন্তু খেলাটা যে কি তা ভুলেই গেচি।

আমরা তা'কেই ধরতে বেরিয়েছিলুম পৃথিবীর মধ্যে যে বুড়ো।

রাস্তায় সবাই বল্লে সে ভয়ঙ্কর। সে কেবলমাত্র একটা মুণ্ডু, একটা হাঁ, যৌবনের চাঁদকে গিলে খাবার জন্যেই তা'র একমাত্র লোভ।

কিন্তু ভয় ভেঙে গেচে। মনের ভিতর বল্‌চে সে যদি আমাকে চায় তবে আমিও বসে' থাক্‌ব না। ফুল যাচ্চে, পাতা যাচ্চে, নদীর জল যাচ্চে—তা'র পিছন পিছন আমিও যাব।

ও ভাই বাউল, তোমার একতারাতে একটা সুর লাগাও! রাত কত হ'ল কে জানে? হয় ত বা ভোর হ'য়ে এল।

বাউলের গান

সবাই যারে সব দিতেছে
তা'র কাছে সব দিয়ে ফেলি।
ক'বার আগে চা'বার আগে
আপনি আমায় দেব মেলি।
নেবার বেলা হলেম ঋণী,
ভিড় করেচি, ভয় করিনি,
এখনো ভয় করব নারে,
দেবার খেলা এবার খেলি।
প্রভাত তারি সোনা নিয়ে
বেরিয়ে পড়ে নেচে কুঁদে।
সন্ধ্যা তা'রে প্রণাম করে
সব সোনা তা'র দেয়রে শুধে।

ফোটা ফুলের আনন্দ রে
ঝরা ফুলেই ফলে ধরে,
আপ্‌নাকে ভাই ফুরিয়ে-দেওয়া
চুকিয়ে দে তুই বেলাবেলি

ওহে বাউল, চন্দ্রহাস এখনো এল না কেন ?

বাউল। সে যে গেচে, তা জান না ?

গেচে ? কোথায় গেচে ?

বাউল। সে বল্লে, আমি তা'কে জয় করে' আন্‌ব।

কা'কে ?

বাউল। যাকে সবাই ভয় করে। সে বল্লে নইলে আমার কিসের যৌবন !

বাঃ এ ত বেশ কথা ! দাদা গেল পাড়ার লোককে চৌপদী শোনাতে, আর চন্দ্রহাস কোথায় গেল ঠিকানাই নেই !

বাউল। সে বল্লে, যুগে যুগে মানুষ লড়াই করেচে, আজ বসন্তের হাওয়ায় তারি ঢেউ !

তারি ঢেউ ?

বাউল। হাঁ। খবর এসেচে মানুষের লড়াই শেষ হয় নি।

বসন্তের এই কি খবর ?

বাউল। যারা মরে' অমর, বসন্তের কচি পাতায় তা'রাই পত্র পাঠিয়েচে। দিগ্‌দিগন্তে তা'রা রটাচ্চে—"আমরা পথের বিচার করিনি—আমরা পাথেয়ের হিসাব

রাখিনি—আমরা ছুটে এসেচি, আমরা ফুটে বেরিয়েচি। আমরা যদি ভাব্‌তে বস্‌তুম তাহ'লে বসন্তের দশা কি হ'ত ?”

চন্দ্রহাস তাই বুঝি ক্ষেপে উঠেচে ?

বাউল। সে বল্লে—

গান

বসন্তে ফুল গাঁথ্‌ল আমার
জয়ের মালা।
বইল প্রাণে দখিন হাওয়া
আগুন-জ্বালা !
পিছের বাঁশি কোণের ঘরে
মিছেরে ঐ কেঁদে মরে,
মরণ এবার আন্‌ল আমার
বরণ ডালা।
যৌবনেরি ঝড় উঠেচে
আকাশ পাতালে।
নাচের তালের ঝঙ্কারে তা'য়
আমায় মাতালে।
কুড়িয়ে নেবার ঘুচ্‌ল পেশা,
উড়িয়ে দেবার লাগ্‌ল নেশা,
আরাম বলে, “এল আমার
যাবার পালা !”

কিন্তু সে গেল কোথায় ?

বাউল। সে বল্লে, আমি পথ চেয়ে চুপ করে' বসে' থাক্‌তে পারব না। আমি এগিয়ে গিয়ে ধরব। আমি জয় করে' আন্‌ব।

কিন্তু গেল কোন্ দিকে?

বাউল। সেই গুহার মধ্যে চলে' গেচে।

সে কি কথা? সে যে ঘোর অন্ধকার!

কোনো খবর না নিয়েই একেবারে—

বাউল। সে নিজেই খবর নিতে গেচে।

ফিরবে কখন?

তুইও যেমন? সে কি আর ফিরবে?

কিন্তু চন্দ্রহাস গেলে আমাদের জীবনের রইল কি?

আমাদের সর্দ্দারের কাছে কি জবাব দেব?

এবার সর্দ্দারও আমাদের ছাড়বে।

যাবার সময় আমাদের কি বলে' গেল সে?

বাউল। বল্লে, আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো, আমি আবার ফিরে আস্‌ব।

ফিরে আস্‌বে? কেমন করে' জান্‌ব?

বাউল। সে ত বল্লে, আমি জয়ী হ'য়ে ফিরে আস্‌ব।

তাহ'লে আমরা সমস্ত রাত অপেক্ষা করে' থাক্‌ব।

বাউল, কোথায় আমাদের অপেক্ষা করতে হবে?

বাউল। এই যে গুহার ভিতর থেকে নদীর জল বেরিয়ে আস্‌চে এরি মুখের কাছে।

ঐ গুহায় কোন্ রাস্তা দিয়ে গেল ? ওখানে যে কালো খাঁড়ার মত অন্ধকার !

বাউল। রাত্রের পাখীগুলোর ডানার শব্দ ধরে' গেচে।

তুমি সঙ্গে গেলে না কেন ?

বাউল। আমাকে তোমাদের আশ্বাস দেবার জন্যে রেখে গেল।

কখন্ গেচে বল ত ?

বাউল। অনেকক্ষণ—রাতের প্রথম প্রহরেই।

এখন বোধ হয় তিন প্রহর পেরিয়ে গেচে। কেমন একটা ঠাণ্ডা হাওয়া দিয়েচে—গা সির্ সির্ করচে।

দেখ ভাই, স্বপ্ন দেখেচি যেন তিন জন মেয়ে মানুষ চুল এলিয়ে দিয়ে—

তোর স্বপ্নের কথা রেখে দে ! ভালো লাগ্‌চে না !

সব লক্ষণগুলো কেমন খারাপ ঠেক্‌চে।

প্যাঁচাটা ডাক্‌ছিল, এতক্ষণ কিছু মনে হয়নি—কিন্তু—

মাঠের ওপারে কুকুরটা কি রকম বিশ্রী সুরে চ্যাঁচাচ্চে শুন্‌চিস্ !

ঠিক যেন তা'র পিঠের উপর ডাইনি সওয়ার হ'য়ে তা'কে চাব্‌কাচ্চে।

যদি ফেরবার হ'ত চন্দ্রহাস এতক্ষণে ফিরত।

রাতটা কেটে গেলে বাঁচা যায় !

শোন্ রে ভাই মেয়েমানুষের কান্না !

ওরা ত কাঁদ্‌চেই—কেবল কাঁদ্‌চেই, অথচ কাউকে ধরে' রাখ্‌তে পারচে না।

নাঃ আর পারা যায় না—চুপ করে' বসে' থাক্‌লেই যত কুলক্ষণ দেখা যায়।

চল আমরাও যাই—পথ চল্লেই ভয় থাকে না!

পথ দেখাবে কে?

ঐ যে বাউল আছে।

কি হে, তুমি পথ দেখাতে পার?

বাউল। পারি।

বিশ্বাস করতে সাহস হয় না। তুমি চোখে না দেখে পথ বের কর শুধু গান গেয়ে?

তুমি চন্দ্রহাসকে কী রাস্তা দেখিয়ে দিলে! যদি সে ফিরে আসে তবে তোমাকে বিশ্বাস করব।

ফিরে যদি না আসে তাহ'লে কিন্তু—

চন্দ্রহাসকে যে আমরা এত ভালবাস্‌তুম তা জান্‌তুম না।

এতদিন ওকে নিয়ে আমরা যা খুসি তাই করেচি।

যখন খেলি তখন খেলাটাই হয় বড়, যার সঙ্গে খেলি তা'কে নজর করিনে।

এবার যদি সে ফেরে, তা'কে মুহূর্ত্তের জন্যে অনাদর করব না।

আমার মনে হচ্চে আমরা কেবলি তাঁকে দুঃখ দিয়েচি।

তা'র ভালবাসা সব দুঃখকে ছাড়িয়ে উঠেছিল।

সে যে কি সুন্দর ছিল যখন তা'কে চোখে দেখ্‌লুম তখন সেটা চোখে পড়েনি।

গান

চোখের আলোয় দেখেছিলেম
চোখের বাহিরে।
অন্তরে আজ দেখ্‌ব, যখন
আলোক নাহি রে।
ধরায় যখন দাও না ধরা
হৃদয় তখন তোমায় ভরা,
এখন তোমার আপন আলোয়
তোমায় চাহি রে।
তোমায় নিয়ে খেলেছিলেম
খেলার ঘরেতে।
খেলার পুতুল ভেঙে গেচে
প্রলয় ঝড়েতে।
থাক্ তবে সেই কেবল খেলা,
হোক্ না এখন প্রাণের মেলা—
তারের বীণা ভাঙল, হৃদয়-
বীণায় গাহি রে॥

ঐ বাউলটা চুপ করে' বসে' থাকে, কথা কয় না, ভালো লাগ্‌চে না।

ও কেমন যেন একটা অলক্ষণ!

যেন কালবৈশাখীর প্রথম মেঘ।

দাও ভাই দাও, ওকে বিদায় করে' দাও!

না, না, ও বসে' আছে তবু একটা ভরসা আছে।

দেখ্‌চ না ওর মুখে কিচ্ছু ভয় নেই!

মনে হচ্চে ওর কপালে যেন কি সব খবর আস্‌চে।

ওর সমস্ত গা যেন অনেক দূরের কা'কে দেখ্‌তে পাচ্চে। ওর আঙুলের আগায় চোখ ছড়িয়ে আছে।

ওকে দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পারি কে আস্‌চে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে পথ করে'।

ঐ দেখ জোড়হাত করে' উঠে দাঁড়িয়েচে।

পূবের দিকে মুখ করে' কা'কে প্রণাম করচে।

ওখানে ত কিচ্ছুই নেই—একটু আলোর রেখাও না।

একবার জিজ্ঞাসাই কর না, ও কি দেখ্‌চে—কা'কে দেখ্‌চে!

না, না, এখন ওরে কিছু বোলো না।

আমার কি মনে হচ্চে জান? যেন ওর মধ্যে সকাল হয়েচে।

যেন ওর ভুরুর মাঝখানে অরুণের আলো খেয়া নৌকোটির মত এসে ঠেকেচে!

ওর মনটা ভোর বেলাকার আকাশের মত চুপ।

এখনি যেন পাখীর গানের ঝড় উঠ্‌বে—তা'র আগে সমস্ত থম্‌থমে।

ঐ একটু একটু একতারাতে ঝঙ্কার দিচ্চে, ওর মন গান গাচ্চে।

চুপ কর চুপ কর ঐ গান ধরেচে।

বাউলের গান

হবে জয়, হবে জয়, হবে জয় রে
ওহে বীর, হে নির্ভয়!
জয়ী প্রাণ, চিরপ্রাণ,
জয়ী রে আনন্দগান,
জয়ী প্রেম, জয়ী ক্ষেম,
জয়ী জ্যোতির্ম্ময় রে।
এ আঁধার হবে ক্ষয়, হবে ক্ষয় রে,
ওহে বীর, হে নির্ভয়!
ছাড়ো ঘুম, মেলো চোখ,
অবসাদ দূর হোক্,
আশার অরুণালোক
হোক্ অভ্যুদয় রে॥

ঐ যে!

চন্দ্রহাস, চন্দ্রহাস!

রোস্ রোস্ ব্যস্ত হোস্‌নে—এখনো স্পষ্ট দেখা যাচ্চে না

না, ও চন্দ্রহাস ছাড়া আর কেউ হ'তে পারে না।

বাঁচলুম, বাঁচলুম।

এস, এস চন্দ্রহাস!

এতক্ষণ আমাদের ছেড়ে কি করলে ভাই বল।

যাকে ধরতে গিয়েছিলে তা'কে ধরতে পেরেচ?

চন্দ্রহাস। ধরেচি তা'কে ধরেচি।

কই তা'কে ত দেখ্‌চি নে।

চন্দ্রহাস। সে আস্‌চে—এখনি আস্‌চে।

কি তুমি দেখ্‌লে আমাকে বল ভাই।

চন্দ্রহাস। সে ত আমি বল্‌তে পারব না।

কেন ?

চন্দ্রহাস। সে ত আমি চোখ-দিয়ে দেখিনি।

তবে ?

চন্দ্রহাস। আমার সব-দিয়ে দেখেছিলুম।

তা হোক্‌ না, বল না ভাই।

চন্দ্রহাস। আমার সমস্ত দেহ মন যদি কণ্ঠ হ'ত বল্‌তে পারত।

কা'কে তুমি ধরেচ তাও কি বুঝ্‌তে পারলে না ?

জগতের সেই বিরাট বুড়োটাকে ?

যে বুড়োটা অগস্ত্যের মত পৃথিবীর যৌবনসমুদ্র শুষে খেতে যায় ?

সেই যে ভয়ঙ্কর ? যে অন্ধকারের মত ? যার বুকে চোখ ?

যার পা উল্টো দিকে ? যে পিছনে হেঁটে চলে ?

নরমুণ্ড যার গলায় ? শ্মশানে যার বাস ?

চন্দ্রহাস। আমি ত বল্‌তে পারিনে। সে আস্‌চে এখনি তা'কে দেখ্‌তে পাব।

ভাই বাউল, তুমি দেখেচ তা'কে ?

বাউল। হাঁ, এই ত দেখ্‌চি।

কই ?

বাউল। এই যে !

ঐ যে বেরিয়ে এল, বেরিয়ে এল।

ঐ যে কে গুহা থেকে বেরিয়ে এল !

আশ্চর্য্য ! আশ্চর্য্য !

চন্দ্রহাস। এ কি, এ যে তুমি !

তুমি ! সেই আমাদের সর্দ্দার !

আমাদের সর্দ্দার রে !

বুড়ো কোথায় ?

সর্দ্দার। কোথাও ত নেই।

কোথাও না ?

সর্দ্দার। না।

তবে সে কি ?

সর্দ্দার। সে স্বপ্ন।

চন্দ্রহাস। তবে তুমিই চিরকালের ?

সর্দ্দার। হাঁ।

চন্দ্রহাস। আর আমরাই চিরকালের ?

সর্দ্দার। হাঁ।

পিছন থেকে যারা তোমাকে দেখ্‌লে তা'রা যে তোমাকে কত লোকে কত রকম মনে করলে তা'র ঠিক নেই।

সেই ধূলোর ভিতর থেকে আমরা ত তোমাকে চিন্‌তে পারিনি।

তখন তোমাকে হঠাৎ বুড়ো বলে' মনে হ'ল।

তা'র পর গুহার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলে। এখন মনে হচ্চে যেন তুমি বালক।

যেন তোমাকে এই প্রথম দেখ্‌লুম!

চন্দ্রহাস। এ ত বড় আশ্চর্য্য! তুমি বারে বারেই প্রথম, তুমি ফিরে ফিরেই প্রথম!

ভাই চন্দ্রহাস, তোমারই হার হ'ল। বুড়োকে ধরতে পারলে না।

চন্দ্রহাস। আর দেরি না—এবার উৎসব স্থরু হোক। সূর্য্য উঠেচে।

ভাই বাউল, তুমি যদি অমন চুপ করে' থাক তাহ'লে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়বে। একটা গান ধর।

বাউলের গান

তোমায় নতুন করেই পাব বলে'
হারাই ক্ষণে ক্ষণ—
ও মোর ভালবাসার ধন।
দেখা দেবে বলে' তুমি
হও যে অদর্শন,
ও মোর ভালবাসার ধন।

ও গো　　তুমি আমার নও আড়ালের
　　　　তুমি আমার চিরকালের,
　　　　ক্ষণকালের লীলার স্রোতে
　　　　　　হও যে নিমগন,
ও মোর　　ভালবাসার ধন।
আমি　　তোমায় যখন খুঁজে ফিরি
　　　　　　ভয়ে কাঁপে মন—
প্রেমে　　আমার ঢেউ লাগে তখন।

তোমার　　শেষ নাহি, তাই শূন্য সেজে
　　　　শেষ করে' দাও আপনাকে যে,
　　　　ঐ হাসিরে দেয় ধুয়ে মোর
　　　　　　বিরহের রোদন—
ও মোর　　ভালবাসার ধন॥

ঐ যে গুন্ গুন্ শব্দ শোনা যাচ্চে।

শুন্‌চি বটে।

ও ত মধুকরের দল নয়, পাড়ার লোক।

তাহ'লে দাদা আস্‌চে চৌপদী নিয়ে।

দাদা। সর্দ্দার না কি?

সর্দ্দার। কি দাদা?

দাদা। ভালোই হয়েচে। চৌপদীগুলো শুনিয়ে দিই।

না, না, গুলো নয়, গুলো নয়! একটা।

দাদা। আচ্ছা ভাই, ভয় নেই, একটাই হবে।

সূর্য্য এল পূর্ব্বদ্বারে তূর্য্য বাজে তা'র।
রাত্রি বলে, ব্যর্থ নহে এ মৃত্যু আমার,
এত বলি পদপ্রান্তে করে নমস্কার।
ভিক্ষাঝুলি স্বর্ণে ভরি গেল অন্ধকার॥

অর্থাৎ—

আবার অর্থাৎ!

না, এখানে অর্থাৎ চল্‌বে না।

দাদা। এর মানে—

না, মানে না। মানে বুঝ্‌ব না এই আমাদের প্রতিজ্ঞা।

দাদা। এমন মরিয়া হ'য়ে উঠ্‌লে কেন?

আজ আমাদের উৎসব।

দাদা। উৎসব না কি? তাহ'লে আমি পাড়ায়—

চন্দ্রহাস। না, তোমাকে পাড়ায় যেতে দিচ্চিনে।

দাদা। আমাকে দরকার আছে না কি?

আছে।

দাদা। আমার চৌপদী—

চন্দ্রহাস। তোমার চৌপদীকে আমরা এমনি রাঙিয়ে দেব যে তা'র অর্থ আছে কি না আছে বোঝা দায় হবে।

সুতরাং অর্থ না থাক্‌লে মানুষের যে দশা হয় তোমার তাই হবে।

অর্থাৎ পাড়ার লোকে তোমাকে ত্যাগ করবে।

কোটাল তোমাকে বল্‌বে অবোধ।

পণ্ডিত বল্‌বে অর্ব্বাচীন।

ঘরের লোক বল্‌বে অনাবশ্যক।

বাইরের লোকে বল্‌বে অদ্ভুত।

চন্দ্রহাস। আমরা তোমার মাথায় পরাব নব পল্লবের মুকুট।

তোমার গলায় পরাব নব মল্লিকার মালা।

পৃথিবীতে এই আমরা ছাড়া আর কেউ তোমার আদর বুঝ্‌বে না।

সকলে মিলিয়া

উৎসবের গান

আয় রে তবে, মাত রে সবে আনন্দে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে!
পিছনপানের বাঁধন হ'তে
চল্‌ ছুটে আজ বন্যাস্রোতে,
আপনাকে আজ দখিন হাওয়ায়
ছড়িয়ে দে রে দিগন্তে,
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে।

বাঁধন যত ছিন্ন কর আনন্দে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে!
অকূল প্রাণের সাগর-তীরে
ভয় কিরে তোর ক্ষয়-ক্ষতিরে?

যা আছে রে সব নিয়ে তোর
ঝাঁপ দিয়ে পড়্ অনন্তে
আজ নবীন প্রাণের বসন্তে ॥

২০শে ফাল্গুন
১৩২১।

বলাকা

উৎসর্গ

উইলি পিয়র্‌সন্‌ বন্ধুবরেষু

আপনারে তুমি সহজে ভুলিয়া থাক,
আমরা তোমারে ভুলিতে পারি না তাই।
সবার পিছনে নিজেরে গোপনে রাখ,
আমরা তোমারে প্রকাশ করিতে চাই।

ছোটরে কখনো ছোট নাহি কর মনে,
আদর করিতে জান অনাদৃত জনে,
প্রীতি তব কিছু না চাহে নিজের জন্য,
তোমারে আদরি' আপনারে করি ধন্য।

স্নেহাসক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭ই মে ১৯১৬
তোসা-মারু জাহাজ
বঙ্গসাগর

বলাকা

১

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা !
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা !
রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে
আজকে যে যা বলে বলুক তোরে !
সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ করে'
পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা !
আয় দুরন্ত, আয়রে আমার কাঁচা !

খাঁচাখানা দুল্‌চে মৃদু হাওয়ায় ।
আর ত কিছুই নড়ে না রে
ওদের ঘরে, ওদের ঘরের দাওয়ায়

ঐ যে প্রবীণ, ঐ যে পরম পাকা,
চক্ষু কর্ণ দুইটি ডানায় ঢাকা,
ঝিমায় যেন চিত্রপটে আঁকা
অন্ধকারে বন্ধ-করা খাঁচায় !
আয় জীবন্ত, আয়রে আমার কাঁচা

বাহির পানে তাকায় না যে কেউ !
দেখে না যে বান ডেকেচে
জোয়ার জলে উঠ্‌চে প্রবল ঢেউ।
চল্‌তে ওরা চায় না মাটির ছেলে
মাটির পরে চরণ ফেলে ফেলে,
আছে অচল আসনখানা মেলে
যে যার আপন উচ্চ বাঁশের মাচায়,
আয় অশান্ত, আয়রে আমার কাঁচা !

তোরে হেথায় করবে সবাই মানা।
হঠাৎ আলো দেখ্‌বে যখন
ভাব্‌বে এ কি বিষম কাণ্ডখানা !

সংঘাতে তোর উঠ্‌বে ওরা রেগে,
শয়ন ছেড়ে আস্‌বে ছুটে বেগে,
সেই সুযোগে ঘুমের থেকে জেগে
লাগ্‌বে লড়াই মিথ্যা এবং সাঁচায় !
আয় প্রচণ্ড, আয়রে আমার কাঁচা।

শিকল-দেবীর ঐ যে পূজাবেদী
চিরকাল কি রইবে খাড়া ?
পাগলামি তুই আয়রে দুয়ার ভেদি' !
ঝড়ের মাতন ! বিজয়-কেতন নেড়ে
অট্টহাস্যে আকাশখানা ফেড়ে,
ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে
ভুলগুলো সব আন্‌রে বাছা-বাছা !
আয় প্রমত্ত, আয়রে আমার কাঁচা !

আন্‌রে টেনে বাঁধা-পথের শেষে !
বিবাগী কর্‌ অবাধ-পানে,
পথ কেটে যাই অজানাদের দেশে।

আপদ আছে, জানি আঘাত আছে,
তাই জেনে ত বক্ষে পরাণ নাচে,
ঘুচিয়ে দে ভাই পুঁথি-পোড়োর কাছে
পথে চলার বিধি-বিধান যাচা’!
আয় প্রমুক্ত, আয়রে আমার কাঁচা!

চিরযুবা তুই যে চিরজীবী!
জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে
প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার্ দিবি!
সবুজ নেশায় ভোর করেছিস্ ধরা,
ঝড়ের মেঘে তোরি তড়িৎ ভরা,
বসন্তেরে পরাস আকুল-করা
আপন গলার বকুল মাল্যগাছা,
আয়রে অমর, আয়রে আমার কাঁচা!

১৫ই বৈশাখ ১৩২১

২

এবার যে ঐ এল সর্ব্বনেশে গো !

বেদনায় যে বান ডেকেচে

রোদনে যায় ভেসে গো !

রক্ত-মেঘে ঝিলিক মারে,

বজ্র বাজে গহন-পারে,

কোন্ পাগল ঐ বারে বারে

উঠ্‌চে অট্ট হেসে গো !

এবার যে ঐ এল সর্ব্বনেশে গো !

জীবন এবার মাত্‌ল মরণ-বিহারে !

এই বেলা নে বরণ করে'

সব দিয়ে তোর ইহারে !

চাহিস্‌নে আর আগু-পিছু,

রাখিস্‌নে তুই লুকিয়ে কিছু,

চরণে কর্ মাথা নীচু

সিক্ত আকুল কেশে গো !

এবার যে ঐ এল সর্ব্বনেশে গো !

পথটাকে আজ আপন করে' নিয়ো রে !

গৃহ আঁধার হ'ল, প্রদীপ

নিবৃল শয়ন-শিয়রে।

ঝড় এসে তোর ঘর ভরেচে,
এবার যে তোর ভিত নড়েচে,
শুনিস্ নি কি ডাক পড়েচে
নিরুদ্দেশের দেশে গো !
এবার যে ঐ এল সর্ব্বনেশে গো !

ছি ছি রে ঐ চোখের জল আর ফেলিস্‌নে !
ঢাকিস্ নে মুখ ভয়ে ভয়ে
কোণে আঁচল মেলিস্ নে !
কিসের তরে চিত্ত বিকল,
ভাঙুক না তোর দ্বারের শিকল,
বাহির পানে ছোট্ না, সকল
দুঃখ-সুখের শেষে গো !
এবার যে ঐ এল সর্ব্বনেশে গো !

কণ্ঠে কি তোর জয়ধ্বনি ফুট্‌বে না ?
চরণে তোর রুদ্র তালে
নূপুর বেজে উঠ্‌বে না ?

এই লীলা তোর কপালে যে
লেখা ছিল,—সকল ত্যেজে
রক্তবাসে আয়রে সেজে
আয় না বধূর বেশে গো !
ঐ বুঝি তোর এল সর্ব্বনেশে গো !

ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২১
রামগড়

৩

আমরা চলি সমুখ পানে,
কে আমাদের বাঁধ্‌বে ?
রৈল যারা পিছুর টানে
কাঁদ্‌বে তা'রা কাঁদ্‌বে।
ছিঁড়্‌ব বাধা রক্ত পায়ে,
চল্‌ব ছুটে রৌদ্রে ছায়ে,
জড়িয়ে ওরা আপন গায়ে
কেবলি ফাঁদ ফাঁদ্‌বে।
কাঁদ্‌বে ওরা কাঁদ্‌বে।

রুদ্র মোদের হাঁক দিয়েচে
বাজিয়ে আপন তূর্য্য।
মাথার পরে ডাক দিয়েচে
মধ্যদিনের সূর্য্য।
মন ছড়াল আকাশ ব্যেপে,
আলোর নেশায় গেচি ক্ষেপে,
ওরা আছে দুয়ার ঝেঁপে,
চক্ষু ওদের ধাঁধ্‌বে।
কাঁদ্‌বে ওরা কাঁদ্‌বে

সাগর গিরি কর্‌বরে জয়
যাব তাদের লঙ্ঘি'।
একলা পথে করিনে ভয়,
সঙ্গে ফেরেন সঙ্গী।
আপন ঘোরে আপ্‌নি মেতে
আছে ওরা গণ্ডী পেতে,
ঘর ছেড়ে আঙিনায় যেতে
বাধ্‌বে ওদের বাধ্‌বে।
কাঁদ্‌বে ওরা কাঁদ্‌বে।

জাগবে ঈশান, বাজ্‌বে বিষাণ
পুড়বে সকল বন্ধ।
উড়বে হাওয়ায় বিজয়-নিশান
ঘুচ্‌বে দ্বিধাদ্বন্দ্ব।
মৃত্যুসাগর মথন করে'
অমৃতরস আন্‌ব হরে'
ওরা জীবন আঁকড়ে ধরে'
মরণ-সাধন সাধ্‌বে।
কাঁদ্‌বে ওরা কাঁদ্‌বে।

৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২১
রামগড়

৪

তোমার শঙ্খ ধূলায় পড়ে',
কেমন করে' সইব ?
বাতাস আলো গেল মরে'
এ কি রে দুর্দ্দৈব !
লড়্‌বি কে আয় ধ্বজা বেয়ে,
গান আছে যার ওঠ্‌না গেয়ে,
চল্‌বি যারা চল্‌রে ধেয়ে,
আয় না রে নিঃশঙ্ক।
ধূলায় পড়ে' রইল চেয়ে
ঐ যে অভয় শঙ্খ !

চলেছিলেম পূজার ঘরে
সাজিয়ে ফুলের অর্ঘ্য
খুঁজি সারাদিনের পরে
কোথায় শান্তি-স্বর্গ।

এবার আমার হৃদয়-ক্ষত
ভেবেছিলেম হবে গত,
ধুয়ে মলিন চিহ্ন যত
হব নিষ্কলঙ্ক।
পথে দেখি ধূলায় নত
তোমার মহাশঙ্খ।

আরতি-দীপ এই কি জ্বালা?
এই কি আমার সন্ধ্যা?
গাঁথ্‌ব রক্ত-জবার মালা?
হায় রজনীগন্ধা!
ভেবেছিলেম যোঝাযুঝি
মিটিয়ে পাব বিরাম খুঁজি,
চুকিয়ে দিয়ে ঋণের পুঁজি
ল'ব তোমার অঙ্ক।
হেনকালে ডাক্‌ল বুঝি
নীরব তব শঙ্খ!

যৌবনেরি পরশমণি
করাও তবে স্পর্শ!
দীপক-তানে উঠুক ধ্বনি'
দীপ্ত প্রাণের হর্ষ।

নিশার বক্ষ বিদার করে'
উদ্বোধনে গগন ভরে'
অন্ধ দিকে দিগন্তরে
জাগাও না আতঙ্ক!
দুই হাতে আজ তুল্‌ব ধরে'
তোমার জয়শঙ্খ।

জানি জানি তন্দ্রা মম
রইবে না আর চক্ষে।
জানি শ্রাবণ-ধারাসম
বাণ বাজিবে বক্ষে।
কেউ বা ছুটে আস্‌বে পাশে,
কাঁদ্‌বে বা কেউ দীর্ঘশ্বাসে,
দুঃস্বপনে কাঁপ্‌বে ত্রাসে
সুপ্তির পালঙ্ক।
বাজ্‌বে যে আজ মহোল্লাসে
তোমার মহাশঙ্খ।

তোমার কাছে আরাম চেয়ে
পেলুম শুধু লজ্জা।
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে
পরাও রণসজ্জা।

ব্যাঘাত আসুক নব নব,
আঘাত খেয়ে অচল র'ব,
বক্ষে আমার দুঃখে, তব
বাজ্‌বে জয়ডঙ্ক।
দেবো সকল শক্তি, ল'ব
অভয় তব শঙ্খ!

১২ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২১
রামগড়

৫

মত্ত সাগর দিল পাড়ি গহনরাত্রিকালে
ঐ যে আমার নেয়ে।
ঝড় বয়েচে, ঝড়ের হাওয়া লাগিয়ে দিয়ে পালে
আস্‌চে তরী বেয়ে।
কালো রাতের কালী-ঢালা ভয়ের বিষম বিষে
আকাশ যেন মূর্চ্ছি' পড়ে সাগর সাথে মিশে,
উতল ঢেউয়ের দল ক্ষেপেচে, না পায় তা'রা দিশে,
উধাও চলে ধেয়ে।
হেনকালে এ দুর্দ্দিনে ভাব্‌ল মনে কি সে
কূল-ছাড়া মোর নেয়ে ?

এমন রাতে উদাস হ'য়ে কেমন অভিসারে
আসে আমার নেয়ে ?
শাদা পালের চমক দিয়ে নিবিড় অন্ধকারে
আস্‌চে তরী বেয়ে।
কোন্ ঘাটে যে ঠেক্‌বে এসে কে জানে তা'র পাতি,
পথহারা কোন্ পথ দিয়ে সে আস্‌বে রাতারাতি,
কোন্ অচেনা আঙিনাতে তারি পূজার বাতি
রয়েচে পথ চেয়ে ?
অগৌরবার বাড়িয়ে গরব করবে আপন সাথী
বিরহী মোর নেয়ে।

এই তুফানে এই তিমিরে খোঁজে কেমন খোঁজা
বিবাগী মোর নেয়ে ?
নাহি জানি পূর্ণ করে' কোন্ রতনের বোঝা
আস্‌চে তরী বেয়ে ?
নহে নহে, নাইক মাণিক, নাই রতনের ভার,
একটি ফুলের গুচ্ছ আছে রজনীগন্ধার,
সেইটি হাতে আঁধার রাতে সাগর হবে পার
আনমনে গান গেয়ে।
কার গলাতে নবীন প্রাতে পরিয়ে দেবে হার
নবীন আমার নেয়ে ?

সে থাকে এক পথের পাশে, অদিনে যার তরে
বাহির হ'ল নেয়ে।
তা'রি লাগি' পাড়ি দিয়ে সবার অগোচরে
আস্‌চে তরী বেয়ে।
রুক্ষ অলক উড়ে পড়ে, সিক্ত-পলক আঁখি,
ভাঙা ভিতের ফাঁক দিয়ে তা'র বাতাস চলে হাঁকি,'
দীপের আলো বাদল-বায়ে কাঁপ্‌চে থাকি' থাকি'
ছায়াতে ঘর ছেয়ে।
তোমরা যাহার নাম জান না তাহারি নাম ডাকি'
ঐ যে আসে নেয়ে।

অনেক দেরী হ'য়ে গেচে বাহির হ'ল কবে
উন্মনা মোর নেয়ে।
এখনো রাত হয়নি প্রভাত, অনেক দেরী হবে
আস্‌তে তরী বেয়ে।
বাজ্‌বেনাকো তুরী ভেরী, জান্‌বেনাকো কেহ,
কেবল যাবে আঁধার কেটে, আলোয় ভরবে গেহ,
দৈন্য যে তা'র ধন্য হ'বে, পুণ্য হবে দেহ
পুলক পরশ পেয়ে।
নীরবে তা'র চিরদিনের ঘুচিবে সন্দেহ
কূলে আস্‌বে নেয়ে॥

৫ই ভাদ্র ১৩২১
কলিকাতা।

৬

তুমি কি কেবল ছবি, শুধু পটে লিখা ?
—ওই যে সুদূর নীহারিকা
যারা করে' আছে ভিড়
আকাশের নীড় ;
ওই যারা দিনরাত্রি
আলো-হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী
গ্রহ তারা রবি
তুমি কি তাদের মত সত্য নও ?
হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি ?

চিরচঞ্চলের মাঝে তুমি কেন শান্ত হ'য়ে রও ?
পথিকের সঙ্গ লও
ওগো পথহীন !
কেন রাত্রিদিন
সকলের মাঝে থেকে সবা হ'তে আছ এত দূরে
স্থিরতার চির অন্তঃপুরে ?
এই ধূলি
ধূসর অঞ্চল তুলি'
বায়ুভরে ধায় দিকে দিকে ;

বৈশাখে সে বিধবার আভরণ খুলি'
তপস্বিনী ধরণীরে সাজায় গৈরিকে
অঙ্গে তা'র পত্রলিখা দেয় লিখে
বসন্তের মিলন-ঊষায়—
এই ধূলি এও সত্য হায় ;—
এই তৃণ
বিশ্বের চরণতলে লীন
এরা যে অস্থির, তাই এরা সত্য সবি,—
তুমি স্থির, তুমি ছবি,
তুমি শুধু ছবি !

একদিন এই পথে চলেছিলে আমাদের পাশে ।
বক্ষ তব দুলিত নিশ্বাসে ;
অঙ্গে অঙ্গে প্রাণ তব
কত গানে কত নাচে
রচিয়াছে
আপনার ছন্দ নব নব
বিশ্বতালে রেখে তাল ;
সে যে আজ হ'ল কত কাল !
এ জীবনে
আমার ভুবনে
কত সত্য ছিলে !

মোর চক্ষে এ নিখিলে
দিকে দিকে তুমিই লিখিলে
রূপের তুলিকা ধরি' রসের মূরতি
সে প্রভাতে তুমিই ত ছিলে
এ বিশ্বের বাণী মূর্ত্তিমতী।

একসাথে পথে যেতে যেতে
রজনীর আড়ালেতে
তুমি গেলে থামি'।
তা'র পরে আমি
কত দুঃখে সুখে
রাত্রিদিন চলেচি সম্মুখে।
চলেচে জোয়ার ভাঁটা আলোকে আঁধারে
আকাশ-পাথারে ;
পথের দু'ধারে
চলেচে ফুলের দল নীরব চরণে
বরণে বরণে ;
সহস্রধারায় ছোটে দুরন্ত জীবন-নির্ঝরিণী
মরণের বাজায়ে কিঙ্কিণী।
অজানার সুরে
চলিয়াছি দূর হ'তে দূরে,
মেতেচি পথের প্রেমে।

তুমি পথ হ'তে নেমে
যেখানে দাঁড়ালে
সেখানেই আছ থেমে।
এই তৃণ, এই ধূলি—ওই তারা, ওই শশী-রবি
সবার আড়ালে
তুমি ছবি, তুমি শুধু ছবি!

কি প্রলাপ কহে কবি?
তুমি ছবি?
নহে, নহে, নও শুধু ছবি!
কে বলে রয়েচ স্থির রেখার বন্ধনে
নিস্তব্ধ ক্রন্দনে?
মরি মরি সে আনন্দ থেমে যেত যদি
এই নদী
হারাত তরঙ্গবেগ;
এই মেঘ
মুছিয়া ফেলিত তা'র সোনার লিখন।
তোমার চিকণ
চিকুরের ছায়াখানি বিশ্ব হ'তে যদি মিলাইত
তবে
একদিন কবে
চঞ্চল পবনে লীলায়িত

মর্ম্মর-মুখর ছায়া মাধবী-বনের
হ'ত স্বপনের।
তোমায় কি গিয়েছিনু ভুলে ?
তুমি যে নিয়েচ বাসা জীবনের মূলে
তাই ভুল।
অন্যমনে চলি পথে, ভুলিনে কি ফুল ?
ভুলিনে কি তারা ?
তবুও তাহারা
প্রাণের নিশ্বাসবায়ু করে সুমধুর,
ভুলের শূন্যতামাঝে ভরি' দেয় সুর।
ভুলে থাকা নয় সে ত ভোলা ;
বিস্মৃতির মর্ম্মে বসি' রক্তে মোর দিয়েচ যে দোলা।
নয়নসম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েচ যে ঠাঁই ;
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল।
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েচে তা'র অন্তরের মিল।
নাহি জানি, কেহ নাহি জানে
তব সুর বাজে মোর গানে ;
কবির অন্তরে তুমি কবি,
নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি !

তোমারে পেয়েছি কোন্ প্রাতে,
তা'র পরে হারায়েছি রাতে।
তা'র পরে অন্ধকারে অগোচরে তোমারেই লভি।
নও ছবি, নও তুমি ছবি।

৩ কার্ত্তিক ১৩২১
এলাহাবাদ

৭

এ কথা জানিতে তুমি, ভারত-ঈশ্বর সা-জাহান,
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান।
শুধু তব অন্তর-বেদনা
চিরন্তন হ'য়ে থাক্ সম্রাটের ছিল এ সাধনা।
রাজশক্তি বজ্র-সুকঠিন
সন্ধ্যারক্তরাগসম তন্দ্রাতলে হয় হোক্ লীন
কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস
নিত্য-উচ্ছ্বসিত হ'য়ে সকরুণ করুক্ আকাশ
এই তব মনে ছিল আশ।
হীরামুক্তামাণিক্যের ঘটা
যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা
যায় যদি লুপ্ত হ'য়ে যাক্,
শুধু থাক্
একবিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।

হায় ওরে মানব-হৃদয়
বারবার
কারো পানে ফিরে চাহিবার
নাই যে সময়,
নাই নাই!
জীবনের খরস্রোতে ভাসিছ সদাই
ভুবনের ঘাটে ঘাটে ;—
এক হাটে লও বোঝা, শূন্য করে' দাও অন্য হাটে
দক্ষিণের মন্ত্র-গুঞ্জরণে
তব কুঞ্জবনে
বসন্তের মাধবী-মঞ্জরী
যেই ক্ষণে দেয় ভরি'
মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল,
বিদায়-গোধূলি আসে ধূলায় ছড়ায়ে ছিন্নদল।
সময় যে নাই ;
আবার শিশিররাত্রে তাই
নিকুঞ্জে ফুটায়ে তোলো নব কুন্দরাজি
সাজাইতে হেমন্তের অশ্রুভরা আনন্দের সাজি।
হায় রে হৃদয়
তোমার সঞ্চয়
দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়।
নাই নাই, নাই যে সময়!

হে সম্রাট, তাই তব শঙ্কিত হৃদয়
চেয়েছিল করিবারে সময়ের হৃদয় হরণ
সৌন্দর্যে ভুলায়ে।
কণ্ঠে তা'র কি মালা তুলায়ে
করিলে বরণ
রূপহীন মরণেরে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে ?
রহে না যে
বিলাপের অবকাশ
বারো মাস,
তাই তব অশান্ত ক্রন্দনে
চিরমৌন জাল দিয়ে বেঁধে দিলে কঠিন বন্ধনে
জ্যোৎস্নারাতে নিভৃত মন্দিরে
প্রেয়সীরে
যে নামে ডাকিতে ধীরে ধীরে
সেই কানে-কানে ডাকা রেখে গেলে এইখানে
অনন্তের কানে।
প্রেমের করুণ কোমলতা
ফুটিল তা
সৌন্দর্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে।
হে সম্রাট কবি,
এই তব হৃদয়ের ছবি,
এই তব নব মেঘদূত,

অপূর্ব্ব অদ্ভুত
ছন্দে গানে
উঠিয়াছে অলক্ষ্যের পানে
যেথা তব বিরহিণী প্রিয়া
রয়েছে মিশিয়া
প্রভাতের অরুণ-আভাসে,
ক্লান্ত-সন্ধ্যা দিগন্তের করুণ নিশ্বাসে,
পূর্ণিমায় দেহহীন চামেলির লাবণ্য-বিলাসে,
ভাষার অতীত তীরে
কাঙাল নয়ন যেথা দ্বার হ'তে আসে ফিরে ফিরে।
তোমার সৌন্দর্য্যদূত যুগযুগ ধরি'
এড়াইয়া কালের প্রহরী
চলিয়াছে বাক্যহারা এই বার্ত্তা নিয়া
"ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।"

চলে' গেছ তুমি আজ,
মহারাজ;
রাজ্য তব স্বপ্নসম গেছে ছুটে
সিংহাসন গেছে টুটে;

তব সৈন্যদল
যাদের চরণভরে ধরণী করিত টলমল
তাহাদের স্মৃতি আজ বায়ুভরে
উড়ে যায় দিল্লির পথের ধূলিপরে।
বন্দীরা গাহে না গান;
যমুনা-কল্লোলসাথে নহবৎ মিলায় না তান;
তব পুরসুন্দরীর নূপুর-নিক্কণ
ভগ্নপ্রাসাদের কোণে
মরে' গিয়ে ঝিল্লিস্বনে
কাঁদায় রে নিশার গগন।
তবুও তোমার দূত অমলিন,
শ্রান্তিক্লান্তিহীন,
তুচ্ছ করি রাজ্য ভাঙা-গড়া
তুচ্ছ করি জীবনমৃত্যুর ওঠা-পড়া,
যুগে যুগান্তরে
কহিতেছে একস্বরে
চিরবিরহীর বাণী নিয়া
"ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।"

মিথ্যা কথা,—কে বলে যে ভোলো নাই?
কে বলে রে খোলো নাই
স্মৃতির পিঞ্জরদ্বার?

অতীতের চির অস্ত-অন্ধকার
আজিও হৃদয় তব রেখেচে বাঁধিয়া ?
বিস্মৃতির মুক্তিপথ দিয়া
আজিও সে হয়নি বাহির ?
সমাধিমন্দির
এই ঠাঁই রহে চিরস্থির ;
ধরার ধূলায় থাকি'
স্মরণের আবরণে মরণেরে যত্নে রাখে ঢাকি'।
জীবনেরে কে রাখিতে পারে ?
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।
তা'র নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্ব্বাচলে আলোকে আলোকে।
স্মরণের গ্রন্থি টুটে
সে যে যায় ছুটে
বিশ্বপথে বন্ধনবিহীন।
মহারাজ, কোনো মহারাজ্য কোনোদিন
পারে নাই তোমারে ধরিতে ;
সমুদ্রস্তনিত পৃথ্বী, হে বিরাট, তোমারে ভরিতে
নাহি পারে,—
তাই এ ধরারে
জীবনউৎসব-শেষে দুই পায়ে ঠেলে
মৃৎপাত্রের মত যাও ফেলে।

তোমার কীর্ত্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্ত্তিরে তোমার
বারম্বার।
তাই
চিহ্ন তব পড়ে' আছে, তুমি হেথা নাই।
যে প্রেম সম্মুখপানে
চলিতে চালাতে নাহি জানে,
যে প্রেম পথের মধ্যে পেতেছিল নিজ সিংহাসন,
তা'র বিলাসের সম্ভাষণ
পথের ধূলার মত জড়ায়ে ধরেচে তব পায়ে,
দিয়েচ তা, ধূলিরে ফিরায়ে।
সেই তব পশ্চাতের পথধূলি পরে
তব চিত্ত হ'তে বায়ুভরে
কখন্ সহসা
উড়ে পড়েছিল বীজ জীবনের মালা হ'তে খসা।
তুমি চলে' গেচ দূরে
সেই বীজ অমর অঙ্কুরে
উঠেচে অম্বরপানে,
কহিছে গম্ভীর গানে—
যত দূর চাই
নাই নাই সে পথিক নাই!

প্রিয়া তা'রে রাখিল না, রাজ্য তা'রে ছেড়ে দিল পথ,
রুধিল না সমুদ্রপর্ব্বত।
আজি তা'র রথ
চলিয়াছে রাত্রির আহ্বানে
নক্ষত্রের গানে
প্রভাতের সিংহদ্বার পানে।
তাই
স্মৃতিভারে আমি পড়ে' আছি
ভারমুক্ত সে এখানে নাই।

১৫ই কার্ত্তিক ১৩২১
এলাহাবাদ

৮

হে বিরাট নদী,
অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
অবিচ্ছিন্ন অবিরল
চলে নিরবধি।
স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব রুদ্র কায়াহীন বেগে ;
বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুফেনা উঠে জেগে ;
আলোকের তীব্রচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া উঠে বর্ণস্রোতে
ধাবমান অন্ধকার হ'তে ;
ঘূর্ণাচক্রে ঘুরে ঘুরে মরে
স্তরে স্তরে
সূর্য্যচন্দ্রতারা যত
বুদ্বুদের মত।
হে ভৈরবী, ওগো বৈরাগিণী,
চলেচ যে নিরুদ্দেশ সেই চলা তোমার রাগিণী,
শব্দহীন সুর।
অন্তহীন দূর
তোমারে কি নিরন্তর দেয় সাড়া ?
সর্ব্বনাশা প্রেম তা'র নিত্য তাই তুমি ঘরছাড়া !
উন্মত্ত সে অভিসারে
তব বক্ষোহারে

ঘন ঘন লাগে দোলা,—ছড়ায় অমনি
নক্ষত্রের মণি ;
আঁধারিয়া ওড়ে শূন্যে ঝোড়ো এলোচুল ;
দুলে উঠে বিদ্যুতের দুল ;
অঞ্চল আকুল
গড়ায় কম্পিত তৃণে,
চঞ্চল পল্লবপুঞ্জে বিপিনে বিপিনে ;
বারম্বার ঝরে' ঝরে' পড়ে ফুল
জুঁই চাঁপা বকুল পারুল
পথে পথে
তোমার ঋতুর থালি হ'তে।
শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও,
উদ্দাম উধাও ;
ফিরে নাহি চাও,
যা কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও
কুড়ায়ে লও না কিছু, কর না সঞ্চয় ;
নাই শোক, নাই ভয়,
পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় কর ক্ষয়।

যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে মুহূর্তে কিছু তব নাই,
তুমি তাই
পবিত্র সদাই।

তোমার চরণস্পর্শে বিশ্বধূলি
মলিনতা যায় ভুলি'
পলকে পলকে,—
মৃত্যু ওঠে প্রাণ হ'য়ে ঝলকে ঝলকে।
যদি তুমি মুহূর্ত্তের তরে
ক্লান্তিভরে
দাঁড়াও থমকি',
তখনি চমকি'
উচ্ছি্রয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্ব্বতে;
পঙ্গু মূক কবন্ধ বধির আঁধা
স্থূলতনু ভয়ঙ্করী বাধা
সবারে ঠেকায়ে দিয়ে দাঁড়াইবে পথে;—
অণুতম পরমাণু আপনার ভারে
সঞ্চয়ের অচল বিকারে
বিদ্ধ হবে আকাশের মর্ম্মমূলে
কলুষের বেদনার শূলে।
ওগো নটী, চঞ্চল অপ্সরী,
অলক্ষ্য সুন্দরী,
তব নৃত্য মন্দাকিনী নিত্য ঝরি' ঝরি'
তুলিতেছে শুচি করি
মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবন।
নিঃশেষ নির্ম্মল নীলে বিকাশিছে নিখিল গগন

'ওরে কবি, তোরে আজ করেছে উতলা
ঝঙ্কারমুখরা এই ভুবন-মেখলা,
অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা।
নাড়ীতে নাড়ীতে তোর চঞ্চলের শুনি পদধ্বনি,
বক্ষ তোর উঠে রনরনি।
নাহি জানে কেউ
রক্তে তোর নাচে আজি সমুদ্রের ঢেউ,
কাঁপে আজি অরণ্যের ব্যাকুলতা ;
মনে আজি পড়ে সেই কথা—
যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
স্খলিয়া স্খলিয়া
চুপে চুপে
রূপ হ'তে রূপে
প্রাণ হ'তে প্রাণে।
নিশীথে প্রভাতে
যা কিছু পেয়েছি হাতে
এসেছি করিয়া ক্ষয় দান হ'তে দানে,
গান হ'তে গানে।

ওরে দেখ্ সেই স্রোত হয়েছে মুখর,
তরণী কাঁপিছে থরথর।

তীরের সঞ্চয় তোর পড়ে' থাক্ তীরে,
তাকাস্‌নে ফিরে!
সম্মুখের বাণী
নিক্ তোরে টানি'
মহাস্রোতে
পশ্চাতের কোলাহল হ'তে
অতল আঁধারে—অকূল আলোতে।

৩রা পৌষ, ১৩২১
এলাহাবাদ

৯

কে তোমারে দিল প্রাণ
রে পাষাণ ?
কে তোমারে জোগাইছে এ অমৃতরস
বরষ বরষ ?
তাই দেবলোকপানে নিত্য তুমি রাখিয়াছ ধরি'
ধরণীর আনন্দ-মঞ্জরী ;
তাই ত তোমারে ঘিরি' বহে বারোমাস
অবসন্ন বসন্তের বিদায়ের বিষণ্ণ নিশ্বাস ;
মিলনরজনীপ্রান্তে ক্লান্ত চোখে
ম্লান দীপালোকে
ফুরায়ে গিয়েচে যত অশ্রু-গলা গান
তোমার অন্তরে তা'রা আজিও জাগিছে অফুরান,
হে পাষাণ, অমর পাষাণ।

বিদীর্ণ হৃদয় হ'তে বাহিরে আনিল বহি'
সে রাজ-বিরহী
বিরহের রত্নখানি ;
দিল আনি'
বিশ্বলোক-হাতে
সবার সাক্ষাতে।

নাই সেথা সম্রাটের প্রহরী সৈনিক,
ঘিরিয়া ধরেচে তা'রে দশদিক্
আকাশ তাহার পরে
যত্নভরে
রেখে দেয় নীরব চুম্বন
চিরন্তন ;
প্রথম মিলনপ্রভা
রক্তশোভা
দেয় তা'রে প্রভাত অরুণ,
বিরহের ম্লানহাসে
পাণ্ডুভাসে
জ্যোৎস্না তা'রে করিছে করুণ

সম্রাটমহিষী
তোমার প্রেমের স্মৃতি সৌন্দর্য্যে হয়েচে মহীয়সী।
সে স্মৃতি তোমারে ছেড়ে
গেচে বেড়ে
সর্ব্বলোকে
জীবনের অক্ষয় আলোকে।
অঙ্গ ধরি' সে অনঙ্গ-স্মৃতি
বিশ্বের প্রীতির মাঝে মিলাইছে সম্রাটের প্রীতি।

রাজ-অন্তঃপুর হ'তে আনিলে বাহিরে
গৌরবমুকুট তব,—পরাইল সকলের শিরে
যেথা যার রয়েছে প্রেয়সী
রাজার প্রাসাদ হ'তে দীনের কুটীরে ;—
তোমার প্রেমের স্মৃতি সবারে করিল মহীয়সী।

সম্রাটের মন,
সম্রাটের ধনজন
এই রাজকীর্ত্তি হ'তে করিয়াছে বিদায় গ্রহণ ;
আজ সর্ব্বমানবের অনন্ত বেদনা
এ পাষাণ-সুন্দরীরে
আলিঙ্গনে ঘিরে
রাত্রিদিন করিছে সাধনা।

৫ই পৌষ, ১৩২১
এলাহাবাদ

১০

হে প্রিয়, আজি এ প্রাতে

নিজ হাতে

কি তোমারে দিব দান ?

প্রভাতের গান ?

প্রভাত যে ক্লান্ত হয় তপ্ত রবিকরে

আপনার বৃন্তটির পরে ;

অবসন্ন গান

হয় অবসান।

হে বন্ধু, কি চাও তুমি দিবসের শেষে

মোর দ্বারে এসে ?

কি তোমারে দিব আনি' ?

সন্ধ্যাদীপখানি ?

এ দীপের আলো এ যে নিরালা কোণের,

স্তব্ধ ভবনের।

তোমার চলার পথে এরে নিতে চাও জনতায় ?

এ যে হায়

পথের বাতাসে নিবে যায়।

কি মোর শকতি আছে তোমারে যে দিব উপহার ?
হোক্ ফুল, হোক্ না গলার হার
তা'র ভার
কেনই বা সবে,
একদিন যবে
নিশ্চিত শুকাবে তা'রা ম্লান ছিন্ন হবে !
নিজ হ'তে তব হাতে যাহা দিব তুলি'
তা'রে তব শিথিল অঙ্গুলি
যাবে ভুলি',—
ধূলিতে খসিয়া শেষে হ'য়ে যাবে ধূলি ।

তা'র চেয়ে যবে
ক্ষণকাল অবকাশ হবে,
বসন্তে আমার পুষ্পবনে
চলিতে চলিতে অন্যমনে
অজানা গোপনগন্ধে পুলকে চমকি'
দাঁড়াবে থমকি,
পথহারা সেই উপহার
হবে সে তোমার ।
যেতে যেতে বীথিকায় মোর
চোখেতে লাগিবে ঘোর,

দেখিবে সহসা—
সন্ধ্যার কবরী হ'তে খসা
একটি রঙীন আলো কাঁপি' থরথরে
ছোঁয়ায় পরশমণি স্বপনের পরে,
সেই আলো, অজানা সে উপহার
সেই ত তোমার।

আমার যা শ্রেষ্ঠধন সে ত শুধু চমকে ঝলকে,
দেখা দেয় মিলায় পলকে।
বলে না আপন নাম, পথেরে শিহরি দিয়া সুরে
চলে' যায় চকিত নূপুরে।
সেথা পথ নাহি জানি,
সেথা নাহি যায় হাত, নাহি যায় বাণী।
বন্ধু, তুমি সেথা হ'তে আপনি যা পাবে
আপনার ভাবে,
না চাহিতে না জানিতে সেই উপহার
সেই ত তোমার।
আমি যাহা দিতে পারি সামান্য সে দান—
হোক্ ফুল হোক্ তাহা গান।

১০ই পৌষ, ১৩২১
শান্তিনিকেতন

১১

হে মোর সুন্দর,
যেতে যেতে
পথের প্রমোদে মেতে
যখন তোমার গায়
কা'রা সবে ধূলা দিয়ে যায়,
আমার অন্তর
করে হায় হায়!
কেঁদে বলি, হে মোর সুন্দর,
আজ তুমি হও দণ্ডধর,
করহ বিচার।—
তা'র পরে দেখি,
এ কি,
খোলা তব বিচারঘরের দ্বার,—
নিত্য চলে তোমার বিচার।
নীরবে প্রভাত-আলো পড়ে
তাদের কলুষরক্ত নয়নের পরে;
শুভ্র বনমল্লিকার বাস
স্পর্শ করে লালসার উদ্দীপ্ত নিশ্বাস;
সন্ধ্যাতাপসীর হাতে জ্বালা
সপ্তর্ষির পূজাদীপমালা

তাদের মত্ততাপানে সারারাত্রি চায়—
হে সুন্দর, তব গায়
ধূলা দিয়ে যারা চলে' যায়!
হে সুন্দর,
তোমার বিচারঘর
পুষ্পবনে,
পুণ্য সমীরণে,
তৃণপুঞ্জে পতঙ্গ-গুঞ্জনে,
বসন্তের বিহঙ্গ-কূজনে,
তরঙ্গচুম্বিত তীরে মর্ম্মরিত পল্লব-বীজনে।

প্রেমিক আমার,
তা'রা যে নির্দ্দয় ঘোর, তাদের যে আবেগ দুর্ব্বার
লুকায়ে ফেরে যে তা'রা করিতে হরণ
তব আভরণ,
সাজাবারে
আপনার নগ্ন বাসনারে।
তাদের আঘাত যবে প্রেমের সর্ব্বাঙ্গে বাজে,
সহিতে সে পারি না যে;
অশ্রু-আঁখি
তোমারে কাঁদিয়া ডাকি,—
খড়্গ ধর, প্রেমিক আমার,

কর গো বিচার।
তা'র পরে দেখি
এ কি,
কোথা তব বিচার-আগার?
জননীর স্নেহ-অশ্রু ঝরে
তাদের উগ্রতা পরে;
প্রণয়ীর অসীম বিশ্বাস
তাদের বিদ্রোহশেল ক্ষতবক্ষে করি' লয় গ্রাস
প্রেমিক আমার,
তোমার সে বিচার-আগার
বিনিদ্র স্নেহের স্তব্ধ নিঃশব্দ বেদনামাঝে,
সতীর পবিত্র লাজে,
সখার হৃদয়রক্তপাতে,
পথ-চাওয়া প্রণয়ের বিচ্ছেদের রাতে,
অশ্রুপ্লুত করুণার পরিপূর্ণ ক্ষমার প্রভাতে।

হে রুদ্র আমার,
লুব্ধ তা'রা, মুগ্ধ তা'রা, হ'য়ে পার
তব সিংহদ্বার,
সঙ্গোপনে
বিনা নিমন্ত্রণে
সিঁধ কেটে চুরি করে তোমার ভাণ্ডার।

চোরা-ধন দুর্ব্বহ সে ভার
পলে পলে
তাহাদের মর্ম্ম দলে,
সাধ্য নাহি রহে নামাবার।
তোমারে কাঁদিয়া তবে কহি বারম্বার,—
এদের মার্জ্জনা কর, হে রুদ্র আমার!
চেয়ে দেখি মার্জ্জনা যে নামে এসে
প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার বেশে;
সেই ঝড়ে
ধূলায় তাহারা পড়ে;
চুরির প্রকাণ্ড বোঝা খণ্ড খণ্ড হ'য়ে
সে বাতাসে কোথা যায় ব'য়ে?
হে রুদ্র আমার,
মার্জ্জনা তোমার
গর্জ্জমান বজ্রাগ্নিশিখায়,
সূর্য্যাস্তের প্রলয়লিখায়,
রক্তের বর্ষণে,
অকস্মাৎ সংঘাতের ঘর্ষণে ঘর্ষণে।

১২ই পৌষ, ১৩২১
শান্তিনিকেতন

১২

তুমি দেবে, তুমি মোরে দেবে,
গেল দিন এই কথা নিত্য ভেবে ভেবে।
সুখে দুঃখে উঠে নেবে
বাড়ায়েছি হাত
দিন রাত :
কেবল ভেবেছি, দেবে, দেবে,
আরো কিছু দেবে।

দিলে, তুমি দিলে, শুধু দিলে ;
কভু পলে পলে তিলে তিলে,
কভু অকস্মাৎ বিপুল প্লাবনে
দানের শ্রাবণে।
নিয়েছি, ফেলেছি কত, দিয়েছি ছড়ায়ে,
হাতে পায়ে রেখেছি জড়ায়ে
জালের মতন ;
দানের রতন
লাগিয়েছি ধূলার খেলায়
অযত্নে হেলায়,

আলস্যের ভরে
ফেলে গেছি ভাঙা খেলাঘরে।
তবু তুমি দিলে, শুধু দিলে. শুধু দিলে,
তোমার দানের পাত্র নিত্য ভরে' উঠিছে নিখিলে

অজস্র তোমার
সে নিত্য দানের ভার
আজি আর
পারি না বহিতে।
পারি না সহিতে
এ ভিক্ষুক হৃদয়ের অক্ষয় প্রত্যাশা,
দ্বারে তব নিত্য যাওয়া-আসা।
যত পাই তত পেয়ে পেয়ে
তত চেয়ে চেয়ে
পাওয়া মোর চাওয়া মোর শুধু বেড়ে যায়
অনন্ত সে দায়
সহিতে না পারি হায়
জীবনে প্রভাত সন্ধ্যা ভরিতে ভিক্ষায়।

লবে তুমি, মোরে তুমি লবে, তুমি লবে,
এ প্রার্থনা পূরাইবে কবে ?

শূন্য পিপাসায় গড়া এ পেয়ালাখানি
ধূলায় ফেলিয়া টানি',—
সারা রাত্রি পথ-চাওয়া কম্পিত আলোর
প্রতীক্ষার দীপ মোর
নিমেষে নিবায়ে
নিশীথের বায়ে,
আমার কণ্ঠের মালা তোমার গলায় পরে'
লবে মোরে লবে মোরে
তোমার দানের স্তূপ হ'তে
তব রিক্ত আকাশের অন্তহীন নির্ম্মল আলোতে।

১৩ই পৌষ, ১৩২১
শান্তিনিকেতন।

১৩

পউষের পাতা-ঝরা তপোবনে
আজি কি কারণে
টলিয়া পড়িল আসি' বসন্তের মাতাল বাতাস :
নাই লজ্জা, নাই ত্রাস,
আকাশে ছড়ায় উচ্চহাস
চঞ্চলিয়া শীতের প্রহর
শিশির-মন্থর।

বহুদিনকার
ভুলে-যাওয়া যৌবন আমার
সহসা কি মনে করে'
পত্র তা'র পাঠায়েচে মোরে
উচ্ছৃঙ্খল বসন্তের হাতে
অকস্মাৎ সঙ্গীতের ইঙ্গিতের সাথে।

লিখেচে সে—
আছি আমি অনন্তের দেশে
যৌবন তোমার
চিরদিনকার।
গলে মোর মন্দারের মালা,
পীত মোর উত্তরীয় দূর বনান্তের গন্ধ-ঢালা।

বিরহী তোমার লাগি'
আছি জাগি'
দক্ষিণ বাতাসে
ফাল্গুনের নিশ্বাসে নিশ্বাসে।
আছি জাগি চক্ষে চক্ষে হাসিতে হাসিতে
কত মধু মধ্যাহ্নের বাঁশিতে বাঁশিতে।—

লিখেচে সে—
এস এস চলে' এস বয়সের জীর্ণ পথশেষে,
মরণের সিংহদ্বার
হ'য়ে এস পার।
ফেলে এস ক্লান্ত পুষ্পহার।
ঝরে' পড়ে ফোটা ফুল, খসে' পড়ে জীর্ণ পত্রভার,
স্বপ্ন যায় টুটে,
ছিন্ন আশা ধূলিতলে পড়ে লুটে।
শুধু আমি যৌবন তোমার
চিরদিনকার;
ফিরে ফিরে মোর সাথে দেখা তব হবে বারম্বার
জীবনের এপার ওপার।

২৩ পৌষ ১৩২১
সুরুল

১৪

কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে
ধরণীর তলে
ফুটিয়াছে আজি এ মাধবী।
এ আনন্দচ্ছবি
যুগে যুগে ঢাকা ছিল অলক্ষ্যের বক্ষের আঁচলে।

সেই মত আমার স্বপনে
কোনো দূর যুগান্তরে বসন্ত-কাননে
কোনো এক কোণে
এক বেলাকার মুখে একটুকু হাসি
উঠিবে বিকাশি'—
এই আশা গভীর গোপনে
আছে মোর মনে।

২৬ পৌষ ১৩২১
শান্তিনিকেতন

১৫

মোর গান এরা সব শৈবালের দল,
যেথায় জন্মেচে সেথা আপনারে করেনি অচল।
মূল নাই, ফুল আছে, শুধু পাতা আছে,
আলোর আনন্দ নিয়ে জলের তরঙ্গে এরা নাচে
বাসা নাই, নাইক সঞ্চয়,
অজানা অতিথি এরা কবে আসে নাইক নিশ্চয়।

যেদিন শ্রাবণ নামে দুর্ণিবার মেঘে,
দুই কূল ডোবে স্রোতোবেগে,
আমার শৈবালদল
উদ্দাম চঞ্চল,
বন্যার ধারায়
পথ যে হারায়,
দেশে দেশে
দিকে দিকে যায় ভেসে ভেসে।

২৭ পৌষ ১৩২১
সুরুল

১৬

বিশ্বের বিপুল বস্তুরাশি
উঠে অট্টহাসি' ;
ধূলা বালি
দিয়ে করতালি
নিত্য নিত্য
করে নৃত্য
দিকে দিকে দলে দলে ;
আকাশে শিশুর মত অবিরত কোলাহলে।

মানুষের লক্ষ লক্ষ অলক্ষ্য ভাবনা,
অসংখ্য কামনা,
রূপে মত্ত বস্তুর আহ্বানে উঠে মাতি'
তাদের খেলায় হ'তে সাথী।
স্বপ্ন যত অব্যক্ত আকুল
খুঁজে মরে কূল ;
অস্পষ্টের অতল প্রবাহে পড়ি'
চায় এরা প্রাণপণে ধরণীরে ধরিতে আঁকড়ি'
কাষ্ঠ-লোষ্ট্র-সুদৃঢ় মুষ্টিতে,
ক্ষণকাল মাটিতে তিষ্ঠিতে।

চিত্তের কঠিন চেষ্টা বস্তুরূপে
স্তূপে স্তূপে
উঠিতেছে ভরি',—
সেই ত নগরী।
এ ত শুধু নহে ঘর,
নহে শুধু ইষ্টক প্রস্তর।

অতীতের গৃহছাড়া কত যে অশ্রান্ত বাণী
শূন্যে শূন্যে করে কানাকানি;
খোঁজে তা'রা আমার বাণীরে
লোকালয়-তীরে-তীরে।
আলোক-তীর্থের পথে আলোহীন সেই যাত্রাদল
চলিয়াছে অশ্রান্ত চঞ্চল।
তাদের নীরব কোলাহলে
অস্ফুট ভাবনা যত দলে দলে ছুটে চলে
মোর চিত্তগুহা ছাড়ি',
দেয় পাড়ি
অদৃশ্যের অন্ধ মরু, ব্যগ্র ঊর্দ্ধশ্বাসে,
আকারের অসহ্য পিয়াসে।

কি জানি কে তা'রা কবে
কোথা পার হবে

যুগান্তরে,
দূর সৃষ্টি পরে
পাবে আপনার রূপ অপূর্ব্ব আলোতে।
আজ তা'রা কোথা হ'তে
মেলেছিল ডানা
সেদিন তা রহিবে অজানা।
অকস্মাৎ পাবে তা'রে কোন্ কবি,
বাঁধিবে তাহারে কোন্ ছবি,
গাঁথিবে তাহারে কোন্ হর্ম্ম্যচূড়ে,
সেই রাজপুরে
আজি যার কোনো দেশে কোনো চিহ্ন নাই
তা'র তরে কোথা রচে ঠাঁই
অরচিত দূর যজ্ঞভূমে?
কামানের ধূমে
কোন্ ভাবী ভীষণ সংগ্রাম
রণশৃঙ্গে আহ্বান করিছে তা'র নাম!

২৭ পৌষ ১৩২১
সুরুল

১৭

হে ভুবন
আমি যতক্ষণ
তোমারে না বেসেছিনু ভালো
ততক্ষণ তব আলো
খুঁজে খুঁজে পায় নাই তা'র সব ধন।
ততক্ষণ
নিখিল গগন
হাতে নিয়ে দীপ তা'র শূন্যে শূন্যে ছিল পথ চেয়ে।

মোর প্রেম এল গান গেয়ে ;
কি যে হ'ল কানাকানি
দিল সে তোমার গলে আপন গলার মালাখানি।
মুগ্ধচক্ষে হেসে
তোমারে সে
গোপনে দিয়েচে কিছু যা তোমার গোপন হৃদয়ে
তারার মালার মাঝে চিরদিন র'বে গাঁথা হ'য়ে।

২৮ পৌষ ১৩২১
সুরুল

১৮

যতক্ষণ স্থির হ'য়ে থাকি
ততক্ষণ জমাইয়া রাখি
যত কিছু বস্তুভার।
ততক্ষণ নয়নে আমার
নিদ্রা নাই ;
ততক্ষণ এ বিশ্বেরে কেটে কেটে খাই
কীটের মতন ;
ততক্ষণ
দুঃখের বোঝাই শুধু বেড়ে যায় নূতন নূতন ;
এ জীবন
সতর্ক বুদ্ধির ভারে নিমেষে নিমেষে
বৃদ্ধ হয় সংশয়ের শীতে পক্ককেশে।

যখন চলিয়া যাই সে চলার বেগে
বিশ্বের আঘাত লেগে
আবরণ আপনি যে ছিন্ন হয়,
বেদনার বিচিত্র সঞ্চয়
হ'তে থাকে ক্ষয়।

পুণ্য হই সে চলার স্নানে,
চলার অমৃতপানে
নবীন যৌবন
বিকশিয়া ওঠে প্রতিক্ষণ।

ওগো আমি যাত্রী তাই—
চিরদিন সম্মুখের পানে চাই।
কেন মিছে
আমারে ডাকিস্ পিছে?
আমি ত মৃত্যুর গুপ্ত প্রেমে
র'বনা ঘরের কোণে থেমে।
আমি চিরযৌবনেরে পরাইব মালা,
হাতে মোর তারি ত বরণডালা।
ফেলে দিব আর সব ভার,
বার্দ্ধক্যের স্তূপাকার
আয়োজন।

ওরে মন,
যাত্রার আনন্দগানে পূর্ণ আজি অনন্ত গগন।
তোর রথে গান গায় বিশ্বকবি,
গান গায় চন্দ্র তারা রবি।

২৯ পৌষ ১৩২১
সুরুল

১৯

আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে ;
পাকে পাকে ফেরে ফেরে
আমার জীবন দিয়ে জড়ায়েছি এরে ;
প্রভাত-সন্ধ্যার
আলো অন্ধকার
মোর চেতনায় গেচে ভেসে ;
অবশেষে
এক হ'য়ে গেচে আজ আমার জীবন
আর আমার ভুবন।
ভালবাসিয়াছি এই জগতের আলো
জীবনেরে তাই বাসি ভালো।

তবুও মরিতে হবে এও সত্য জানি।
মোর বাণী
একদিন এ বাতাসে ফুটিবে না
মোর আঁখি এ আলোকে লুটিবে না,
মোর হিয়া ছুটিবে না
অরুণের উদ্দীপ্ত আহ্বানে ;
মোর কানে কানে
রজনী ক'বে না তা'র রহস্যবারতা,
শেষ করে' যেতে হবে শেষ দৃষ্টি, মোর শেষ কথা।

এমন একান্ত করে' চাওয়া
এ-ও সত্য যত
এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া
সে-ও সেই মত।
এ দুয়ের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোনো মিল;
নহিলে নিখিল
এত বড় নিদারুণ প্রবঞ্চনা
হাসিমুখে এতকাল কিছুতে বহিতে পারিত না।
সব তা'র আলো
কীটে-কাটা পুষ্পসম এতদিনে হ'য়ে যেত কালো।

২৯ পৌষ ১৩২১
সুরুল

২০

আনন্দ-গান উঠুক তবে বাজি'
এবার আমার ব্যথার বাঁশিতে।
অশ্রুজলের ঢেউয়ের পরে আজি
পারের তরী থাকুক্ ভাসিতে।

যাবার হাওয়া ঐ যে উঠেচে,—ওগো
ঐ যে উঠেচে,
সারারাত্রি চক্ষে আমার
ঘুম যে ছুটেচে।

হৃদয় আমার উঠ্‌চে দুলে দুলে
অকূল জলের অট্টহাসিতে,
কে গো তুমি দাও দেখি তান তুলে
এবার আমার ব্যথার বাঁশিতে।

হে অজানা, অজানা সুর নব
বাজাও আমার ব্যথার বাঁশিতে,
হঠাৎ এবার উজান হাওয়ায় তব
পারের তরী থাক্ না ভাসিতে।

কোনো কালে হয়নি যারে দেখা—ওগো
তারি বিরহে
এমন করে' ডাক দিয়েচে,
ঘরে কে রহে ?

বাসার আশা গিয়েচে মোর ঘুরে,
ঝাঁপ দিয়েচি আকাশরাশিতে ,
পাগল, তোমার সৃষ্টিছাড়া সুরে
তান দিয়ো মোর ব্যথার বাঁশিতে ।

২৯ পৌষ, ১৩২১
রেলগাড়ি

২১

ওরে তোদের ত্বর সহে না আর ?
এখনো শীত হয়নি অবসান।
পথের ধারে আভাস পেয়ে কার
সবাই মিলে গেয়ে উঠিস্ গান ?
ওরে পাগল চাঁপা, ওরে উন্মত্ত বকুল,
কার তরে সব ছুটে এলি কৌতুকে আকুল ?

মরণপথে তোরা প্রথম দল,
ভাব্‌লিনি ত সময় অসময়।
শাখায় শাখায় তোদের কোলাহল
গন্ধে রঙে ছড়ায় বনময়।
সবার আগে উচ্চে হেসে ঠেলাঠেলি করে'
উঠ্‌লি ফুটে রাশি রাশি পড়লি ঝরে' ঝরে'।

বসন্ত সে আস্‌বে যে ফাল্গুনে
দখিন হাওয়ার জোয়ার-জলে ভাসি',
তাহার লাগি রইলিনে দিন গুণে'
আগে-ভাগেই বাজিয়ে দিলি বাঁশি!
রাত না হ'তে পথের শেষে পৌঁছবি কোন্ মতে ?
যা ছিল তোর কেঁদে হেসে ছড়িয়ে দিলি পথে!

ওরে ক্ষ্যাপা, ওরে হিসাব-ভোলা,
দূর হ'তে তা'র পায়ের শব্দে মেতে
সেই অতিথির ঢাক্‌তে পথের ধূলা
তোরা আপন মরণ দিলি পেতে'।
না দেখে না শুনেই তোদের পড়ল বাঁধন খসে',
চোখের দেখার অপেক্ষাতে রইলিনে আর বসে'।

৮ই মাঘ, ১৩২১
কলিকাতা

২২

যখন আমায় হাতে ধরে'
আদর করে'
ডাক্‌লে তুমি আপন পাশে,
রাত্রিদিবস ছিলেম ত্রাসে
পাছে তোমার আদর হ'তে অসাবধানে কিছু হারাই,
চল্‌তে গিয়ে নিজের পথে
যদি আপন ইচ্ছামতে
কোনোদিকে এক পা বাড়াই
পাছে বিরাগ-কুশাঙ্কুরের একটি কাঁটা একটু মাড়াই !

মুক্তি, এবার মুক্তি আজি
উঠ্‌ল বাজি'
অনাদরের কঠিন ঘায়ে
অপমানের ঢাকে ঢোলে সকল নগর সকল গাঁয়ে।
ওরে ছুটি, এবার ছুটি, এই যে আমার হ'ল ছুটি,
ভাঙ্‌ল আমার মানের খুঁটি,
খস্‌ল বেড়ি হাতে পায়ে ;
এই যে এবার
দেবার নেবার
পথ খোলসা ডাইনে বাঁয়ে।

এতদিনে আবার মোরে
বিষম জোরে
ডাক দিয়েচে আকাশ পাতাল।
লাঞ্ছিতেরে কেরে থামায় ?
ঘর-ছাড়ানো বাতাস আমায়
মুক্তিমদে করল মাতাল !
খসে'-পড়া তারার সাথে
নিশীত রাতে
ঝাঁপ দিয়েচি অতল পানে
মরণ-টানে।

আমি যে সেই বৈশাখী মেঘ বাঁধন-ছাড়া,
ঝড় তাহারে দিল তাড়া ;
সন্ধ্যারবির স্বর্ণ-কিরীট ফেলে দিল অস্তপারে,
বজ্র-মাণিক দুলিয়ে নিল গলার হারে ;
একলা আপন তেজে
ছুটল সে যে
অনাদরের মুক্তি-পথের পরে
তোমার চরণ-ধূলায় রঙীন্ চরম সমাদরে ;

গর্ভ ছেড়ে মাটির পরে
যখন পড়ে
তখন ছেলে দেখে আপন মাকে।

তোমার আদর যখন ঢাকে,
জড়িয়ে থাকি তারি নাড়ীর পাকে,
তখন তোমায় নাহি জানি।
আঘাত হানি'
তোমারি আচ্ছাদন হ'তে যেদিন দূরে ফেলাও টানি'
সে বিচ্ছেদে চেতনা দেয় আনি',
দেখি বদনখানি।

১৯ মাঘ ১৩২১
শিলাইদা

২৩

কোন্ ক্ষণে
সৃজনের সমুদ্রমন্থনে
উঠেছিল দুই নারী
অতলের শয্যাতল ছাড়ি'।
একজনা, উর্ব্বশী, সুন্দরী,
বিশ্বের কামনারাজ্যে রাণী,
স্বর্গের অপ্সরী।
অন্যজনা লক্ষ্মী সে কল্যাণী,
বিশ্বের জননী তাঁরে জানি,
স্বর্গের ঈশ্বরী।

একজন তপোভঙ্গ করি'
উচ্চহাস্য-অগ্নিরসে ফাল্গুনের সুরাপাত্র ভরি'
নিয়ে যায় প্রাণমন হরি,'
দু'হাতে ছড়ায় তা'রে বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপে,
রাগরক্ত কিংশুকে গোলাপে,
নিদ্রাহীন যৌবনের গানে।

আরজন ফিরাইয়া আনে
অশ্রুর শিশির-স্নানে
স্নিগ্ধ বাসনায়;

হেমন্তের হেমকান্ত সফল শান্তির পূর্ণতায় ;
ফিরাইয়া আনে
নিখিলের আশীর্ব্বাদ পানে
অচঞ্চল লাবণ্যের স্মিতহাস্যসুধায় মধুর।
ফিরাইয়া আনে ধীরে
জীবনমৃত্যুর
পবিত্র সঙ্গমতীর্থতীরে
অনন্তের পূজার মন্দিরে।

২০ মাঘ ১৩২১
পদ্মাতীর

২৪

স্বর্গ কোথায় জানিস্ কি তা, ভাই ?
তা'র ঠিক ঠিকানা নাই !
তা'র আরম্ভ নাই, নাইরে তাহার শেষ,
ওরে নাইরে তাহার দেশ,
ওরে, নাইরে তাহার দিশা,
ওরে নাইরে দিবস, নাইরে তাহার নিশা।

ফিরেছি সেই স্বর্গে শূন্যে শূন্যে
ফাঁকির ফাঁকা ফানুষ।
কত যে যুগ-যুগান্তরের পুণ্যে
জন্মেছি আজ মাটির পরে ধূলা-মাটির মানুষ।
স্বর্গ আজি কৃতার্থ তাই আমার দেহে,
আমার প্রেমে, আমার স্নেহে,
আমার ব্যাকুল বুকে,
আমার লজ্জা, আমার সজ্জা, আমার দুঃখে সুখে।
আমার জন্ম-মৃত্যুরি তরঙ্গে
নিত্য নবীন রঙের ছটায় খেলায় সে যে রঙ্গে।

আমার গানে স্বর্গ আজি
ওঠে বাজি,
আমার প্রাণে ঠিকানা তা'র পায়,
আকাশভরা আনন্দে সে আমারে তাই চায়।
দিগঙ্গনার অঙ্গনে আজ বাজ্‌ল যে তাই শঙ্খ,
সপ্ত সাগর বাজায় বিজয়-ডঙ্ক ;
তাই ফুটেচে ফুল,
বনের পাতায় ঝরনা-ধারায় তাইরে হুলুস্থুল।
স্বর্গ আমায় জন্ম নিল মাটি-মায়ের কোলে
বাতাসে সেই খবর ছোটে আনন্দ-কল্লোলে !

২০ মাঘ ১৩২১
শিলাইদা

২৫

যে বসন্ত একদিন করেছিল কত কোলাহল

ল'য়ে দলবল

আমার প্রাঙ্গণতলে কলহাস্য তুলে

দাড়িম্বে পলাশগুচ্ছে কাঞ্চনে পারুলে ;

নবীন পল্লবে বনে বনে

বিহ্বল করিয়াছিল নীলাম্বর রক্তিম চুম্বনে ;

সে আজ নিঃশব্দে আসে আমার নির্জনে ;

অনিমেষে

নিস্তব্ধ বসিয়া থাকে নিভৃত ঘরের প্রান্তদেশে

চাহি' সেই দিগন্তের পানে

শ্যামশ্রী মূর্চ্ছিত হ'য়ে নীলিমায় মরিছে যেখানে।

২০ মাঘ ১৩২১

পদ্মাতীর

২৬

এবারে ফাল্গুনের দিনে সিন্ধুতীরের কুঞ্জবীথিকায়
এই যে আমার জীবন-লতিকায়
ফুট্‌ল কেবল শিউরে-ওঠা নতুন পাতা যত
রক্তবরণ হৃদয়-ব্যথার মত ;
দখিন-হাওয়া ক্ষণে ক্ষণে দিল কেবল দোল,
উঠ্‌ল কেবল মর্ম্মর-কল্লোল।
এবার শুধু গানের মৃদু গুঞ্জনে
বেলা আমার ফুরিয়ে গেল কুঞ্জবনের প্রাঙ্গণে।

আবার যেদিন আস্‌বে আমার রূপের আগুন ফাগুনদিনের কাল
দখিন-হাওয়ায় উড়িয়ে রঙীন পাল,
সেবারে এই সিন্ধুতীরের কুঞ্জবীথিকায়
যেন আমার জীবন-লতিকায়
ফোটে প্রেমের সোনার বরণ ফুল ;
হয় যেন আকুল
নবীন রবির আলোকটি তাই বনের প্রাঙ্গণে ;
আনন্দ মোর জনম নিয়ে
তালি দিয়ে তালি দিয়ে
নাচে যেন গানের গুঞ্জনে।

২০ মাঘ ১৩২১
পদ্মাতীর

২৭

আমার কাছে রাজা আমার রইল অজানা।

তাই সে যখন তলব করে খাজানা

মনে করি পালিয়ে গিয়ে দেবো তা'রে ফাঁকি,

রাখ্‌ব দেনা বাকি।

যেখানেতেই পালাই আমি গোপনে
দিনে কাজের আড়ালেতে, রাতে স্বপনে,
তলব তারি আসে
নিশ্বাসে নিশ্বাসে।

তাই জেনেচি, আমি তাহার নইক অজানা।
তাই জেনেচি, ঋণের দায়ে
ডাইনে বাঁয়ে
বিকিয়ে বাসা নাইক আমার ঠিকানা।
তাই ভেবেচি জীবনমরণে
যা আছে সব চুকিয়ে দেবো চরণে।
তাহার পরে
নিজের জোরে
নিজেরি স্বত্বে
মিল্‌বে আমার আপন বাসা তাঁহার রাজত্বে।

২২ মাঘ ১৩২১
পদ্মাতীর

২৮

পাখীরে দিয়েচ গান, গায় সেই গান,
তা'র বেশি করে না সে দান।
আমারে দিয়েচ স্বর, আমি তা'র বেশি করি দান,
আমি গাই গান।

বাতাসেরে করেচ স্বাধীন,
সহজে সে ভৃত্য তব বন্ধন-বিহীন।
আমারে দিয়েচ যত বোঝা,
তাই নিয়ে চলি পথে কভু বাঁকা কভু সোজা।
একে একে ফেলে' ভার মরণে মরণে
নিয়ে যাই তোমার চরণে
একদিন রিক্তহস্ত সেবায় স্বাধীন ;
বন্ধন যা দিলে মোরে করি তা'রে মুক্তিতে বিলীন।

পূর্ণিমারে দিলে হাসি ;
সুখস্বপ্নরসরাশি
ঢালে তাই, ধরণীর করপুট সুধায় উচ্ছ্বাসি'।
দুঃখখানি দিলে মোর তপ্ত ভালে থুয়ে,
অশ্রুজলে তা'রে ধুয়ে ধুয়ে
আনন্দ করিয়া তা'রে ফিরায়ে আনিয়া দিই হাতে
দিন-শেষে মিলনের রাতে।

তুমি ত গড়েচ শুধু এ মাটির ধরণী তোমার
মিলাইয়া আলোকে আঁধার।
শূন্য হাতে সেথা মোরে রেখে
হাসিছ আপনি সেই শূন্যের আড়ালে গুপ্ত থেকে
দিয়েচ আমার পরে ভার
তোমার স্বর্গটি রচিবার।

আর সকলেরে তুমি দাও।
শুধু মোর কাছে তুমি চাও;
আমি যাহা দিতে পারি আপনার প্রেমে,
সিংহাসন হ'তে নেমে
হাসিমুখে বক্ষে তুলে নাও।
মোর হাতে যাহা দাও
তোমার আপন হাতে তা'র বেশি ফিরে তুমি পাও!

২৪ মাঘ ১৩২১
পদ্মাতীর

২৯

যেদিন তুমি আপ্‌নি ছিলে একা
আপ্‌নাকে ত হয়নি তোমার দেখা।
সেদিন কোথাও কারো লাগি ছিল না পথ-চাওয়া
এপার হ'তে ওপার চেয়ে
বয়নি ধেয়ে
কাঁদন-ভরা বাঁধন-ছেঁড়া হাওয়া।

আমি এলেম, ভাঙ্‌ল তোমার ঘুম,
শূন্যে শূন্যে ফুট্‌ল আলোর আনন্দ-কুসুম।
আমায় তুমি ফুলে ফুলে
ফুটিয়ে তুলে'
দুলিয়ে দিলে নানা রূপের দোলে।
আমায় তুমি তারায় তারায় ছড়িয়ে দিয়ে কুড়িয়ে নিলে কোলে
আমায় তুমি মরণমাঝে লুকিয়ে ফেলে
ফিরে ফিরে নূতন করে' পেলে।

আমি এলেম, কাঁপ্‌ল তোমার বুক,
আমি এলেম, এল তোমার দুখ,
আমি এলেম, এল তোমার আগুনভরা আনন্দ,
জীবন মরণ তুফান-তোলা ব্যাকুল বসন্ত।
আমি এলেম, তাই ত তুমি এলে,
আমার মুখে চেয়ে
আমার পরশ পেয়ে
আপন পরশ পেলে।

আমার চোখে লজ্জা আছে, আমার বুকে ভয়,
আমার মুখে ঘোম্‌টা পড়ে' রয়,—
দেখ্‌তে তোমায় বাধে বলে' পড়ে চোখের জল
ওগো আমার প্রভু,
জানি আমি তবু
আমায় দেখ্‌বে বলে' তোমার অসীম কৌতূহল,
নইলে ত এই সূর্য্যতারা সকলি নিষ্ফল॥

২৫ মাঘ ১৩২১
পদ্মাতীর

৩০

এই দেহটির ভেলা নিয়ে দিয়েছি সাঁতার গো,
এই দু'দিনের নদী হব পার গো।
তা'র পরে যেই ফুরিয়ে যাবে বেলা,
ভাসিয়ে দেবো ভেলা।
তা'র পরে তা'র খবর কি যে ধারিনে তা'র ধার গো,
তা'র পরে সে কেমন আলো, কেমন অন্ধকার গো।

আমি যে অজানার যাত্রী সেই আমার আনন্দ।
সেই ত বাধায় সেই ত মেটায় দ্বন্দ্ব।
জানা আমায় যেমনি আপন ফাঁদে
শক্ত করে' বাঁধে,
অজানা সে সামনে এসে হঠাৎ লাগায় ধন্দ
এক-নিমেষে যায় গো ফেঁসে অমনি সকল বন্ধ।

অজানা মোর হালের মাঝি, অজানাই ত মুক্তি,
তা'র সনে মোর চিরকালের চুক্তি।
ভয় দেখিয়ে ভাঙায় আমার ভয়
প্রেমিক সে নির্দ্দয়।
মানে না সে বুদ্ধিসুদ্ধি বৃদ্ধ-জনার যুক্তি,
মুক্তারে সে মুক্ত করে ভেঙে তাহার শুক্তি।

ভাবিস্ বসে' যেদিন গেচে সেদিন কি আর ফিরবে ?
সেই কূলে কি এই তরী আর ভিড়বে ?
ফিরবে না রে, ফিরবে না আর, ফিরবে না ;
সেই কূলে আর ভিড়বে না।
সামনেকে তুই ভয় করেচিস ! পিছন তোরে ঘিরবে
এম্নি কি তুই ভাগ্যহারা ? ছিঁড়বে বাঁধন ছিঁড়বে !

ঘণ্টা যে ঐ বাজ্‌ল কবি, হোক্ রে সভাভঙ্গ !
জোয়ার-জলে উঠেচে তরঙ্গ !
এখনো সে দেখায় নি তা'র মুখ,
তাই ত দোলে বুক !
কোন্ রূপে যে সেই অজানার কোথায় পাব সঙ্গ,
কোন্ সাগরের কোন্ কূলে গো কোন্ নবীনের রঙ্গ !

২৬ মাঘ ১৩২১
পদ্মাতীর

৩১

নিত্য তোমার পায়ের কাছে
তোমার বিশ্ব তোমার আছে
কোনোখানে অভাব কিছু নাই।
পূর্ণ তুমি, তাই
তোমার ধনে মানে তোমার আনন্দ না ঠেকে।
তাই ত একে একে
যা কিছু ধন তোমার আছে আমার করে' লবে।
এম্‌নি করেই হবে
এ ঐশ্বর্য্য তব
তোমার আপন কাছে, প্রভু, নিত্য নব নব।
এম্‌নি করেই দিনে দিনে
আমার চোখে লও যে কিনে
তোমার সূর্য্যোদয়।
এম্‌নি করেই দিনে দিনে
আপন প্রেমের পরশমণি আপ্‌নি যে লও চিনে
আমার পরাণ করি হিরণ্ময়।

২৭ মাঘ ১৩২১
পদ্মা

৩২

আজ এই দিনের শেষে
সন্ধ্যা যে ঐ মাণিকখানি পরেছিল চিকণ কালো কেশে
গেঁথে নিলেম তা'রে
এই ত আমার বিনিসূতার গোপন গলার হারে।
চক্রবাকের নিদ্রানীরব বিজন পদ্মাতীরে
এই যে সন্ধ্যা ছুঁইয়ে গেল আমার নতশিরে
নির্মাল্য তোমার
আকাশ হ'য়ে পার ;
ঐযে মরি মরি
তরঙ্গহীন স্রোতের পরে ভাসিয়ে দিল তারার ছায়াতরী ;
ঐ যে সে তা'র সোনার চেলি
দিল মেলি'
রাতের আঙিনায়
ঘুমে অলস কায় ;
ঐ যে শেষে সপ্তঋষির ছায়াপথে
কালো ঘোড়ার রথে
উড়িয়ে দিয়ে আগুন-ধূলি নিল সে বিদায় ;

একটি কেবল করুণ পরশ রেখে গেল একটি কবির ভালে
তোমার অনন্ত মাঝে এমন সন্ধ্যা হয়নি কোনোকালে,
আর হবে না কভু।
এম্‌নি করেই প্রভু
এক নিমেষের পত্রপুটে ভরি'
চিরকালের ধনটি তোমার ক্ষণকালে লও যে নূতন করি'!

২৭ মাঘ
পদ্মা

৩৩

জানি আমার পায়ের শব্দ রাত্রে দিনে শুন্‌তে তুমি পাও,
খুসি হ'য়ে পথের পানে চাও।
খুসি তোমার ফুটে ওঠে শরৎ-আকাশে
অরুণ-আভাসে।
খুসি তোমার ফাগুনবনে আকুল হ'য়ে পড়ে
ফুলের ঝড়ে ঝড়ে।
আমি যতই চলি তোমার কাছে
পথটি চিনে চিনে
তোমার সাগর অধিক করে নাচে
দিনের পরে দিনে।

জীবন হ'তে জীবনে মোর পদ্মটি যে ঘোমটা খুলে খুলে
ফোটে তোমার মানসসরোবরে—
সূর্য্যতারা ভিড় করে' তাই ঘুরে ঘুরে বেড়ায় কূলে কূলে
কৌতূহলের ভরে।
তোমার জগৎ আলোর মঞ্জরী
পূর্ণ করে তোমার অঞ্জলি।
তোমার লাজুক স্বর্গ আমার গোপন আকাশে
একটি করে' পাপ্‌ড়ি খোলে প্রেমের বিকাশে।

২৭ মাঘ ১৩২১
পদ্মাতীর

৩৪

আমার মনের জানলাটি আজ হঠাৎ গেল খুলে
তোমার মনের দিকে।
সকাল বেলার আলোয় আমি সকল কর্ম্ম ভুলে
রৈনু অনিমিখে।
দেখ্‌তে পেলেম তুমি মোরে
সদাই ডাক যে-নাম ধরে'
সে নামটি এই চৈত্রমাসের পাতায় পাতায় ফুলে
আপনি দিলে লিখে।
সকাল বেলার আলোতে তাই সকল কর্ম্ম ভুলে
রৈনু অনিমিখে।

আমার সুরের পর্দ্দাটি আজ হঠাৎ গেল উড়ে
তোমার গানের পানে।
সকাল বেলার আলো দেখি তোমার সুরে সুরে
ভরা আমার গানে।
মনে হ'ল আমারি প্রাণ
তোমার বিশ্বে তুলেচে তান,
আপন গানের সুরগুলি সেই তোমার চরণ-মূলে
নেব আমি শিখে।
সকাল বেলার আলোতে তাই সকল কর্ম্ম ভুলে
রৈনু অনিমিখে॥

২১ চৈত্র ১৩২১
সুরুল।

৩৫

আজ প্রভাতের আকাশটি এই

শিশির-ছলছল,

নদীর ধারের ঝাউগুলি ঐ

রৌদ্রে ঝলমল,

এমনি নিবিড় করে'

এরা দাঁড়ায় হৃদয় ভরে'

তাই ত আমি জানি

বিপুল বিশ্বভুবনখানি

অকূল মানসসাগরজলে

কমল টলমল।

তাই ত আমি জানি

আমি বাণীর সাথে বাণী,

আমি গানের সাথে গান

আমি প্রাণের সাথে প্রাণ,

আমি অন্ধকারের হৃদয়-ফাটা

আলোক জ্বলজ্বল

৭ই কার্ত্তিক, ১৩২২

শ্রীনগর

৩৬

সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হ'ল,—যেন খাপে ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার ;
দিনের ভাঁটার শেষে রাত্রির জোয়ার
এল তা'র ভেসে-আসা তারাফুল নিয়ে কালো জলে ;
অন্ধকার গিরিতটতলে
দেওদার তরু সারে সারে ;
মনে হ'ল সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে,
বলিতে না পারে স্পষ্ট করি',
অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি'।

সহসা শুনিনু সেই ক্ষণে
সন্ধ্যার গগনে
শব্দের বিদ্যুৎছটা শূন্যের প্রান্তরে
মুহূর্তে ছুটিয়া গেল দূর হ'তে দূরে দূরান্তরে
হে হংস-বলাকা,
ঝঞ্ঝা-মদরসে মত্ত তোমাদের পাখা
রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে
বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে।

ঐ পক্ষধ্বনি,
শব্দময়ী অপ্সর-রমণী,
গেল চলি' স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি'।
উঠিল শিহরি
গিরিশ্রেণী তিমির-মগন,
শিহরিল দেওদার-বন।

মনে হ'ল এ পাখার বাণী
দিল আনি'
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।
পর্ব্বত চাহিল হ'তে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ ;
তরুশ্রেণী চাহে, পাখা মেলি'
মাটির বন্ধন ফেলি'
ওই শব্দরেখা ধরে চকিতে হইতে দিশাহারা,
আকাশের খুঁজিতে কিনারা।
এ সন্ধ্যার স্বপ্ন টুটে' বেদনার ঢেউ উঠে জাগি'
সুদূরের লাগি,
হে পাখা বিবাগী !
বাজিল ব্যাকুল বাণী নিখিলের প্রাণে,
"হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোন্‌খানে !"

হে হংস-বলাকা,
আজ রাত্রে মোর কাছে খুলে দিলে স্তব্ধতার ঢাকা
শুনিতেছি আমি এই নিঃশব্দের তলে
শূন্যে জলে স্থলে
অমনি পাখার শব্দ উদ্দাম চঞ্চল।
তৃণদল
মাটির আকাশ পরে ঝাপটিছে ডানা ;
মাটির আঁধার-নীচে কে জানে ঠিকানা—
মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।
দেখিতেছি আমি আজি
এই গিরিরাজি,
এই বন, চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায়
দ্বীপ হ'তে দ্বীপান্তরে, অজানা হইতে অজানায়।
নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে
চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে।

শুনিলাম মানবের কত বাণী দলে দলে
অলক্ষিত পথে উড়ে চলে
অস্পষ্ট অতীত হ'তে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে
শুনিলাম আপন অন্তরে

অসংখ্য পাখীর সাথে
দিনেরাতে
এই বাসা-ছাড়া পাখী ধায় আলো অন্ধকারে
কোন্ পার হ'তে কোন্ পারে !
ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার এ গানে—
"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে !"

কার্ত্তিক ১৩২২
শ্রীনগর

৩৭

দূর হ'তে কি শুনিস্ মৃত্যুর গর্জ্জন, ওরে দীন,
ওরে উদাসীন,
ওই ক্রন্দনের কলরোল,
লক্ষ বক্ষ হ'তে মুক্ত রক্তের কল্লোল!
বহ্নিবন্যা-তরঙ্গের বেগ,
বিষশ্বাস ঝটিকার মেঘ,
ভূতল গগন
মূর্চ্ছিত বিহ্বল-করা মরণে মরণে আলিঙ্গন,—
ওরি মাঝে পথ চিরে চিরে
নূতন সমুদ্র-তীরে
তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি,—
ডাকিছে কাণ্ডারী
এসেচে আদেশ—
বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মত হ'ল শেষ,
পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচাকেনা
আর চলিবে না।
বঞ্চনা বাড়িয়া ওঠে, ফুরায় সত্যের যত পুঁজি,-
কাণ্ডারী ডাকিছে তাই বুঝি,—
"তুফানের মাঝখানে
নূতন সমুদ্রতীর পানে
দিতে হবে পাড়ি।"

তাড়াতাড়ি
তাই ঘর ছাড়ি
চারিদিক হ'তে ওই দাঁড়-হাতে ছুটে আসে দাঁড়ি!

"নূতন উষার স্বর্ণদ্বার
খুলিতে বিলম্ব কত আর?"
একথা শুধায় সবে
ভীত আর্ত্তরবে
ঘুম হ'তে অকস্মাৎ জেগে।
ঝড়ের পুঞ্জিত মেঘে
কালোয় ঢেকেছে আলো,—জানে না ত কেউ
রাত্রি আছে কি না আছে; দিগন্তে ফেনায়ে উঠে ঢেউ,-
তারি মাঝে ফুকারে কাণ্ডারী,—
"নূতন সমুদ্রতীরে তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি।"
বাহিরিয়া এল কা'রা? মা কাঁদিছে পিছে,
প্রেয়সী দাঁড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুদিছে।
ঝড়ের গর্জ্জন মাঝে
বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে;
ঘরে-ঘরে শূন্য হ'ল আরামের শয্যাতল;
"যাত্রা কর, যাত্রা কর যাত্রীদল,"
উঠেছে আদেশ,
"বন্দরের কাল হ'ল শেষ।"

মৃত্যু ভেদ করি'
দুলিয়া চলেচে তরী।
কোথায় পৌঁছিবে ঘাটে, কবে হবে পার,
সময় ত নাই শুধাবার।
এই শুধু জানিয়াছে সার
তরঙ্গের সাথে লড়ি'
বাহিয়া চলিতে হবে তরী।
টানিয়া রাখিতে হবে পাল,
আঁকড়ি ধরিতে হবে হাল ;—
বাঁচি আর মরি
বাহিয়া চলিতে হবে তরী।
এসেচে আদেশ—
বন্দরের কাল হ'ল শেষ।
অজানা সমুদ্রতীর, অজানা সে দেশ,—
সেথাকার লাগি
উঠিয়াছে জাগি'
ঝটিকার কণ্ঠে কণ্ঠে শূন্যে শূন্যে প্রচণ্ড আহ্বান
মরণের গান
উঠেচে ধ্বনিয়া পথে নবজীবনের অভিসারে
ঘোর অন্ধকারে
যত দুঃখ পৃথিবীর, যত পাপ, যত অমঙ্গল,

যত অশ্রুজল,
যত হিংসা হলাহল,
সমস্ত উঠেছে তরঙ্গিয়া
কূল উল্লঙ্ঘিয়া,
ঊর্দ্ধ আকাশেরে ব্যঙ্গ করি।
তবু বেয়ে তরী
সব ঠেলে হ'তে হবে পার,
কানে নিয়ে নিখিলের হাহাকার,
শিরে নিয়ে উন্মত্ত দুর্দ্দিন,
চিত্তে নিয়ে আশা অন্তহীন,
হে নির্ভীক, দুঃখ-অভিহত!
ওরে ভাই, কার নিন্দা কর তুমি? মাথা কর নত
এ আমার এ তোমার পাপ।
বিধাতার বক্ষে এই তাপ
বহু যুগ হ'তে জমি' বায়ুকোণে আজিকে ঘনায়,—
ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,
বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ,
জাতি-অভিমান,
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান,
বিধাতার বক্ষ আজি বিদীরিয়া
ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়া।

ভাঙিয়া পড়ুক ঝড়, জাগুক তুফান,
নিঃশেষ হইয়া যাক নিখিলের যত বজ্রবাণ!
রাখ নিন্দাবাণী, রাখ আপন সাধুত্ব-অভিমান,
শুধু একমনে হও পার
এ প্রলয়-পারাবার
নূতন সৃষ্টির উপকূলে
নূতন বিজয়ধ্বজা তুলে!

দুঃখেরে দেখেছি নিত্য, পাপেরে দেখেছি নানা ছলে;
অশান্তির ঘূর্ণি দেখি জীবনের স্রোতে পলে পলে;
মৃত্যু করে লুকাচুরি
সমস্ত পৃথিবী জুড়ি।
ভেসে যায় তা'রা সরে' যায়
জীবনেরে করে' যায়
ক্ষণিক বিদ্রূপ।
আজ দেখ তাহাদের অভ্রভেদী বিরাট স্বরূপ!
তা'র পরে দাঁড়াও সম্মুখে,
বল অকম্পিত বুকে,—
"তোরে নাহি করি ভয়,
এ সংসারে প্রতিদিন তোরে করিয়াছি জয়।
তোর চেয়ে আমি সত্য এ বিশ্বাসে প্রাণ দিব, দেখ!
শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক!"

মৃত্যুর অন্তরে পশি অমৃত না পাই যদি খুঁজে,
সত্য যদি নাহি মেলে দুঃখ সাথে যুঝে,
পাপ যদি নাহি মরে' যায়
আপনার প্রকাশ লজ্জায়,
অহঙ্কার ভেঙে নাহি পড়ে আপনার অসহ্য সজ্জায়,
তবে ঘর-ছাড়া সবে
অন্তরের কি আশ্বাস-রবে
মরিতে ছুটিছে শত শত
প্রভাত-আলোর পানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মত ?
বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা ?
স্বর্গ কি হবে না কেনা ?
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
এত ঋণ ?
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন ?
নিদারুণ দুঃখরাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্ত্যসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা ?

২৩ কার্ত্তিক ১৩২২

৩৮

সর্ব্বদেহের ব্যাকুলতা কি বল্‌তে চায় বাণী,
তাই আমার এই নূতন বসনখানি।
নূতন সে মোর হিয়ার মধ্যে, দেখ্‌তে কি পায় কেউ ?
সেই নূতনের ঢেউ
অঙ্গ বেয়ে পড়ল ছেয়ে নূতন বসনখানি।
দেহ-গানের তান যেন এই নিলেম বুকে টানি'।

আপনাকে ত দিলেম তা'রে, তবু হাজার বার
নূতন করে' দিই যে উপহার।
চোখের কালোয় নূতন আলো ঝলক দিয়ে ওঠে,
নূতন হাসি ফোটে,
তারি সঙ্গে, যতন-ভরা নূতন বসনখানি
অঙ্গ আমার নূতন করে' দেয় যে তা'রে আনি'।

চাঁদের আলো চাইবে রাতে বনছায়ার পানে
বেদন-ভরা শুধু চোখের গানে।
মিল্‌ব তখন বিশ্বমাঝে আমরা দোঁহে একা,
যেন নূতন দেখা।
তখন আমার অঙ্গ ভরি' নূতন বসনখানি
পাড়ে পাড়ে ভাঁজে ভাঁজে করবে কানাকানি।

ওগো, আমার হৃদয় যেন সন্ধ্যারি আকাশ,
রঙের নেশায় মেটে না তা'র আশ।
তাই ত বসন রাঙিয়ে পরি কখনো বা ধানী,
কখনো জাফ্‌রানী,
আজ তোরা দেখ্‌ চেয়ে আমার নূতন বসনখানি
বৃষ্টি-ধোওয়া আকাশ যেন নবীন আস্‌মানী।

অকূলের এই বর্ণ, এ যে দিশাহারার নীল,
অন্য পারের বনের সাথে মিল।
আজকে আমার সকল দেহে বইচে দূরের হাওয়া
সাগর পানে ধাওয়া।
আজ্‌কে আমার অঙ্গে আনে নূতন কাপড়খানি
বৃষ্টি-ভরা ঈশান কোণের নব মেঘের বাণী॥

১২ই অগ্রহায়ণ ১৩২২
পদ্মা

৩৯

যেদিন উদিলে তুমি, বিশ্বকবি, দূর সিন্ধুপারে,
ইংলণ্ডের দিক্‌প্রান্ত পেয়েছিল সেদিন তোমারে
আপন বক্ষের কাছে, ভেবেছিল বুঝি তারি তুমি
কেবল আপন ধন; উজ্জ্বল ললাট তব চুমি'
রেখেছিল কিছুকাল অরণ্যশাখার বাহুজালে,
ঢেকেছিল কিছুকাল কুয়াশা-অঞ্চল-অন্তরালে
বনপুষ্প-বিকশিত তৃণঘন শিশির-উজ্জ্বল
পরীদের খেলার প্রাঙ্গণে। দ্বীপের নিকুঞ্জতল
তখনো ওঠেনি জেগে কবিসূর্য্য-বন্দনা-সঙ্গীতে।
তা'র পরে ধীরে ধীরে অনন্তের নিঃশব্দ ইঙ্গিতে
দিগন্তের কোল ছাড়ি' শতাব্দীর প্রহরে প্রহরে
উঠিয়াছে দীপ্তজ্যোতি মধ্যাহ্নের গগনের পরে;
নিয়েচ আসন তব সকল দিকের কেন্দ্রদেশে
বিশ্বচিত্ত উদ্ভাসিয়া; তাই হের যুগান্তর-শেষে
ভারতসমুদ্রতীরে কম্পমান শাখাপুঞ্জে আজি
নারিকেলকুঞ্জবনে জয়ধ্বনি উঠিতেছে বাজি'।

১৩ই অগ্রহায়ণ ১৩২২
শিলাইদহ

৪০

এইক্ষণে

মোর হৃদয়ের প্রান্তে আমার নয়ন-বাতায়নে

যে-তুমি রয়েচ চেয়ে প্রভাত-আলোতে

সে-তোমার দৃষ্টি যেন নানা দিন নানা রাত্রি হ'তে

রহিয়া রহিয়া

চিত্তে মোর আনিছে বহিয়া

নীলিমার অপার সঙ্গীত,

নিঃশব্দের উদার ইঙ্গিত।

আজি মনে হয় বারেবারে

যেন মোর স্মরণের দূর পরপারে

দেখিয়াছি কত দেখা

কত যুগে, কত লোকে, কত চোখে, কত জনতায়, কত একা

সেই-সব দেখা আজি শিহরিছে দিকে দিকে

ঘাসে ঘাসে নিমিখে নিমিখে,

বেণুবনে ঝিলিমিলি পাতার ঝলক-ঝিকিমিকে।

কত নব নব অবগুণ্ঠনের তলে
দেখিয়াছ কত ছলে
চুপে চুপে
এক প্রেয়সীর মুখ কত রূপে রূপে
জন্মে জন্মে, নামহারা নক্ষত্রের গোধূলি-লগনে।
তাই আজি নিখিল গগনে
অনাদি মিলন তব অনন্ত বিরহ
এক পূর্ণ বেদনায় ঝঙ্কারি' উঠিছে অহরহ।

তাই যা দেখিছ তা'রে ঘিরেচে নিবিড়
যাহা দেখিছ না তারি ভিড়।
তাই আজি দক্ষিণ পবনে
ফাল্গুনের ফুলগন্ধে ভরিয়া উঠিছে বনে বনে
ব্যাপ্ত ব্যাকুলতা,
বহুশত জনমের চোখে-চোখে কানে-কানে কথা।

৭ই ফাল্গুন ১৩২২
শিলাইদা

৪১

যে কথা বলিতে চাই,
বলা হয় নাই,—
সে কেবল এই—
চিরদিবসের বিশ্ব আঁকি' সম্মুখেই
দেখিনু সহস্রবার
দুয়ারে আমার।
অপরিচিতের এই চিরপরিচয়
এতই সহজে নিত্য ভরিয়াছে গভীর হৃদয়
সে কথা বলিতে পারি এমন সরল বাণী
আমি নাহি জানি।

শূন্য প্রান্তরের গান বাজে ওই একা ছায়াবটে;
নদীর এপারে ঢালু তটে
চাষী করিতেছে চাষ;
উড়ে চলিয়াছে হাঁস
ওপারের জনশূন্য তৃণশূন্য বালুতীরতলে।
চলে কি না চলে
ক্লান্তস্রোত শীর্ণ নদী, নিমেষ-নিহত
আধ-জাগা নয়নের মত।

পথখানি বাঁকা
বহুশত বরষের পদচিহ্ন-আঁকা
চলেচে মাঠের ধারে—ফসল-ক্ষেতের যেন মিতা—
নদী সাথে কুটীরের বহে কুটুম্বিতা।

ফাল্গুনের এ আলোয় এই গ্রাম ওই শূন্য মাঠ
ওই খেয়াঘাট
ওই নীল নদীরেখা, ওই দূর বালুকার কোলে
নিভৃত জলের ধারে চখাচখী কাকলী-কল্লোলে
যেখানে বসায় মেলা—এই-সব ছবি
কতদিন দেখিয়াছে কবি!
শুধু এই চেয়ে দেখা, এই পথ বেয়ে চলে যাওয়া,
এই আলো, এই হাওয়া,
এইমত অস্ফুটধ্বনির গুঞ্জরণ,
ভেসে-যাওয়া মেঘ হ'তে
অকস্মাৎ নদীস্রোতে
ছায়ার নিঃশব্দ সঞ্চরণ,
যে আনন্দ-বেদনায় এ জীবন বারেবারে করেচে উদাস
হৃদয় খুঁজিছে আজি তাহারি প্রকাশ।

৮ই ফাল্গুন, ১৩২২

৪২

তোমারে কি বারবার করেছিনু অপমান ?
এসেছিলে গেয়ে গান
ভোর বেলা ;
ঘুম ভাঙাইলে বলে' মেরেছিনু ঢেলা
বাতায়ন হ'তে,
পরক্ষণে কোথা তুমি লুকাইলে জনতার স্রোতে !
ক্ষুধিত দরিদ্রসম
মধ্যাহ্নে এসেচ দ্বারে মম।
ভেবেছিনু, "এ কি দায়,
কাজের ব্যাঘাত এ যে !" দূর হ'তে করেচি বিদায়।

সন্ধ্যাবেলা এসেছিলে যেন মৃত্যুদূত
জ্বালায়ে মশাল-আলো, অস্পষ্ট অদ্ভুত
দুঃস্বপ্নের মত।
দস্যু বলে' শত্রু বলে' ঘরে দ্বার যত
দিনু রোধ করি'।
গেলে চলি', অন্ধকার উঠিল শিহরি।
এরি লাগি' এসেছিলে, হে বন্ধু অজানা ;—
তোমারে করিব মানা,
তোমারে ফিরায়ে দিব, তোমারে মারিব,
তোমা-কাছে যত ধার সকলি ধারিব,

না করিয়া শোধ
দুয়ার করিব রোধ।

তা'র পরে অর্দ্ধ রাতে
দীপ-নেবা অন্ধকারে বসিয়া ধূলাতে
মনে হবে আমি বড় একা
যাহারে ফিরায়ে দিনু বিনা তারি দেখা।
এ দীর্ঘ জীবন ধরি'
বহুমানে যাহাদের নিয়েছিনু বরি'
একাগ্র উৎসুক,
আঁধারে মিলায়ে যাবে তাহাদের মুখ।
যে আসিলে ছিনু অন্যমনে
যাহারে দেখিনি চেয়ে নয়নের কোণে,
যারে নাহি চিনি,
যার ভাষা বুঝিতে পারিনি,
অর্দ্ধরাতে দেখা দিবে বারেবারে তারি মুখ নিদ্রাহীন চোখে
রজনীগন্ধার গন্ধে তারার আলোকে।
বারেবারে-ফিরে-যাওয়া অন্ধকারে বাজিবে হৃদয়ে
বারেবারে-ফিরে-আসা হ'য়ে।

৮ই ফাল্গুন, ১৩২২
শিলাইদা

৪৩

ভাবনা নিয়ে মরিস কেন ক্ষেপে ?
দুঃখ-সুখের লীলা
ভাবিস্ এ কি রৈবে বক্ষে চেপে
জগদ্দলন-শিলা ?
চলেছিস্ রে চলাচলের পথে
কোন্ সারথির উধাও-মনোরথে ?
নিমেষ তরে যুগে যুগান্তরে
দিবে না রাশ-ঢিলা।

শিশু হ'য়ে এলি মায়ের কোলে,
সেদিন গেল ভেসে।
যৌবনেরি বিষম দোলার দোলে
কাট্‌ল কেঁদে হেসে।
রাত্রে যখন হচ্ছিল দীপ জ্বালা'
কোথায় ছিল আজকে দিনের পালা ?
আবার কবে কি সুর বাঁধা হবে
আজ্‌কে পালার শেষে !

চল্‌তে যাদের হবে চিরকালই
নাইক তাদের ভার।
কোথা তাদের রৈবে থলি-থালি,
কোথা বা সংসার?
দেহযাত্রা মেঘের খেয়া বাওয়া,
মন তাহাদের ঘূর্ণা-পাকের হাওয়া;
বেঁকে বেঁকে আকার এঁকে এঁকে
চল্‌চে নিরাকার।

ওরে পথিক, ধর না চলার গান,
বাজারে এক-তারা!
এই খুসিতেই মেতে উঠুক প্রাণ—
নাইক কূল-কিনারা।
পায়ে পায়ে পথের ধারে ধারে
কান্না-হাসির ফুল ফুটিয়ে যা রে,
প্রাণ-বসন্তে তুই যে দখিন হাওয়া
গৃহ-বাঁধন-হারা।

এই জনমের এই রূপের এই খেলা
এবার করি শেষ;
সন্ধ্যা হ'ল, ফুরিয়ে এল বেলা,
বদল করি বেশ।

যাবার কালে মুখ ফিরিয়ে পিছু
কান্না আমার ছড়িয়ে যাব কিছু,
সাম্‌নে সে-ও প্রেমের কাঁদন ভরা
চির নিরুদ্দেশ !

বঁধুর দিঠি মধুর হ'য়ে আছে
সেই অজানার দেশে।
প্রাণের ঢেউ সে এম্‌নি করেই নাচে
এম্‌নি ভালবেসে।
সেখানেতে আবার সে কোন্‌ দূরে
আলোর বাঁশি বাজ্‌বে গো এই সুরে
কোন্‌ মুখেতে সেই অচেনা ফুল
ফুট্‌বে আবার হেসে !

এইখানে এক শিশির-ভরা প্রাতে
মেলেছিলেম প্রাণ।
এইখানে এক বীণা নিয়ে হাতে
সেধেছিলেম তান।
এতকালের সে মোর বীণাখানি
এইখানেতেই ফেলে যাব জানি,
কিন্তু ওরে হিয়ার মধ্যে ভরে'
নেব যে তা'র গান।

সে গান আমি শোনাব যার কাছে
নূতন আলোর তীরে,
চিরদিন সে সাথে সাথে আছে
আমার ভুবন ঘিরে।
শরতে সে শিউলি-বনের তলে
ফুলের গন্ধে ঘোম্‌টা টেনে চলে,
ফাল্গুনে তা'র বরণমালা-খানি
পরাল মোর শিরে!

পথের বাঁকে হঠাৎ দেয় সে দেখা
শুধু নিমেষ তরে।
সন্ধ্যা-আলোয় রয় সে বসে' একা
উদাস প্রান্তরে।
এম্‌নি করেই তা'র সে আসা-যাওয়া,
এমনি করেই বেদন-ভরা হাওয়া
হৃদয়-বনে বইয়ে সে যায় চলে'
মর্ম্মরে মর্ম্মরে।

জোয়ার-ভাঁটার নিত্য চলাচলে
তা'র এই আনাগোনা।
আধেক হাসি আধেক চোখের জলে
মোদের চেনাশোনা।

তা'রে নিয়ে হ'ল না ঘর-বাঁধা,
পথে-পথেই নিত্য তা'রে সাধা,
এম্‌নি করেই আসা-যাওয়ার ডোরে
প্রেমেরি জাল-বোনা।

২৯ ফাল্গুন ১৩২২
শান্তিনিকেতন

৪৪

যৌবন রে, তুই কি র'বি সুখের খাঁচাতে ?
তুই যে পারিস্ কাঁটাগাছের উচ্চ ডালের পরে
পুচ্ছ নাচাতে।
তুই পথহীন সাগরপারের পান্থ,
তোর ডানা যে অশান্ত অক্লান্ত,
অজানা তোর বাসার সন্ধানে রে
অবাধ যে তোর ধাওয়া ;
ঝড়ের থেকে বজ্রকে নেয় কেড়ে
তোর যে দাবী-দাওয়া।

যৌবন রে, তুই কি কাঙাল, আয়ুর ভিখারী ?
মরণ-বনের অন্ধকারে গহন কাঁটাপথে
তুই যে শিকারী।
মৃত্যু যে তা'র পাত্রে বহন করে
অমৃতরস নিত্য তোমার তরে ;
বসে' আছে মানিনী তোর প্রিয়া
মরণ-ঘোম্‌টা টানি'।
সেই আবরণ দেখ্‌রে উত্তারিয়া
মুগ্ধ সে মুখখানি।

যৌবন রে, রয়েচ কোন্ তানের সাধনে ?
তোমার বাণী শুষ্ক পাতায় রয় কি কভু বাঁধা
পুঁথির বাঁধনে ?
তোমার বাণী দখিন হাওয়ার বীণায়
অরণ্যেরে আপনাকে তা'র চিনায়,
তোমার বাণী জাগে প্রলয়-মেঘে
ঝড়ের ঝঙ্কারে ;
ঢেউয়ের পরে বাজিয়ে চলে বেগে
বিজয়-ডঙ্কা রে।

যৌবন রে, বন্দী কি তুই আপন গণ্ডীতে ?
বয়সের এই মায়াজালের বাঁধনখানা তোরে
হবে খণ্ডিতে।
খড়্গসম তোমার দীপ্ত শিখা
ছিন্ন করুক জরার কুজ্ঝটিকা,
জীর্ণতারি বক্ষ দু-ফাঁক করে'
অমর পুষ্প তব
আলোকপানে লোকে লোকান্তরে
ফুটুক নিত্যনব।

যৌবন রে, তুই কি হবি ধূলায় লুণ্ঠিত ?
আবর্জ্জনার বোঝা মাথায় আপন গ্লানি-ভারে
রইবি কুণ্ঠিত ?

প্রভাত যে তা'র সোনার মুকুটখানি
তোমার তরে প্রত্যুষে দেয় আনি',
আগুন আছে ঊর্দ্ধশিখা জ্বেলে
তোমার সে যে কবি।
সূর্য্য তোমার মুখে নয়ন মেলে
দেখে আপন ছবি।

৪ঠা চৈত্র, ১৩২২
শান্তিনিকেতন

৪৫

পুরাতন বৎসরের জীর্ণক্লান্ত রাত্রি
ওই কেটে গেল, ওরে যাত্রী!
তোমার পথের পরে তপ্ত রৌদ্র এনেচে আহ্বান
রুদ্রের ভৈরব গান।
দূর হ'তে দূরে
বাজে পথ শীর্ণ তীব্র দীর্ঘতান সুরে,
যেন পথহারা
কোন্ বৈরাগীর একতারা।

ওরে যাত্রী,
ধূসর পথের ধুলা সেই তোর ধাত্রী;
চলার অঞ্চলে তোরে ঘূর্ণাপাকে বক্ষেতে আবরি'
ধরার বন্ধন হ'তে নিয়ে যাক্ হরি'
দিগন্তের পারে দিগন্তরে।
ঘরের মঙ্গল-শঙ্খ নহে তোর তরে,
নহেরে সন্ধ্যার দীপালোক,
নহে প্রেয়সীর অশ্রু-চোখ।

পথে পথে অপেক্ষিছে কাল-বৈশাখীর আশীর্ব্বাদ,
শ্রাবণরাত্রির বজ্রনাদ।
পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা,
পথে পথে গুপ্তসর্প গূঢ়ফণা।
নিন্দা দিবে জয়শঙ্খনাদ
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।

ক্ষতি এনে দিবে পদে অমূল্য অদৃশ্য উপহার।
চেয়েছিলি অমৃতের অধিকার,—
সে ত নহে সুখ, ওরে, সে নহে বিশ্রাম,
নহে শান্তি, নহে সে আরাম।
মৃত্যু তোরে দিবে হানা,
দ্বারে দ্বারে পাবি মানা,
এই তোর নব বৎসরের আশীর্ব্বাদ,
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।
ভয় নাই, ভয় নাই, যাত্রী,
ঘরছাড়া দিক্‌হারা অলক্ষ্মী তোমার বরদাত্রী।

পুরাতন বৎসরের জীর্ণক্লান্ত রাত্রি
ওই কেটে গেল, ওরে যাত্রী!
এসেচে নিষ্ঠুর,
হোক্‌রে দ্বারের বন্ধ দূর,
হোক্‌রে মদের পাত্র চূর!

নাই বুঝি, নাই চিনি, নাই তা'রে জানি,
ধর তা'র পাণি ;—
ধ্বনিয়া উঠুক তব হৃৎকম্পনে তা'র দীপ্ত বাণী !
ওরে যাত্রী
গেছে কেটে, যাক্ কেটে পুরাতন রাত্রি !

৯ই বৈশাখ ১৩২৩
কলিকাতা